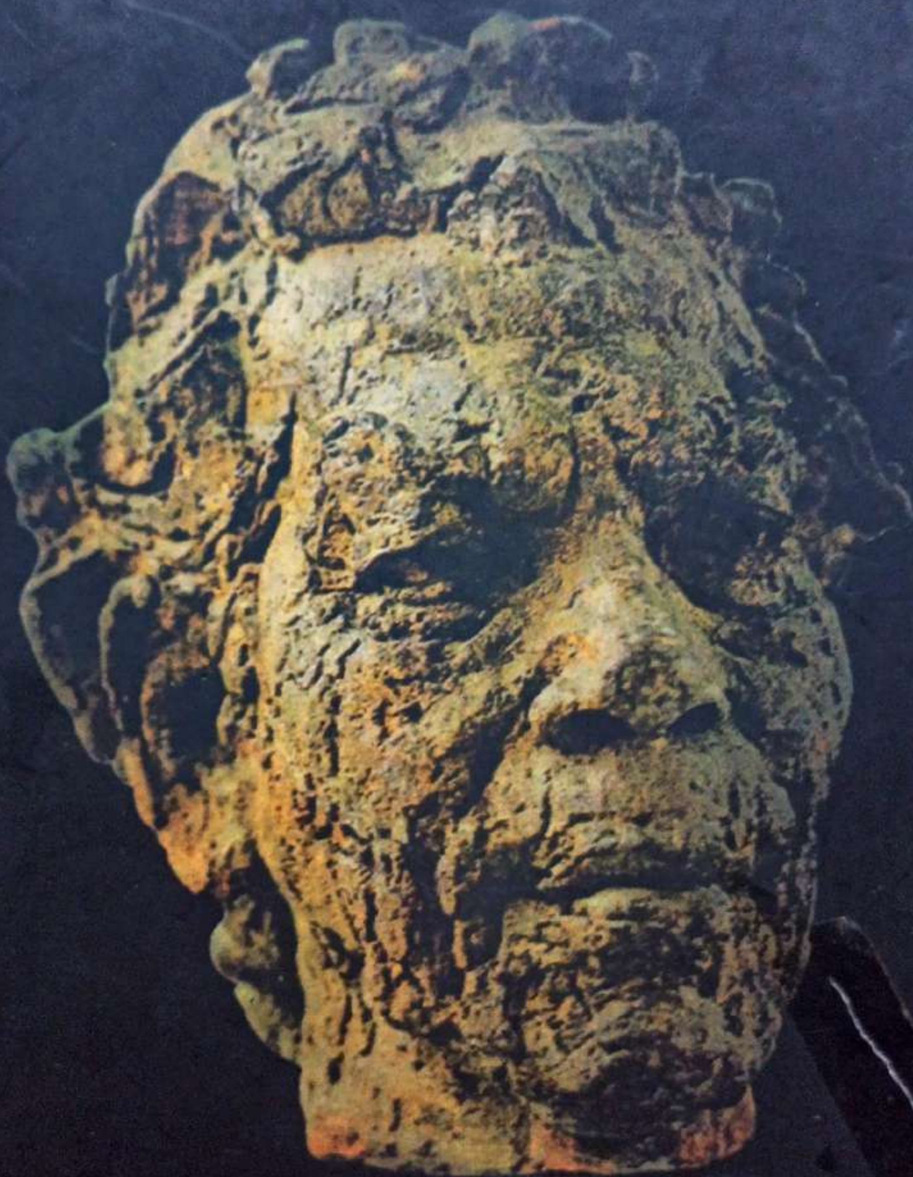
~~কালজয়ী~~ অপাঙ্‌ক্তেয় রামকিঙ্কর বেইজ



শিবপ্রসাদ বেইজ

সম্পাদনা ও সংযোজন : তাপস কর রায়

~~কালজয়ী~~ অপাঙ্‌ক্তেয় রামকিঙ্কর বেইজ

শিবপ্রসাদ বেইজ

সম্পাদনা ও সংযোজন
তাপস কর রায়

~~Baij~~vai AApantaio Ramkinkar Baij
a true story about Ramkinkar & his family
by Shiboprasad Baij

সম্পাদনা ও সংযোজনা ঃ তাপস কর রায়

প্রকাশক ঃ সোনালী কর রায়
কল্যাণগ্রাম - ৫, পোঃ আছড়া, বর্ধমান।

গ্রন্থস্বত্ব ঃ সোনালী কর রায় এবং শিবপ্রসাদ বেইজ।

প্রচ্ছদ ঃ ভাস্কর্য ও আলোক চিত্র - শর্বরী রায়চৌধুরী

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ তাপস কর রায় ও জয়দীপ মুখোপাধ্যায়

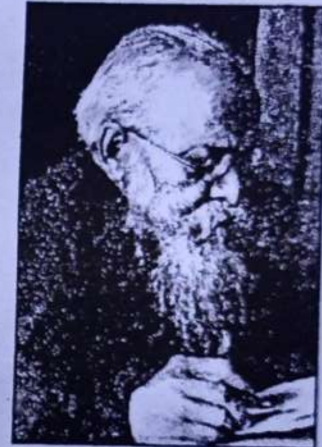
প্রথম প্রকাশ ঃ সুভাষ গ্রামীণ বইমেলা / রূপনারায়ণপুর
১ বৈশাখ, ১৪১৬ (১৫ এপ্রিল, ২০০৯)

মুদ্রণ ঃ এস. এন্ড. এস. এ্যান্টারপ্রাইজ
দুর্গামন্দির রোড, রূপনারায়ণপুর (বর্ধমান)।

প্রাপ্তিস্থান ঃ বীণাপাণি পুস্তকালয়/ আমলাদহি মার্কেট / চিত্তরঞ্জন।

দাস বুক স্টল / ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট/ কলকাতা - ৭৩

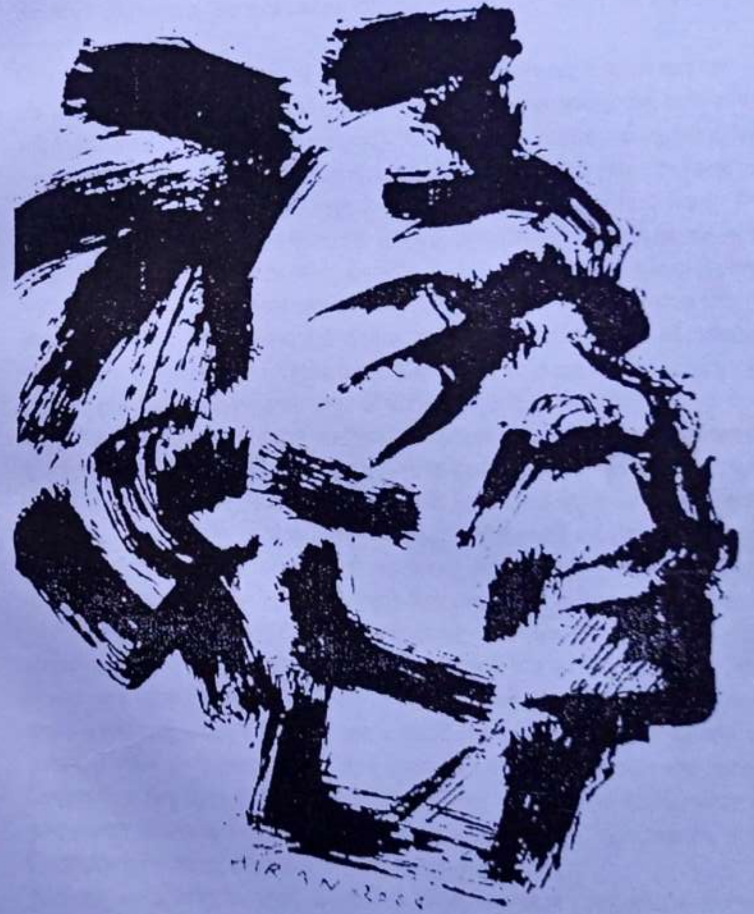
সাহায্য ২৫০ টাকা মাত্র



উৎসর্গ

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রামানন্দ ঃ ২৯.০৫.১৮৬৫ – ৩০.০৯ ১৯৪৩



শিল্পী - হিরণ মিত্র।

এই বই নিয়ে কিছু কথা....

এক শীতের সকালে আমি শিবুদার বাড়ি যাই, কথায় কথায় আমার সংগ্রহে থাকা রামকিঙ্করের ওপর কোন বই আছে কিনা তার খোঁজখবর নেন, এবং 'কালজয়ী রামকিঙ্কর' বইটির করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ও প্রকাশনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব আমাকে তখনই দিতে চান। আমি রাজী হই, সতেরো মাস ধরে চলে বইটির কাজ। আরো একটা বড় কথা হলো আজ পর্যন্ত রামকিঙ্করের ওপর অনেক বই লেখা হয়েছে কিন্তু রামকিঙ্করের পরিবার থেকে এই প্রথম কাজটি করা হলো তার মাত্রা আলাদা তো বটেই।

বইটির ব্যাপারে আমাকে মাঝেমধ্যেই বাঁকুড়া শান্তিনিকেতন কলকাতা ও নানান জায়গায় যেত হত বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা বা খোঁজ খবর নিতে হত, নানা অজানা তথ্য আমি জানতে পাই। বহুজায়গায় বা বহু অংশে বইটির বহুলাইন নির্মমভাবে কেটে দিয়েছি এবং প্রচুর জুড়েছিও। সংযোজন 'এক' 'দুই' এর ক্ষেত্রে অনেক পরে ঠিক করা হয় প্রায় বইটি শেষ হয়ে যাবার পর, 'অন্য প্রকাশ দাস' এর ক্ষেত্রে বলতে গেলে – শিবুদা আমায় ছবি (রামকিঙ্করের) অন্তর্ধান নিয়ে নানান আলোচনা করেন ও প্রকাশ দাস তার ভাইদের নানান চিঠিপত্র বিভিন্ন কাগজপত্র দেখান মূলত সেখান থেকে উঠে এসেছে 'অন্য প্রকাশ দাস' এর সংযোজন। আমার কাজ সম্পাদনা করার, কারো পক্ষে-বিপক্ষে যাবার জন্য নয়, মানুষ সত্যিটা জানুক। খুলে যাক অনেক কিছু ...। কাজটা করতে গিয়ে এমন বহু কথা উঠে এসেছে তা শুধু চা-এর দোকানে আলোচনা করা যায়, ছাপানো যায় না কারণ, প্রমাণ। বইটির কভারের ছবি নিতে শান্তিনিকেতন যাই। ভাস্কর শর্বরী চৌধুরীর বাড়ি, অনেক গল্প হবার পর ওনার স্ত্রী রামকিঙ্করের শেষ জীবনে চরম অবহেলার অনেক কথা বললেন, অনেকটা দায় চাপালেন রামকিঙ্করের পরিবারের ওপর, উনি বললেন (অতি আন্তরিক ও মর্মস্পর্শী সঙ্গে করুণ কাতর ভাবে প্রায় ককিয়ে ককিয়ে) ও সময়টায় (অসুখ থাকার সময়) যদি পরিবারের একটু সেবা পেতেন তা হলে অত কষ্টে তাঁকে মরতে হতনা একপ্রকার বিনা যত্নে মরতে হল, কেউ দেখলনা, কেউ না। শিবুদা তখন রাধারাণির কোর্টে বল ঠেলে দেন। শিবুদার বক্তব্য – রাধারাণী দিদিমা আমাদের পছন্দ করতেন না, কোন রকম কিছু করার সুযোগ দিতেন না উনি। কিন্তু আমার বারবার মনে হয়েছে (যুক্তি দিয়ে) সারাজীবন রামকিঙ্করকে সবাই ব্যবহার করেছে। অর্থ করেছে নিকট। আর্থিক দিক দিয়ে রামকিঙ্কর যথেষ্ট বলবান ছিলেন, তার টাকাপয়সার কাগজপত্র দেখলেই বোঝা যায়। সেগুলো যেত কোথায় ? উনি উদাসীন ছিলেন! না শিকার হতেন? কেন তাকে বিছানা বাঁচাতে অয়েলপেন্টিং মশারির ওপর বিছাতে হত ? কেন ছাদফুটো থাকত ? শর্বরীবাবু একটা ঘটনা শোনালেন রাধারাণী গড়াইয়ের বিষয়ে, রামকিঙ্কর সদ্য মারা গেছেন, একদিন দুপুরে রাধারাণী তার কাছে এলেন সঙ্গে রামকিঙ্করের বাঁধানো দাঁত, বললেন, 'এগুলো নিয়ে কিছু টাকা যদি দেন।' শরর্বীবাবু বললেন, 'আমি আঁতকে উঠেছি, আমার প্রিয় মাস্টারমশাই কিঙ্করদার দাঁত, তুমি কি বলছো? তুমি টাকা চাও দিচ্ছি, একথা কি বলছো, কিঙ্করদাকে বিক্রি করছো।' চিক্‌চিক্ করে চোখের কোণা।

রামকিঙ্কর একটা প্রতিষ্ঠান, আগে একটা লেখাতে জানিয়ে ছিলাম। রামকিঙ্করের এখনো বহু অপ্রকাশিত নানান ছবি আলোকচিত্র বহু মূল্যবান নিজের লেখাপত্র এদিক ওদিক ছড়ানো ছিটানো রয়েছে। এরকম একজনের কাছে রামকিঙ্করের নানান ফটোগ্রাফ ও অন্যান্য অনেক কিছু রয়েছে। আমি তাঁকে একটা চিঠি দিয়ে বলি আপনার তোলা ছবিগুলো দিয়ে যদি একটা বই করা যায়

— উনি শুরুতেই পঞ্চাশ হাজার টাকার দাবী করলেন, বললেন — আগে টাকা পরে বই। এই জন্যে পরে আর এগোইনি আমি। একজনের সাক্ষাৎকার নিতে গেছি তিনিও বললেন — টাকা দিতে হবে, না হলে কথা হবে না। আর একটি অভিজ্ঞতা ভয়ঙ্কর। আরেকজনের কাছে কিছু ছবি কিছু কাগজপত্র রয়েছে। প্রতি বাক্যে একবার 'টাকা' শব্দটি এসেছে একদম মুদ্রাদোষের মত। দুদিন টানা তিন চার ঘন্টা করে বসিয়ে আমায় বিদায় করেছিলেন। কিন্তু তিনি কথা দিয়েছিলেন জিনিসগুলি দেখাবেন। তা হয়নি শুধুমাত্র টাকার জন্য, ইচ্ছে ছিল 'অপ্রকাশিত রামকিঙ্কর'-এ প্রকাশ করব সেসব। লোকে একসঙ্গে সেসব দেখতে পেত, হলোনা। টাকার দাবী থাকবে মানছি, কিন্তু একটু শালীনতা আশা করা যায় না? রামকিঙ্কর কি মাছ-মাংস? আমি কাজ করতে গিয়ে দেখেছি সত্যিই তিনি মাছ-মাংস, আমরা খুবলে খুবলে খাব। রামকিঙ্করের কঙ্কাল বহুদিন আগেই আমি দেখেছি। রামকিঙ্করের নাম করলে একাধিক প্রতিষ্ঠান মুখ ঢাকেন, লজ্জায় নয়, এড়িয়ে যেতে। সদিচ্ছা কোনদিন প্রকাশ পায়নি রামকিঙ্করের জন্য কিছু করব, যা হয়েছে তা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হয়েছে সেটা প্রমাণ হয়েছে বারবার। অন্য রাজ্যে এগুলো কি হত? কি জানি! মূর্তি ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে, ছবি চুরি হয়ে যাচ্ছে তার কোন প্রতিবাদ হয়নি কলকাতা থেকে। কলকাতা রামকিঙ্করকে কোনদিনও গ্রহণ করেনি। 'নগ্ন সরস্বতী' আঁকার জন্য হুসেন সারা দেশে সমলোচিত হন, হুসেনের জন্য তাদের (কলকাতার শিল্পীবৃন্দ) কি হাহাকার! হুড়োহুড়ি! কলকাতার তাবড় তাবড় শিল্পী একাধিক ভুল বানানের একটা ফেস্টুন নিয়ে ধিক্কারে মিছিল বার করেন হুসেনের সপক্ষে। মহানগর কলকাতার ভণ্ডামি। কলকাতার তকমা দেওয়া 'মাতাল' রামকিঙ্করের ভাগ্যে ঐ জাতিয় কোন শিকে ছেড়েনি। এখন যে রামকিঙ্করের তৈরী মূর্তি দেখি কলকাতায়, সেটি রেপ্লিকা। বেমানান একটি জায়গায় বসানো হয় (কলের বাঁশি) মূর্তিটি। শিল্পকলার সঙ্গে কোনদিন যুক্ত নন একাধিক কলকাতার লোক রামকিঙ্করের কাজে বাধা দিয়ে গেছেন। ব্যঙ্গ করেছেন তাঁর কাজকে। এই সেদিন রামকিঙ্করের জন্ম শতর্বষ উৎযাপন হল, সেদিন কলকাতা তাঁকে সম্মান দেয়নি। যেটুকু হয়েছে কলকাতার বাইরে। অনেকেই হয়ত বলতে পারেন এই বই এর সঙ্গে এসব বলার কি সম্পর্ক আছে? সংস্কৃতির পিঠস্থান 'কলকাতা' বলেই তো বলা এসব। যা বললাম এসব কি মিথ্যা? রামকিঙ্করকে শ্রদ্ধা ভালবেসেই বলা। ২০০১ এ পিকাসোর প্রদর্শনী ভারতের নানা শহরে এলেও কলকাতায় আসেনি। কলকাতায় নাকি আন্তর্জাতিক মানের গ্যালারি নেই। খারাপ লাগে। রামকিঙ্করের বন্ধুরাও চেয়েছিলেন রামকিঙ্করের কাজের ওপর একটা সংগ্রহশালা হোক। হতেই পারত, কিন্তু হয়নি।

শিবুদাকে আরো সময় নিয়ে বইটি করতে বলেছিলাম, উনি ধৈর্য রাখতে পারলেন না, তাড়াহুড়োয় অনেক অংশে গলদ রয়ে গেল, সেই দায় নিচ্ছি না। সংযোজন দুয়ে অর্থাৎ 'অপ্রকাশিত রামকিঙ্কর'-এ যে সমস্ত জিনিসের ছবি ইত্যাদি ছাপানো হলো তা শিবুদার কাছে ফাইল বন্ধ অবস্থায় ছিল, দীর্ঘদিন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সেগুলো এক জায়গায় করি, আমার স্টুডিও 'মাটি'তে রামকিঙ্কর জন্ম শতবর্ষে সে সব প্রদর্শন করা হয়, সেই অর্থে 'অপ্রকাশিত রামকিঙ্কর' পুরোপুরি অপ্রকাশিত নয়, তবে বই আকারে প্রথম।

এই বই প্রকাশের জন্য যাদের কাছে বিন্দুমাত্র সাহায্য পেয়েছি তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা রেখে শেষ করলাম।

তাপস কর রায়

গোড়ার কথা

রামকিঙ্করের জীবনের নানান ঘটনা তাঁর বাণী ও বিভিন্ন গুণীজনের মন্তব্য বিশেষ সংগ্রহ করে পৃথক পরিচ্ছেদে সদৃশ অনুযায়ী সাজলে কেমন হয় — এই ভাবনার জাবরকাটা চলছিল দীর্ঘদিন ধরেই। অতঃপর তাঁর জন্মশতবর্ষে সেই ভাবনায় ইন্ধন জোগাল আসানসোল সংলগ্ন কল্যাণগ্রামের বাসিন্দা ভাস্কর শ্রী তাপস কর রায়। তিনি তাঁর সংগ্রহে রামকিঙ্করের উপর বহু গ্রন্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। যেমন করেছে শ্রী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। এছাড়া তাপস কর রায়ের কাছে পেয়েছি বইটি প্রকাশ করার ব্যাপারে শুরু থেকে শেষ অবধি যাবতীয় সহযোগিতা। তিনি রামকিঙ্করকে ভালবেসে বইটি সম্পাদনার মত গুরু-দায়িত্বও নিয়েছেন। এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। আমরা রামকিঙ্করের পরিবারের লোকেরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে। তাই দীর্ঘদিনের জমিয়ে রাখা বহু কথা, বহু ব্যথা আজ আমজনতার দরবারে পৌছে দিতে পারলাম। কৃতজ্ঞ শ্রী জয়দীপের কাছেও।

রামকিঙ্করের জীবনের যে ট্রাজেডি তা সারা দেশে শুধু নয়, এই পৃথিবীতেই বিরল ঘটনা। কত আঘাত অপমান নিগ্রহ ও বাধার শিকার হয়েছেন তিনি। সেসব এক জায়গায় এনে ধরলে হৃদয় যেমন ভারাক্রান্ত হয় তেমনি তা দেশের কাছে এতটাই লজ্জাজনক যে ভাষায় প্রকাশ পায় না। কত কাজ তিনি করতে পারেন নি অর্থাভাবে। কত কাজ বাতিল হয়েছে। সংস্কৃতির পীঠস্থান বলে পরিচিত কলকাতা থেকেও ফিরে এসেছে কালজয়ী ভাস্কর রামকিঙ্করের পাঠানো নেতাজীর ম্যাকেট — উদ্যোক্তাদের অপছন্দের কারণে। তিনি কালজয়ী সাথে সাথে তিনি অপাঙ্ক্তেয়ও। হ্যাঁ, একথা সর্বজন বিদিত আজ — আজও অধিকাংশ অভিজাত শ্রেণির চোখে। তাই তাঁর জন্মশতবর্ষে একটা স্মরণ সংখ্যা বের হয় না যেখানে তাঁকে নিয়ে গল্প লেখা হয় বিকৃতি করা হয় এবং ভালোমতই একটা ব্যবসার বাজার তৈরী হয়ে যায়। "এ এক তাজ্জব ব্যাপার" — বস্তুত রামকিঙ্কর অনুরাগী মানুষদের কাছে প্রশ্ন রেখে এই উত্তরই পেয়েছি। কিন্তু কেন? অভিজাত সম্প্রদায় থেকে পাওয়া মাতাল অন্ত্যজ প্রভৃতি তাচ্ছিল্য কর বিশেষণে বিভূষিত রামকিঙ্কর তথাপি ম্লান হননি এতটুকুও। তাই হীরেই লাগানো পাঁক ধুয়ে ফেললেই তিনি আবার সগৌরবে দীপ্তি ছড়াতে থাকেন। হা হা হাসিতে আবারও পরিপার্শ্ব মুখরিত হয়ে ওঠে। এমনই এক স্বচ্ছ তথাপি বিতর্কিত মানুষ তথা মহামানবের জীবন পর্যালোচনায় বিশেষ কষ্ট আছে বটে; যে কাহিনীর অনুক্রমিক বর্ণনায় লেখনীর হৃদয় ভারাক্রান্ত হয় — নিস্তেজ হয়ে শুয়ে পড়ে খাতার পাতায় পাতায়। তবু একরোখা লেখনী যে থামেনা। পৃথিবীর ইতিহাসে যেহেতু তিনি এক অতি বিরল বিস্ময়কর ঘটনা, যেখানে এক আকাশ মলিনতা চাপিয়েও রোধ করা যায় না তাঁর গতিকে, টিপারা বাঁশি দিয়ে তাঁর অসীম আনন্দকে ছুঁতে পাবার আনন্দকে।

এই গ্রন্থ উৎসর্গ করেছি সেই মহামানবকে যিনি দেশাত্মবোধের প্রগাঢ় প্রেরণায় বজ্রকঠিন

লেখনী ধরার সাথে সাথে দেশকে গৌরবের উচ্চশিখরে পৌছে দিতে ছুটে বেড়িয়েছেন প্রতিভা অন্বেষণের কাজে। তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। বলতে গেলে আমাদের ঘরের মানুষ তিনি — পরম আপনজন। এই শ্রদ্ধাঞ্জলি একমাত্র তাঁকেই দেওয়া যায়। জয়দীপ মুখোপাধ্যায় রামনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ফোটোগ্রাফটি (উৎসর্গে) ব্যবহার করতে দিয়েছেন, তাকেও ধন্যবাদ।

আমার মনোনীত 'কালজয়ী রামকিঙ্কর' নামটি সামান্য পাল্টে '~~কালজয়ী~~ অপাঙ্ক্তেয় রামকিঙ্কর বেইজ' নামকরণের মধ্য দিয়ে শিরোনামটি যথোপযুক্ত ও সময়োপযোগী হওয়ায় তাপস কর রায় বিশেষ ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। বইটির নামকরণের সার্থকতা এসেছে আশা করা যায়। নমস্কার।

শিবপ্রসাদ বেইজ

ঋণস্বীকার

- রামকিঙ্কর বেইজ / আমি চাক্কিক, রূপকার মাত্র / মন ফকিরা
- বিশ্বভারতী / শান্তিনিকেতন
- আনন্দবাজার পত্রিকা
- যুগান্তর পত্রিকা
- আলাপচারিতায় ঃ শিল্পী রামকিঙ্কর / সৌমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- শিল্প জিজ্ঞাসা ঃ বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়
- চিত্র কথা ঃ বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়
- বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী ঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- রামকিঙ্কর ঃ প্রকাশ দাস
- রামকিঙ্কর ঃ বিশ্বভারতী
- অনন্য রামকিঙ্কর ঃ রবি পাল
- শর্বরী রায়চৌধুরী
- হিরণ মিত্র
- রঞ্জিত মিশ্র
- অজিত মিশ্র (আলোকচিত্রী)

যা থাকছে এই সংকলনে ঃ

রামানন্দ, নন্দলাল ও রামকিঙ্কর

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। রামকিঙ্করের জীবনে এ এক বিশেষ নাম। তাঁর শিল্পী জীবনের মূল মাটি তিনি। তাঁর আদি নিবাস হল পাঠক পাড়ায়। যোগীপাড়া ও পাঠকপাড়া প্রায় পাশাপাশি অবস্থান। ঐ বড়জোর পায়ে হেঁটে তিন, চার মিনিটের পথ। তৎকালীন প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। ব্রিটিশ পরাধীন ভারতবর্ষে শাসকদের রাতের ঘুমকাড়া আমজনতার বিশেষ পরিচিত এই প্রবাসী পত্রিকা সম্পর্কে কিছু বলার চেষ্টা এই অধমের কাছে নেহাৎ-ই বাতুলতার সমান। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ এই বন্ধুটি ছিলেন যেমন তেজোদীপ্ত তেমনি অন্তরে অন্তরে সরল সাদাসিধে মাটির কাছাকাছি এক মানুষ। তাঁর স্বদেশ প্রীতি, পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, হৃদয়বত্তা ও ঔদার্য ইত্যাদি বিষয়ে এখানে কিছু আলোচনা — সমুদ্রকে ঘটি দিয়ে মাপতে যাওয়ারই সামিল। "বড় লোক ব্যস্ত মানুষ, কিন্তু মনে রেখেছিলেন কথাটি। কথাও রেখেছিলেন। পোষ্টকার্ড এসে গেল একদিন আমাকে অবাক করে দিয়ে। বুকের ভেতরটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। আনন্দ, দুঃখ, আশা ভয় সব একসঙ্গে ছেঁকে উঠলো। আমার অকিঞ্চন জীবনে রাজার চিঠি হে। প্র্যাক্‌টিক্যাল মানুষ রামানন্দ বাবু। চিঠিতে বোলপুর যাবার পথেরও নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেটা কাজে লেগেছিল খুব।



গুরু নন্দলালের সাথে রামকিঙ্কর

"রামানন্দ বাবু পরে আমার ছবি বা মূর্তি বিশেষ কিছু দেখেননি। কিন্তু সেদিন হঠাৎ আমার জীবনের মোড়টাই ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন।" রামকিঙ্কর অতীব শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন একথা। মাইনর স্কুলে ব্রাহ্ম সম্মেলনে সভাপতির পদ অলংকৃত করতে তিনি এসেছিলেন কলকাতা থেকে। সেখানে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজনও ছিল। রামকিঙ্করের ছবি ছিলো একটা। তিনি দেখে খুশি হয়েছিলেন। ডেকেছিলেন তাঁকে। "শান্তিনিকেতনে যাও, অনেক শিখতে পারবে ওখানে। আমি গিয়ে চিঠি দেবো তোমাকে।" আর তার কিছুদিন পরেই তাঁর পোষ্টকার্ড পাঠানো ওই শান্তিনিকেতনে যাওয়ার রাস্তা বাতলে।

একথা সর্বজন বিদিত যে রামানন্দ ছিলেন পাকা জহুরী। তিনি খুঁজে খুঁজে প্রতিভা বের করতেন। আর একথাও অনস্বীকার্য যে যত প্রতিভাধরই ছিলেন না কেন রামকিঙ্কর, তা



রামানন্দের গোচরে না এলে যে নিশ্চিতই সুপ্ত থেকে যেত চিরকাল — অন্তত দারিদ্রগ্রস্ত রামকিঙ্করের ক্ষেত্রে কোনো দ্বিরুক্তি চলেনা। তো চিঠি পেয়ে শান্তিনিকেতনে পৌছলে রামানন্দ বিশ্বভারতী কলাভবনের অধ্যক্ষ নন্দলালের সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। নন্দলাল তাঁর ছবি দেখে স্তম্ভিত। "এতো পাকা বাঁশ।" তারপর রামকিঙ্করের দিকে চেয়ে বললেন — "তুমি সবই জানো, আবার এখানে কেন ?" পরে একটু ভেবে বললেন — "আচ্ছা দু, তিন বছর থাকো তো।" তো ভর্ত্তি হয়ে গেলেন কলাভবনে রামকিঙ্কর। বাঁকুড়া যোগীপাড়ার অনন্ত মিস্ত্রির কাছে ছবি আঁকা মূর্তিগড়ার যে প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন তিনি, সেখান থেকে এসে পড়লেন সাগরে। খুব স্নেহ করতেন রামকিঙ্করকে অনন্ত পাল। যা ছিলো তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের কাছে ঈর্ষার। পরবর্তীকালে সেই রামকিঙ্কর নন্দলালের স্নেহধন্য হতে পেরেছিলেন তাঁর বিশেষ অঙ্কন পটুত্ব ও সৌভাগ্যের জোরে। গুরু নন্দলাল শুরু থেকেই সমস্ত রকম সহযোগিতা দিয়ে তাঁর শিল্প সত্ত্বার বিকাশের পথকে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। তাঁকে আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য করার জন্য তাঁর ছবি বিক্রীর চেষ্টা করেছেন। জগদানন্দ রায়ের বইয়ে ইলাস্ট্রেসনের কাজ পাইয়ে দিয়েছেন। রামকিঙ্করের কাজ যাতে স্বীকৃতি পায় তার জন্য প্রতিযোগিতায় তাঁর ছবি পাঠিয়েছেন। লক্ষ্মৌ-এ প্রতিযোগিতায় মেডেল ও পঞ্চাশ টাকা পেয়েছিলেন রামকিঙ্কর। তাইতো তিনি স্মরণ করেছেন সেকথা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতায় যে — "আমার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত ক্ষীণ। এই ক্ষেত্রে নন্দবাবু আমাকে বাঁচিয়ে ছিলেন।" তাঁর স্মরণ করা আরও একটি ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে নন্দলাল রামকিঙ্করের প্রতি কিরূপ সহানুভূতিশীল ও স্নেহপরায়ণ ছিলেন যা হল — দিল্লীর মডার্ন স্কুলে ৬মাসের একটি কাজ পেয়ে, যাওয়ার আগে রামকিঙ্কর একটি ২২ ইঞ্চি মতন মাটির 'সাঁওতাল দম্পতি' গড়ে ছিলেন। সেটি ভাঙা পড়েছিল। নন্দলাল যত্ন করে সূতো দিয়ে বেঁধে সেটি রেখেছিলেন। দিল্লী থেকে ফিরে রামকিঙ্কর যারপরনাই বিস্মিত ও হতবাক তাঁর প্রতি নন্দলালের এই স্নেহাধিক্য দেখে। পরে সাঁওতাল দম্পতিটি বড় করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে নন্দলাল সেই টানাটানির যুগে যথা সম্ভব সবরকম আয়োজনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। জীবন সায়াহ্নে এসে তাই তিনি স্মরণ করেছেন — "আমার মত সামান্য ছাত্রের কাজের প্রতি মাষ্টারমশাই-এর এই দরদ দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। মনে মনে ভেবেছিলাম নন্দবাবুই প্রকৃত আচার্য হবার যোগ্য। বলতে পারো তাঁরই উৎসাহে এই 'সাঁওতাল পরিবার' মূর্তির সৃষ্টি। তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য।" "মূর্তি গড়া বিষয়ে নন্দলালের উপদেশ ছিল – মূর্তি হচ্ছে একটি স্রোতের ধারে ঘূর্ণির মতন - ঘুরে ঘুরে আর শেষ হচ্ছে না, দেখতে দেখতে আর একটা বড় স্রোত এসে পুরনো ঘূর্ণি ভেঙে আরেকটা ঘূর্ণি শুরু করে।" রামকিঙ্করের শিল্পী জীবনে তৃতীয় নয়ন খুলে দিতে এসব ছিল সমুদ্র মন্থনের অমৃতের মতই। এছাড়াও কলাভবনে রক্ষিত ছবির বইয়ের যে অনেকগুলি আলমারী ছিল সেসব ভালো করে দেখা ও হ্যাভেলের লেখা বইগুলি পড়বার জন্য ইংরেজীর প্রফেসর জাহাঙ্গীর বকিল সাহেবের নিকট পড়তে বলা ইত্যাদি উপদেশ নির্দেশগুলি ছিল রামকিঙ্করের জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহের মতই।

বেশ বলিষ্ঠ চেহারার মানুষ ছিলেন নন্দলাল। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, পরণে ধুতি। প্রাচ্য



ও ভারতীয় ঐতিহ্য শিল্পের ভাব ছিল যেন তাঁর মজ্জাগত। শান্তিনিকেতনে আসার আগে নন্দলালের ছবি দেখেছিলেন রামকিঙ্কর ঐ রামানন্দের প্রবাসী পত্রিকার পাতায়। সেই নন্দলালকে গুরু হিসেবে পাবেন —এ ছিল তাঁর কাছে একেবারেই অলীক বা দেবতার বরের মত। আর তাই পরবর্তীকালে গুরু নন্দলাল প্রসঙ্গে আত্মহারা হয়ে উঠতেন তিনি। বলতেন, "অতবড় একজন শিল্পীর কাছে শিক্ষালাভ করেছি —আমার সৌভাগ্য। শিল্পী হিসেবে যেমন মর্যাদাবান, শিক্ষক হিসেবেও তেমনি। অবন স্কুল অব আর্ট যা বলা হয়ে থাকে, তার সবচেয়ে সার্থক ধারক। এতবড় পেইন্টার, এত নিখুত স্ট্রোক। প্রায় সমস্ত ছবির বিষয় বা ব্যাক গ্রাউন্ড খুব সাদামাটা। সাধারণ চরিত্র, কমন ল্যাণ্ড স্কেচ একেবারে গ্রামের কমপ্লিট ক্যারেকটার নিয়ে ওঁর ছবি। আমার ছবি বা মূর্তির অধিকাংশ ক্যারেকটারই যে খুব সাধারণ, তা অনেকটা নন্দবাবুর পরোক্ষ প্রভাব।" তিনি আরো বলেছেন —তাঁর সমস্ত কাজকে একটা সমগ্র হিসেবে দেখতে হবে এবং তার নিরিখে তার সাফাল্যের বিচার করতে হবে। ছবি অলংকরণ, রেখাচিত্র ফ্রেস্কো বা ম্যুরাল - সব একসঙ্গে দেখলে দেখবেন, সর্বত্র তাঁর দক্ষ হাতের ছাপ স্পষ্ট। এবং তা অনুভব করা যাচ্ছে।" এছাড়া বলেছেন — "উপলব্ধির ক্ষমতা আর সংবেদনশীলতাই ছিল তাঁর আসল গুণ, তাঁর প্রতিভার মূল। সেই সঙ্গে শিল্পের গড়নগত মূল্য সম্পর্কেও তাঁর ধারণা ছিল পরিস্কার। এর জোরেই আমি নিজেকে নানা মাধ্যমে প্রকাশ করতে পেরেছি। মূর্তি গড়েছি, ছবি এঁকেছি, ধাতুর পাতে খোদাই করেছি।"

তিনি নন্দলালের ড্রইং-এর কালো রেখার যে টানটান ছন্দ — তা নতুন ভাবে ব্যবহার করেছিলেন তাঁর কালিতে করা কিছু সাদা-কালো ড্রইং-এ। নন্দলালের এই যে কালো রেখার টানটান ছন্দ সেতো তাঁর অভ্যন্তরিণ সুষমাকেই ঘোষণা করে। তাই সেই আপাত কঠোর মানুষটার সম্পর্কে রামকিঙ্কর ন্যায্য কথাই বলেছিলেন যে "নন্দলালের বাইরেটা কঠিন কঠোর মনে হলেও ভেতরটা ছিল স্নেহের রসে ভরা। অনেক তর্ক বিতর্ক হত, অয়েল ওয়েস্টার্ন আর্ট, ন্যুড স্টাডি - ইত্যাদি বিষয়ে। কিন্তু পরমুহূর্তে আবার বন্ধুর মতো ব্যবহার রাখতেন। কারো স্বাধীন চিন্তায় বাধা দেননি কখনো। লোকে যখন তাঁর কাছে এসে বাঁকা প্রশ্ন করেছে —কিঙ্করের এ কাজটার মানে কি ? তিনি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট বা অয়েলের কাজ বিষয়ে বিরূপ থাকা সত্ত্বেও তাদের পাল্টা প্রশ্ন করেছেন, 'ওই যে গাছের ডালটা দেখচো — ওর মানে কি ?'

রামকিঙ্করের Cubisim বা Abstract কাজের বিষয়ে পরবর্তীকালে নন্দলালের হয়ত একটা আস্থা এসে গিয়েছিল আর তাই তিনি রামকিঙ্করের সমালোচকদের কাছে রামকিঙ্করকে defend করার চেষ্টা করতেন। এবং তেল রঙে আঁকা ছবির ব্যাপারে তাঁর বীতরাগ থাকলেও বাধা না দিয়ে বরং ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনীতে রামকিঙ্করের জলরং আঁকা ছবির সঙ্গে তেলরঙের ছবিও পাঠিয়েছেন। মনে রাখতে হবে, রামকিঙ্করই প্রথম কলাভবনে তেলরং ব্যবহার করেছেন। তখন সম্ভবতঃ ১৯৩৮ সাল। সাঁওতাল পরিবার মূর্তি নির্মাণের কাজটি চলছে। খালি গায়ে তালপাতার বিশাল টুপি পরা রামকিঙ্কর দু-আঙ্গুলের ফাঁকে বিড়ি ধরে দারুণ রোদ্দুরের দিনে দুপুর বেলায় উঁচু মাচার উপরে দাঁড়িয়ে কাজ করে চলেছেন। মাঝে মাঝে মাচা ছেড়ে নীচে নেমে আসছেন করে যাওয়া কাজকে আরও ভালভাবে দেখে



নেওয়ার জন্য। মাষ্টারমশাই নন্দলাল বসে আছে — পাশেই ক্যাম্পে মাথায় গামছা বেঁধে। কাজ দেখছেন তিনি। রামকিঙ্করকে বললেন — "তোমার সাঁওতালের মাথাটা একটু যদি ঝুঁকিয়ে দাও তো বোধহয় জমে যায় বেশ, ভেবে দেখো।" রামকিঙ্কর কোনরূপ দ্বিধা না করে তৎক্ষণাৎ তাই করেছিলেন। আর দেখলেন এতক্ষণ ধরে তিনি যা চাইছিলেন তা এসে গেল। তিনি অবাক। "কী অদ্ভুত শিল্পী! আমি কি চাইছি উনি কাজ দেখে টের পেয়ে যান ঠিক। এ জিনিস্ আর কারো মধ্যে দেখিনি। একবার নয়, বারবার হয়েছে এমন। রিয়্যাল আর্টিস্ট আর টিচার।" একথা গভীর শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করেছেন রামকিঙ্কর তাঁর জীবন গোধূলিতে। এই ধরণের আরো একটি বৈপ্লবিক সাজেশন তিনি শুনেছিলেন তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের কাছে ১৯৫৬ সালে 'কলের বাঁশি' মূর্তিটির কাজ চলাকালীন। বলেছিলেন, 'তোমার দুটো ফিগারই সামনে তাকিয়ে চলেছে। মেয়ের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারনা।' বলেই চলে গিয়েছিলেন। মূর্তিটির কাজ প্রায় শেষ, এমনি সময়ে নন্দলালের এই মন্তব্যে রামকিঙ্কর চমকে উঠলেন। বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন তাঁর সারা শরীরে। তিনি বলেছেন — "তীরের মতো গিয়ে বিঁধলো কথাটা। একেই বলে আর্টিস্ট। দেখো আমার মূর্তিটিকে উনি স্টাডি করেছেন আমার চেয়ে বেশি।" তারপর দমাদ্দম হাতুড়ির ঘা লাগালেন রামকিঙ্কর। একটি মেয়ের মাথা গুড়িয়ে দিলেন। তারপর সেই মেয়ে যখন ঘাড় ঘুরিয়ে পিছন ফিরে তাকালো, রামকিঙ্করের মাথাই গিয়েছিল ঘুরে। বলেছেন — "মাষ্টারমশাই যে কতবড় আর্টিস্ট সেদিন বুঝেছিলাম। আমার মূর্তিটা বদলে দিলেন একটি মাত্র সাজেসনে। .... অনেকখানি জোর এসে গেল কাজটাতে। আমি তো অবাক।" বলা বাহুল্য যে, নন্দলাল ছিলেন বহু বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ এক ব্যক্তিত্ব। রামকিঙ্করের এক ছাত্র শ্রী রবি পাল বলেন — "তিনি গ্রীক মিশরীয়, বাইজেনটাইন, গথিক প্রভৃতি শিল্প শৈলীর সূক্ষ্ম ছায়া রেখেছিলেন তাঁর ছবিতে অপূর্ব দক্ষতায়। আবার চীন জাপানের করণ কৌশল ও বিষয় নির্বাচনের গোপন রহস্য খুব ভালোভাবে আয়ত্ব করেছিলেন। শিক্ষক হিসেবে তিনি স্বাধীন চিন্তায় কখনো বাধা সৃষ্টি করতেন না। যেটা যার অভিরুচি, সেটার উৎসাহ দিতেন এবং সেই ভাবে নিজেকে ভাবিয়ে তার গলদ, কোথায় স্বাদের অভাব ঘটেছে সেটাই বোঝাতেন, বলতেন রামকিঙ্কর। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের বলতেন – 'তোমাদের মনে দোল খাওয়া ছন্দ তোমাদের মত হবে। আমার ছন্দ হবে আমার মত। নইলে মজা নেই। এই তো ছবি। এই কবিতা।' তিনি তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের ছবিকে আমূল পরিবর্তন না করে দিয়ে বরং সংযোজনের পক্ষপাতি ছিলেন। একটু আধটু যা না বললেই নয় সেইটুকু বলতেন। পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন। নন্দলালের এই সমস্ত গুণগুলিই রামকিঙ্কর গ্রহণ করেছিলেন পরম শ্রদ্ধায়।" আর তাই তার নিজের শিল্পীজীবনও বেড়ে উঠেছিল স্বাধীনভাবে অত্যন্ত সাবলীল ছন্দে। নন্দলালের মতো প্রতিভাদীপ্ত, ব্যক্তিত্বের অপূর্ব শিক্ষণ পদ্ধতি যা ছিল বিনোদবিহারীর ভাষায় "পাঠক্রমরূপে কাঁচি দিয়ে নন্দলার গাছের ডালপালা কেটে সব গাছকে একরঙে সাজিয়ে তোলবার চেষ্টা করেননি। যার ফলে রামকিঙ্কর নিজের ঢঙে তাঁর ডালপালা মেলতে পেরে ছিলেন অনায়াসেই।"



"নন্দলাল বস্তুত পরম্পরাগত শিল্প দৃষ্টান্ত ধরে লক্ষ্যে পৌঁছবার যুক্তিকে সামনে রেখে তিনি শিল্প প্রচেষ্টার স্বৈরাচারকে প্রশ্রয় দিতে চাননি। অপর দিকে তৎকালীন বেঙ্গল স্কুলের পরিপার্শ্ব জগতের সঙ্গে সংশ্রবহীন সৌখিন অতীতগামীতাকেও অকুণ্ঠভাবে মেনে নিতে পারেননি। পশ্চিমী আধুনিক শিল্পের ক্রিয়া কাণ্ডের প্রভাবে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব নয়, দেশজ শিল্প ঐতিহ্য থেকে বিভ্রান্তি বা বিয়োজনও নয় বরং তা থেকে নিজস্ব শিল্প আঙ্গিকের সম্ভবপর সমৃদ্ধি ইত্যাদির শিক্ষা বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর যে গুরু নন্দলালের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন — একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে।" শিল্পী শ্রী অরুণ পালের এই বিশ্লেষণী মন্তব্যটি যথার্থই প্রানিধান যোগ্য।

বস্তুত নন্দলালের শিল্প প্রতিভা সম্পর্কে বলতে গিয়ে রামকিঙ্কর যে জিনিসটিকে জোর দিয়েছেন তা হল, "উপলব্ধি ক্ষমতা আর সংবেদনশীলতাই ছিল তাঁর আসলগুণ, তাঁর প্রতিভার মূল। সেই সঙ্গে শিল্পের গড়ন গত মূল সম্পর্কেও তাঁর ধারণা ছিল পরিস্কার।" কি ছবি কি অলংকরণ কি রেখাচিত্র। ফ্রেস্কো বা ম্যুরাল এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই নন্দলালের অগাধ সাফল্যই পরবর্তীকালে রামকিঙ্করকে তাঁর সারাজীবন ব্যাপী বিভিন্ন মাধ্যমে নিজস্ব কাজ করায় উৎসাহিত করেছে। মাষ্টারমশাই নন্দলাল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র রামকিঙ্করের কাজের বিষয়ে পরবর্ত্তীকালে এতটাই আস্থাশীল হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর মডেলিং অয়েল পেন্টিং, কি সিমেন্ট কংক্রিটের কাজ কোনো ব্যাপারেই আর বিরূপ হতে পারতেন না কেননা তিনি যতই না প্রাচ্য ও ভারতীয় ঐতিহ্য শিল্পের প্রতি অনুগত ছিলেন না কেন তাঁর বিশাল উন্মুক্ত মনের জানালা দিয়ে রামকিঙ্করের যে ইনট্যুইশান তা ধরা পড়ে গিয়েছিলো। তাইতো তিনি বলতেন — "আগে কিঙ্করের মতো আঁকতে শেখো। চোখ তৈরী হোক তারপর যা কর মেনে নেব।" 'সাঁওতাল পরিবার' সম্বন্ধে তদানীন্তন কিছু অধ্যাপকদের বিরূপ মন্তব্য বা অনুযোগের উত্তরে বলেছেন — "ওর শিল্পে সিদ্ধিই লাভ হয়ে গেছে। যা করে ভাল শিল্পই হয় তাই আমি উৎসাহ দিই।" তাঁর একটি খুব প্রিয় উদাহরণ ছিল — "যে খুঁড়িয়ে চলে, সে যদি বলে আমি খুঁড়িয়ে চলছি না, এটা আমার নাচের ছন্দ। তাহলে মানবো কি করে। জানি, নৃত্যের ছন্দ আয়ত্ব করা হাঁটা থেকে অনেক উচু স্তরের জিনিস। আমি বলব। আগে কয়েক পা সোজা হেঁটে দেখাও। তারপর মেনে নেব তুমি খোঁড়া নও, সত্যিই নৃত্যে পারদর্শী। কিঙ্করের কাজে হাঁটাও আছে, আবার নাচের ভঙ্গীও আছে।" প্রসঙ্গত সাম্প্রতিক কালের অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্ট বিষয়ে যেরকম বাড়াবাড়ি সেক্ষেত্রে তাঁর এই বাণী যে বিশেষ মন্তব্য তা বলাই বাহুল্য।

কালো বাড়ির দেওয়ালে রামকিঙ্কর মাটি দিয়ে মূর্তি গড়ছেন। একদিন দুপুরবেলা আচার্য নন্দলাল বিনোদবিহারীর স্টুডিওতে এসে উপস্থিত। বললেন "বিনোদ গিয়ে দ্যাখো রামকিঙ্কর মাটির কাজ করছে। তার হাতের dexterity দেখে বুক কেঁপে যায়। একি আর এক জন্মের সাধনায় হয়েছে। অনেক জন্মের সাধনা নিয়ে কিঙ্কর জন্মেছে।" এমনই ছিল — রামকিঙ্করের কাজের প্রতি তাঁর বিশেষ সমর্থন। রামকিঙ্করকে তিনি বুঝেছিলেন বলে তাঁর শিল্প প্রতিভাকে কিভাবে সম্পূর্ণ প্রকাশের আলোতে নিয়ে আসা যায় সে বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ ও বিশেষ



যত্নশীল ছিলেন।

আর গুরু নন্দলাল যে রামকিঙ্করের প্রতি ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত স্নেহশীল হয়ে পড়েছিলেন রামকিঙ্করও তা খুব স্পষ্ট ভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। আর তাই নন্দলালের প্রতি তাঁর এক সকৃতজ্ঞ গভীর শ্রদ্ধা দিনদিন বেড়েই চলেছিল। এ প্রসঙ্গে রামকিঙ্করের সহপাঠী শ্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন বলেছেন — "গুরু নন্দলালের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি আর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁকে কোন সময়ে গুরুর প্রতি কোন বক্রোক্তি করতে শোনা যায় নি। এমন কি নিজে খ্যাতি ও সম্মাম অর্জন করবার পরেও না।"

রামকিঙ্করের এক ছাত্র — শ্রী অমৃতলাল বেগড়ও প্রত্যেক ছাত্রের কাছে শিক্ষনীয় এক ঘটনার কথা শুনিয়েছেন আমাদের। সেটা ছিল ১৯৪৮ এর ডিসেম্বর মাস। শিক্ষামূলক ভ্রমণে বৌদ্ধগয়া যাত্রা হয়েছিল সেবার। "সেই ভ্রমণে অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে মাষ্টারমশাই ও কিঙ্করদাও ছিলেন। ভ্রমণের শেষ দিনে ক্যাম্প ফায়ার হলো। আগুনের চারধার ঘিরে সকলে বসেছিল কিন্তু কিঙ্করদা সেখানে আসেন নি। মাষ্টারমশাই তাঁকে বললেন, তুমি না এলে, বৈঠক জমবে কি করে? কিঙ্করদা আজ্ঞাকারী ছাত্রের মতো এসে বসে পড়লেন।"এছাড়াও আরও চমকপ্রদ কাহিনী শুনিয়েছেন শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর-গুরু রামকিঙ্কর প্রসঙ্গে এক সুন্দর লেখায় যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ভারতবর্ষের শাশ্বত সেই বাণী ঃ শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়। তিনি নন্দলালের কনিষ্ঠা কন্যা যমুনা বসুর কাছে শোনা এক ঘটনার বিবরণ দিচ্ছেন ঃ নন্দলালের প্রয়াণ ঘটেছে। সমস্ত আশ্রম এক নীরব শোকে স্বজন বিয়োগে ব্যথিত। নন্দলালের কনিষ্ঠা কন্যা যমুনাদি বলছেন, জান রাম বাবার কাজের জন্যে আমরা বলতে বের হয়েছি — হঠাৎ অনেকদূর থেকে কিঙ্করদার ডাকছেন — যমুনা যমুনা। ভাবলুম কিঙ্করদা কি বলবেন, কি বললেন জান! যমুনা, কেবল তোমাদেরই বাবা মারা গেছেন নয় আমারও পিতৃবিয়োগ।" শিল্পী রামানন্দ বলেছেন — নন্দলালের সঙ্গে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্ক ছিল ঠিক পিতা পুত্রের। বাস্তবিক নন্দলাল একথা বলতেনও ঃ "যারা আমার কাছে এসেছে, আমার সঙ্গে এতদিন কাজ করেছে, তাদের সঙ্গে অনেক সময় একমত না হতে পারি। আমার ছেলের সঙ্গেও আমার অনেক বিষয়ে একমত হয় না। তাই বলে তাকে তো ঘরছাড়া করতে পারি না। আমার পুরনো ছাত্রদের সঙ্গে ঐ রকমের সম্পর্ক হয়ে গেছে।" নন্দলালের স্নেহসিক্ত রামকিঙ্কর অকপটে বারবার ব্যক্ত করেছেন — গুরু নন্দলালের বাৎসল্য রস, তাঁর পিতৃসুলভ স্নেহের কথা। বলেছেন —"লোকটা বাইরে গম্ভীর, কখনো বা রুক্ষ। কিন্তু ভিতরে রস আছে — স্নেহের রস, সেও কম নয় হে। খেজুর গাছের মতো। আমি এতো অয়েল ফয়েল করলাম। বলেননি তেমন কিছু ভালো না লাগলেও।" বলেছেন — "আমার কাজ নিয়ে তাঁর উৎসাহ ছিলো কত আর ভাবনাও কখনো কখনো বেশিই ভেবেছেন আমার চেয়ে। ...দারুণ রোদ্দুরের দিন। মাষ্টারমশাই বসে আছেন আমাদের ক্যাম্পে — মাথায় গামছা বেঁধে। কাজ দেখছেন, দেখছেন কাজ করাটাও। তাঁর ঐ বসে থাকাটাই তো মস্ত ব্যাপার হে। কাজে বল জোগায়। বিশ্বাসটা বাড়িয়ে দেয় নিজের উপর।" এ প্রসঙ্গে



একটা কথা বলা যায় যা রামকিঙ্করকে নন্দলাল বলেছিলেন তা হল ঃ "পরের জন্মে যদি শিল্পী হয়ে জন্মাই তবে ভাস্কর্য করব।"

অসাধারণ শিল্প প্রতিভার অধিকারী নন্দলাল রামকিঙ্করকে বুঝেছিলেন যে, তাঁর এই ছাত্রটি সাধারণ নয়। তাই তিনি রাতের বেলা লণ্ঠনের আলোয় রামকিঙ্করের কাজ করা তাঁর অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছেন। এই রকম একটি ঘটনার কথা রামকিঙ্করের জবানি থেকেই আমরা জানতে পারি। "বেশ খানিক পর কাশীর ঢুলুনিতে লণ্ঠন নড়ে যেতেই কাজ থামিয়ে মাচা থেকে নামতে যাবো এমন সময় নজর পড়লো সেই ছায়ার মতো লোকটাও নড়ছে। নেমে কাছে যেতেই আমি তো অবাক। — একেবারে থ। দেখি দাঁড়িয়ে আছেন মাষ্টারমশাই।" এই রাশভারী, চাপা ও গম্ভীর স্বভাবের মানুষটা ছাত্র রামকিঙ্করকে ভালবেসে তাঁর এতটাই নৈকট্যে এসে পড়েছিলেন যা ভাবতে গিয়ে রামকিঙ্করের সৌভাগ্যের প্রতি ঈর্ষা হয়। তো এরকম ঘটনার বিবরণ দিচ্ছেন রামকিঙ্কর — "আমি কাজ করি। মাঝে মাঝে বিড়ি না খেলে চলে না। জানিনা বোধহয় আমার কথা ভেবেই একদিন হঠাৎ বিড়ি চেয়ে নিয়ে খেলেন। আমি তো হতভম্ব। আমার সংকোচ কাটিয়ে দেওয়া আরকি। এমনি মানুষটা চাপা গম্ভীর। একটু দূরে দূরেই থাকতাম তাই। কিন্তু মিশলে দেখা যেত আর এক চেহারা। দরদী বন্ধুর মতো।" এখানে পরিশেষে একটা কথা বলা যায় যে নন্দলাল গুরু হিসেবে ছাত্রদের প্রতি যতটা যত্নশীল ছিলেন তা থেকে হয়ত অনেকটাই ছিলেন খেয়ালী, শিল্প পাগল রামকিঙ্করের প্রতি। আর রামকিঙ্করও যথার্থ ছাত্রের মতো গুরুর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলেই পুরান কাহিনীর আরুণি বা একলব্যের মতো তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যের কাছে পৌঁছে যেতে পেরেছিলেন চারপাশের পাহাড়প্রমাণ অসহযোগিতা, নিন্দা, সমালোচনা, বক্রোক্তি, অপমান এমনকি বেত্রাঘাতের মতো চরম লাঞ্ছনার শিকার হওয়া সত্ত্বেও।

আমরা যারা বিশ্বাস করি ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক গুরু বা পথপ্রদর্শক শ্রী শঙ্করাচার্যের কথা, যা হল — মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষ সংসর্গ — এই তিনের সংযোগেই কেবল একজন মানুষের জীবনে আত্মিক চরমোৎকর্ষ বা সিদ্ধিলাভ হয়ে থাকে। সেই মতাদর্শে বা দৃষ্টিকোণে রামকিঙ্করকে আমরা যদি ফেলি তাহলে দেখব তাঁর মনুষ্যত্ব ও শিল্পে সিদ্ধিলাভের প্রবল ইচ্ছা ও রামানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের মত মহাপুরুষদের সংসর্গ বা সান্নিধ্যের ফলেই তাঁর জীবনে অবধারিতভাবে শিল্পে পরাকাষ্ঠা এসেছিল যা দেখে দুনিয়া আজ স্তম্ভিত ও নতজানু হতে বাধ্য।

তিনি পেয়েছিলেন শিল্পে সামগ্রিক ব্যঞ্জনাসহ তার চরম উপলব্ধিটিকে। ধন্য হয়েছিলেন। পরম আনন্দ বা ব্রহ্মানন্দের স্বাদ তিনি পেয়েছিলেন ঐ শিল্প প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই। আর সে কারণেই সন্ন্যাসীর মত নিরাসক্ত উদাসীন মানসিকতায় ব্যবসায়িক লাভালাভের কথা উড়িয়ে দিয়ে অবলীলায় 'কী ধনে হইয়া ধনী মনিরে মান না মনি' চিত্তে বৃষ্টির দিনে ফুটো চাল বেয়ে জলধারা আড়াল করতে মশারীর উপর অমূল্য অয়েল পেন্টিংগুলো বিছিয়ে দিব্বি নাক ডাকিয়েছেন। মনীষী নন্দলাল তাইতো বহু আগেই সেকথা বলে দিয়েছিলেন যে, "কিঙ্করের সিদ্ধিলাভ হয়েছে, ওসব করতে পারে।" □

বললেন, "জানেন আমার গুরু কে ? গুরু আমার রবীন্দ্রনাথ, কৌপিন বিহীন গুরু। আমার যা কিছু সবই ঐ গুরুর কাছে পেয়েছি।" প্রতিবেশী হৃষিকেশ চন্দ মহাশয়কে একথা বলেছিলেন রামকিঙ্কর। কেন? আমরা জানি যে তাঁর গুরু হলের নন্দলাল। তবে তাঁর এ হেন মন্তব্য? আসলে বিভিন্ন শিল্প বোদ্ধার লেখনী থেকে আমরা যা জেনেছি তা হল এই যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভাবজগতের একেবারে চূড়ান্ত চূড়ার অধিবাসী। তিনি সারা বিশ্বটা চষে যে অমূল্য অনুভূতির মুখোমুখি হয়েছিলেন তা তৎকালীন কোনো শিল্প স্রষ্টার রচনায় দেখতে পাননি। এজন্য ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অস্থির থেকেছেন। অনুযোগ করেছেন যে অবনগগনের ছবি মন ভরায় না। তাই ঐতিহ্যের প্রতি কঠোর হয়ে বিদেশ থেকে শিল্পীদের ডেকে এনেছেন বিশ্বভারতীর জন্য। নানাভাবে শিল্পে জীবন বইয়ে দেওয়ার জন্য উদ্দীপনা জুগিয়েছেন। এবং শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই ছবি আঁকতে বসে গেছেন। প্রায় দশ-দশটা বছর ছবি আঁকলেন তিনি। তিনিই হলেন প্রথম ভারতীয় যিনি প্রথা ভাঙলেন। বিষয় ও শৈলীগত দিক থেকে ঐতিহ্যকে অস্বীকার করলেন। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে শুধু নয় তিনি আঁকলেন দেশের প্রতি এক দায়বদ্ধতা থেকে প্রয়োজন বোধ থেকে। রামকিঙ্কর তাঁর ছবি আঁকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছেন। তিনি বলেছেন — "আমাদের প্রচলিত শিল্প ধারা থেকে গুরুদেব প্রথম অন্যপথে গেলেন। অন্য অনেক বড় কবি ছবি এঁকেছেন কিন্তু তাদের ছবি অত্যন্ত একাডেমিক। কারণ গুরুদেবের মতো দৃষ্টি শক্তি, অনুভূতির গাঢ়তা তাদের ছিল না।" নন্দলাল যে একটা দৃঢ়মূল শিল্পতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন সেখানে তৎকালীন বেঙ্গল স্কুলের পরিপার্শ্ব জগতের প্রতি সংস্রবহীন ও অতীত মুখর শিল্প ভাবনা ছিলনা। পরিবর্তে পশ্চিমী আধুনিক শিল্পের সাথে দেশজ শিল্প ঐতিহ্যকে মিলিয়ে আত্মশৈলীর সমৃদ্ধি ঘটিয়ে একটা শিল্পী পরিকাঠামো গড়ে তোলায় আগ্রহী ছিলেন। রামকিঙ্কর গুরু নন্দলালের এই প্রচেষ্টাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং কলাভবনে আমন্ত্রিত ইউরোপীয় শিল্পীদের মাধ্যমে আধুনিক শিল্প ভাষা শিক্ষা ও কলাভবন গ্রন্থাগারে নানান বই পত্রে বহু বিদেশী শিল্পী প্রচেষ্টার সাথে পরিচিত হওয়া ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তাঁর ভিতরে এক নতুন শিল্প ভাবনায় ব্রতী হওয়ার উদ্যোগ তৈরী হয়েছিল ঠিক সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথ আঁকতে শুরু করেছিলেন যার অভিব্যঞ্জনা ছিল আধুনিক ভাবধারায় ভরপুর


শিল্পীর হাতে রবীন্দ্রনাথ



এক নতুন শিল্প চেতনা। রামকিঙ্কর তা দেখে বলেছেন — "চিরন্তন, চিরন্তন ব্যাপার, চিরন্তন। এমনি কেউ পারবে না। আমরাও পারব না। অন্য রবীন্দ্রনাথ আসবে।" তিনি তাঁর আঁকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন। তাঁর চিন্তার জগতে আলো খেলে গেল। দিশা পেয়ে গেলেন তিনি। আর হয়তো তাই তিনি বিনা দ্বিধায় বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে "গুরু আমার রবীন্দ্রনাথ। কৌপিন বিহীন গুরু।" এখানে বলাই বেশি যে একথা তাঁর নন্দলালকে অস্বীকার করে কখনোই নয়। কারণ মাটির মূর্তি গড়ার পর যেমন সবশেষে যে চক্ষুদান হয়। হয়তো রামকিঙ্করের জীবনে রবীন্দ্রনাথ তাই করেছিলেন। তিনি তাঁর তৃতীয় নয়ন খুলে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন — "একদিনের কথা মনে হলে গা-টা কাঁটা দিয়ে ওঠে।" রবীন্দ্রনাথ চারদিক নির্জন দেখে নিয়ে কাছে ডেকেছিলেন রামকিঙ্করকে। রামকিঙ্কর অদূরে দাঁড়িয়ে তাঁর পোর্ট্রেট গড়েছিলেন। তিনি গেলেন ভয়ে ভয়ে। বললেন — "বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বি কাজে। শেষ করে আর ফিরে তাকাবি না। ছেড়ে দিবি। আবার ঝাঁপ দিবি অন্য কাজে।" রামকিঙ্কর স্মরণ করেছেন একথা তাঁর জীবনের উপান্তে এসে। বলেছেন — "বলেই চুপ করে গেলেন। আমিও চুপ। মনে মনে বলছি নিজেকে —এতো কথা নয়, এযে মন্ত্রগো। মন্ত্র পেলাম। মন্ত্র দিলেন আমার কানে।" তারপরের ঘটনা রামকিঙ্কর ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে হঠাৎ লক্ষ্য করেন যে তিনি কাঁদছেন। জল ঝরছেতো ঝরছেই। তো এই সমস্ত কিছুই রামকিঙ্করের জীবনে এক একটি টার্নিং পয়েন্ট। আর তারপরই যেন গুটিপোকা ভেঙে বেরিয়ে আসা তাঁর প্রজাপতি হয়ে। আর ফিরে তাকাননি তারপর তিনি। কারণ শিল্পীর যে আটকে থাকলে চলে না। এগোতে গেলেই ছাড়তে হয় এই সারমর্ম তিনি বুঝেছিলেন কবিগুরুর ঐ অমূল্য উপদেশটির মধ্য দিয়ে। গুরুদেবের লাইফ স্টাডির সময়ে মন্ত্রের মত আরেক অমূল্য উপদেশ তিনি পেয়েছিলেন। বলেছেন — "গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের লাইফ স্টাডির সময় একদিন একটি উপদেশ পেয়েছিলাম। লাইফ স্টাডির প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে কাপড় জামার দিকে মন দেওয়াটা শিল্পীর পক্ষে পাপের মতন। আমি তাঁর জামার হাতের কাপড়ের কোঁচ করছিলাম। তিনি বললেন — জামা, জামা, জামা নিয়ে কি হবে। ঐ দেখ ঐ লোকটার রয়েছে জামা গায়ে তাহলে সেটাকেই কপি কর। আমি ঠিক কথা ভেবে তখনি হাতটাই কেটে ফেললেম এবং ঘাড় গোঁজা মূর্তিটি তারই নিদর্শন। হাতটা কেটে পোর্ট্রেটের পার্সোনালিটি প্রকাশ পেলে কিনা সেদিকে নজর দিলাম।" এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ রামকিঙ্করের শিল্প প্রতিভার অন্তরে আঘাত করে তার মূল সুরটিকে টেনে বের করতে সাহায্য করেছিলেন। রামকিঙ্কর তাঁর সেই অমৃতময় বাণী কখনো বিস্মৃত হননি। হতে পারেননি। তিনি সারাজীবন ধরে কি পোর্ট্রেট কি ছবি বা পরিবেশীয় ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে তার মূল সুরটিকে ধরার চেষ্টা করে গেছেন। এবং অন্যদের তা ভূয়োঃ ভূয়োঃ অনুসরণ করতে বলেছেন। তিনি অত্যন্ত সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখেছেন কোন মিডিয়াম ও শৈলীতে জীবনকে অবারিতভাবে বইয়ে দেওয়া যায় শিল্পে। এজন্য খোয়াই এর কাঁকড় মিশিয়েছেন সিমেন্টে। গতির জন্য নির্বাচন করেছেন স্থানীয় আদিবাসীদের কর্মমুখর জীবন যাত্রার বিষয়কে। তিনি কোনো স্কুল অব আর্ট-এর যোগ্য



উত্তরসূরী হতে চাননি যা চাননি রবীন্দ্রনাথ।

তাঁর কথায় রবীন্দ্রনাথ বলতেন — " খালি করে যাও, নতুন নতুন কাজ করো। ওদেশে কত ভালো ভালো কাজ হচ্ছে। তোমরাও করো।" রামকিঙ্কর কতবার অনুপ্রাণিত হয়েছেন তাঁর কথায়। আলোড়িত হয়েছেন। নতুন কিছুর জন্য তাঁর সমগ্র সত্তায় ব্যাকুলতার ঝড় লেগেছে। এবিষয়ে শিল্পী যোগেন চৌধুরীর মন্তব্য "পশ্চিমী শিল্পের প্রভাব ছাড়াও কাছাকাছি রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্ভবতঃ রামকিঙ্করের শিল্পানুভূতি ও স্বাধীন চেতনার উন্মেষে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। আধুনিকতাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুঝতে বা গ্রহণ করতেও গুরুদেবের শিল্পচর্চা সম্ভবতঃ তাঁকে অনেকাংশে সাহায্য করেছিল। রামকিঙ্করের সতেজ প্রাণময় এবং অনুভূতিশীল মন শিল্পচর্চা ও সৌন্দর্যতত্ত্বের গভীর বিষয়টি স্বচ্ছন্দে অনুধাবন করতে পেরেছিল।" রামকিঙ্করের ছাত্র শঙ্খ চৌধুরী বলেছেন — "রবীন্দ্রনাথের ছবি তখনকার শান্তিনিকেতনে গ্রাহ্য ছবির মাপকাঠিতে সবার কাছে প্রিয় হয়নি। গুরুদেবের ছবি বলে অবাক ভক্তি ভরে দূরে থেকে প্রণাম করেছে। তাঁর কাজে আকৃষ্ট হয়ে প্রভাবান্বিত হয়েছে এর দৃষ্টান্ত শান্তিনিকেতন বা বাংলাদেশের শিল্পীদের মধ্যে দেখা যায় না। তেমনই কুটুম-কাটামে আর তার অভিনব রূপমাধুর্যে বা নতুন রসে আমাদের ভাস্করদের মনে রেখাপাত করেছে —এ নিদর্শন পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে রামকিঙ্কর ছবি ও মূর্তিতে ওঁদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত।"

বস্তুত পশ্চিমী আধুনিকতা ও ভারতীয় পরম্পর্যের দ্বন্দ্বের মাঝামাঝি থেকে তিনি তাঁর অনন্য প্রতিভার জোরে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে এদেশীয় ভাষায় বহু ছবি ও ভাস্কর্যের জন্ম দিয়ে বিশ্বকে যে চমকে দিলেন সেখানে রবীন্দ্রনাথে প্রভাব ছিল যে নিশ্চিত সেকথা প্রমাণে বাকবিতণ্ডার আর কোনো অবকাশ থাকে না। রামকিঙ্কর বলেছেন — "রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে কোনো রি-অ্যাকশন হয়নি এখানে। এখানকার লোকে আর ভালোমন্দ কি বলবে। শুনেছে প্যারিস ভালো বলেছে আর খারাপ বলে কি করে।" এ খুব সত্য কথা যা সত্যজিতের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম। বিদেশ পুরস্কার দিল আর আমরা হামলে পড়লাম, লোকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল 'পথের পাঁচালী' দেখতে। আসলে ভারতবর্ষ এমনই। এখানে কোমরের খুব জোর না থাকলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। চলার পথেই শুকিয়ে ঝরে যেতে হয়, হয়ত হা-হুতাশ করারও কেউ থাকে না। তো রামকিঙ্কর এ ব্যাপারে খুব বেঁচে গেছেন তাঁর সৌভাগ্যের জোরে এক মহামানবের দৃষ্টিতে পড়ে গিয়ে। নইলে ভব্য সমাজের মানুষ না



রামকিঙ্করের 'সিরিয়াস' রবীন্দ্রনাথ



হয়েও কিভাবে রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে এসে নন্দলাল ও রবীন্দ্রনাথের ভাবধারায় নিজের শিল্প সত্ত্বার বিকাশ ও পরে অভিব্যক্তি ঘটিয়ে সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তা ভাবলে আশ্চর্যই লাগে। তবু এ প্রসঙ্গে একটা কথা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতেই হয় যে দেশ তার যোগ্য সম্মান তেমন দিল না। সে নাই দিক। রামকিঙ্কর কখনও তার পরোয়াও করতেন না। তাঁকে যখন একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল যে — "কখনও কি মনে হয়নি যে এই শিল্প কাজের বিনিময়ে দেশ তথা সমাজ আপনাকে কী দিল ?" রামকিঙ্কর তার উত্তরে বলেছিলেন "আমি সেরকম ভিখারী নই। ...কিছু চাই না। ... আমি সব কিছুই আমার কাজ থেকেই পেয়ে যাই।" অতীব সত্য একথা। প্রকৃত শিল্পী হলেন একজন সাধক। তাঁর কাছে লাভালাভের কোনো ব্যবসায়িক হিসাব থাকে না। তিনি এসব কিছুর অপেক্ষাও করেন না। সৃষ্টির মধ্যে যে আনন্দ নিহিত থাকে — তাই-ই মূলতঃ তাঁর কাছে লক্ষিত বিষয়। আর ওই নির্মাণ কাজের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ যে পারফেকশন আসে তাই-ই বড় পুরস্কার। আর তাই তো তিনি বলতে পেরেছিলেন — "ছবি আঁকা বা মূর্তি গড়ার পর আমার দায়িত্ব শেষ।" বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ কার জন্য করেছিলেন ? ...সৃষ্টির জন্য... পাগলামি থাকে... নেশা থাকে, সেই-ই সৃষ্টি করে। না, বলতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্পর্কে বলতেন, বাতিকগ্রস্ত, মাথা খারাপ। ...আনন্দই প্রথম।" হ্যাঁ, এবং এই আনন্দেই তিনি কাজ করে গেছেন, যা ছিল তাঁর কাছে "অহৈতুকী।" তিনি বলেছেন, "আর্ট জিনিসটা চিরদিনের ডিস্‌স্যাটিস্‌ফ্যাকসন; অহৈতুকী। বলেছেন — "শিল্পতো এক অর্থে রহস্যময় মায়া। যা আছে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে। তাঁর চিত্রে ইউরোপীয় এক্সপ্রেসনিস্ট আন্দোলনের চরিত্রগত মিল পাওয়া যায়।" রামকিঙ্কর আরো বলেছেন যে "রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রে ধরেন অদৃশ্যকে। আর রবীন্দ্রনাথের গানও তো সেই আরেকভাবে ইনফিনিটিকে ধরেছে।" বোদ্ধা রামকিঙ্কর তাই রবীন্দ্রনাথের গানকে একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন — "আমার কাছে গান মানেই তো বাবা রবীন্দ্রনাথের গান।" রবীন্দ্রনাথের গানকে সাথী করে তিনি তাঁর সারাটা জীবন শিল্প চর্চায় কাটিয়ে দিলেন। ঐ গানই ছিল তাঁর কাছে আত্মার শান্তি, প্রাণের আরাম। উদাত্ত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া তাঁর তৎকালীন শান্তিনিকেতনের কেনা শুনেছে। তাঁর এক ছাত্র শ্রী মিঠারাম ধরমানী লিখেছেন — "মাঝেমধ্যে পূর্ণিমা রাতে তিনি বাইরে এসে এত জোরে গান গাইতেন যে তা অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যেত।" রতনপল্লীর রাত্তিরের আকাশ বাতাস কাঁপানো তাঁর কণ্ঠস্বর এই লেখকের কানেও বাজে। এখনও কান পাতলেই শোনা যা সেই উদাত্ত কণ্ঠ স্বর ঃ ঝরঝর বরিষনে বহু যুগের ওপার... কিম্বা নিদারুণ অকরুণার সাথেরে পিরিতি করিলাম না বুঝিয়া ইত্যাদি গানের লাইনগুলি। তিনি গাইতেন চোখবন্ধ করে রতনপল্লীর মাটির বাড়িতে বাঁশের মোড়ায় বসে। তিনি বলেছেন — "গান গাইতে আমার কিন্তু খুব আনন্দ। আর গান মানেই তো রবীন্দ্রনাথের গান। আমার সবচেয়ে প্রিয় ওঁর গান। যতবারই আমি গুরুদেবের গানের কথা ভাবি, বিস্মিত হই। আনন্দের দিনে গেয়েছি ওঁর গান, দুঃখের রাতেও যখনই যে মুডে সান্ত্বনা পেতে চেয়েছি, ওঁর গান ছাড়া আর কিছুতেই খুঁজে পাইনি।"





রামকিঙ্করের খসড়ায় রবীন্দ্রনাথ

ছবি বা ভাস্কর্যে অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট সম্পর্কে রামকিঙ্কর বলেছেন — "সাধারণ মানুষও হঠাৎ কথা ছাড়া সুর ভেজে চলে — তা করতে ভালোবাসে। অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবিও তাই।" তো রামকিঙ্করের মতো উচ্চ চেতনা ও বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যাক্তিত্বের কাছে ক্লাসিক্যাল গানের ঐ শুধু সুর দিয়ে ইনফিনিটিকে ধরার চেষ্টা যে সহজেই নাড়া দিবে — এ আর বিচিত্র কি ? তিনি বলেছেন — "আমাদের ক্লাসিক্যাল গান একভাবে ইনফিনিটিকে ধরেছে সুর দিয়ে অনুভব দিয়ে। গুরুদেবের গান আবার আরেক ভাবে সেই ইনফিনিটিকেই ধরেছে। সেখানে সুরের সঙ্গে কথাও আছে অর্থও আছে।"

খুব আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে যে বাঁকুড়ার মত একটি পিছিয়ে পড়া জেলার মানুষ রামকিঙ্কর অতি দীন ও ভব্য সমাজের সীমারেখার বাইরে জন্মেও কিভাবে ইউরোপের বড় বড় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীদের যেমন বাক্ মেজার্ট বেটোফেন পলরবসন বা শালিপিয়ানের গানে আলোড়িত হতেন। তাঁদের গানের রেকর্ড বাজাবার অনুরোধ নিয়ে তিনি মাঝে মাঝেই আসন ছেড়ে উঠে আসতেন। একটি রবীন্দ্রগান — "রজনীর শেষ তারা / আঁধারে আধো ঘুমে। / বাণী তব রেখে যাও।" উচুঁ সুরে গাইবার পর তিনি বলেছিলেন — "তোড়ী রাগ সম্বন্ধে গুরুদেবের গভীর জ্ঞান ছিলো এবং এই গান ঐ সুরের চমৎকার মেজাজকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। এই রাগ প্রথম সূর্যের আলোয় প্রকাশিত ভোরের বন্দনা গান করে। এবং এর মধ্যে পাওয়া যায় জীবন ও দৃঢ়তার বাণী। গুরুদেবের গানের মধ্যে একটা চমৎকার বন্দীশ আছে।" বলতেন — নাভিমূল থেকে রবসনের গান উঠে আসে। অন্য দিকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ছিমছাম গায়কেরা মিহি কণ্ঠে গান গেয়ে যান। তাঁদের লাউডস্পিকার এবং অন্যান্য সহযোগী বস্তুর দরকার হয়। কি উদ্ভূত পার্থক্য।" এসব কথাই হল তাঁর প্রিয় ছাত্র দিনকর কৌশিকের স্মৃতিচারণ গুরু রামকিঙ্কর বিষয়ে তাঁর আলোচনার কলামে। দিনকর কৌশিক লিখেছেন — "আমি মনে করি তিনি বাঁকুড়ায় কখনোই 'বাক' 'মেজার্ট' অথবা তোড়া রাগ শোনেনি। কিন্তু বুদ্ধি ও অনুভূতি দিয়ে তিনি সেগুলির প্রতি সারা দিতে পারতেন।" এখানে উল্লেখ্য যে রামকিঙ্কর - বাঁকুড়ার তৎকালীন সঙ্গীতাচার্য রাজেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গীত শিক্ষায়তনে আসা যাওয়া করতেন। রাজেন্দ্রনাথ দত্তের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনে যাওয়ার পরেও চিঠিতে তাঁর সাথে যোগাযোগ বহাল ছিল। এমনই একটি চিঠিতে তিনি রাজেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখেছেন,



শ্রী রাজেনদাদা আপনার চিঠি পেলাম। অতুলেরও চিঠিতে বিস্তারিতভাবে সব জানলাম। ... Staff Notetion-সম্বন্ধে যেটা লিখেছিলাম সেটা একটু বিস্তারিতভাবে লিখতে গেলে যা দাঁড়ায় আমার মতে সেটা হচ্ছে গায়কীর কথা যেটা আমাদের সাধারণ স্বরলিপিতে সাধারণত থাকে না। সেইজন্য অনেক ক্ষেত্রে ঝগড়া হচ্ছে। তাল থাকে স্বর থাকে কিন্তু গায়কির আভাস থাকে না। Staff Notetion-এ এটার একটা মোটামুটি আভাস থাকে। এরমধ্যে আরো কিছু কিছু চিহ্ন থাকে তাতে করে একটা ব্যবস্থা হয়। সেজন্য আজকাল রবীন্দ্রনাথের গানেরও Staff Notetion-এর দরকার হচ্ছে। সেদিন আপনার ওখানে গুরুজির (গোঁসাইজির) যে গানখানি শুনলেম তার গায়কি কি অদ্ভুত। সেটা স্বরলিপিতে আসে ? এটা Original মানে গায়ক যেটা গাইছেন তার নিজের ভাবে, এটা ঠিক। কিন্তু বিদেশী Composurs-রা সেটাই রেখে গেয়েছেন তাদের স্বরলিপিতে। এটাই আমার বক্তব্য ছিল। আশাকরি আবার দেখা হবে ভবিষ্যতে আপনার স্নেহের রামকিঙ্কর।

যাই হোক রামকিঙ্করের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চেতনার বিকাশের সূত্রপাত রাজেন্দ্রনাথ দত্তের কাছ থেকেই হয় — সে ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিত হতে পারা যায়। পরবর্তী ক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনে তা আরও বিকশিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। রবীন্দ্রসঙ্গীত তাঁর কাছে অন্তরের জিনিস হলেও তাঁর গায়কীও কণ্ঠস্বরের ব্যাপারেও একটা পছন্দ অপছন্দের বিষয় ছিল। তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের যথার্থ গায়িকা হিসেবে যে দুজনকে বিশেষ উচ্চাসনে বসিয়েছেন তারা হলেন মোহর মুখোপাধ্যায় (কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং সুচিত্রা মুখোপাধ্যায় (সুচিত্রা মিত্র)। পরবর্তী কালে তাঁদের বিপুল জনপ্রিয়তা বলাবাহুল্য রামকিঙ্করের সঙ্গীত বিষয়ে সুগভীর জ্ঞান ও বোধকেই প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি শিল্পী 'রামকিঙ্কর ঃ আলাপচারি' গ্রন্থের লেখক সৌম্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছেন — "সুচিত্রা আর মোহর আমাকে গান শুনিয়েছে খুব। আমার ভলো লাগার গান কতো যে শুনেছি ওদের গলায়। বেশ গলা ওদের। খাসা গলা। আর গায় কী তন্ময় হয়ে। রবীন্দ্রসঙ্গীত ওদের গলায় বাসা বেঁধেছে।" শিল্পী শর্বরী রায়চৌধুরী এক জায়গায় বলেছেন — "নিজস্ব স্টাইলে গাইতেন — রবীন্দ্রসঙ্গীত। এক একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত উনি এমনভাবে গেয়েছেন — যে রবীন্দ্রভক্তরাও কেউ এমন ভাবে গাইতে পারেনি। এইসব গানে এমন একটা প্রাণ ঢালা দরদ ছিলো যেটা আর্টকেও ছাপিয়ে গেছে।" রামকিঙ্কর একজায়গায় তাঁর শিল্প ভাবনার সূচনার সাথে একটি রবীন্দ্রগানের মেল বন্ধন খুঁজে পেয়েছিলেন পরবর্তীকালে। সেকথা তাঁর নিজের ভাষা থেকেই জানা যাক। তিনি বলেছেন — "বলতে পারো ভিউসিয়াল আর্ট-এ আমার প্রথম পরিচয় ঐ ওঁ-এর রাধাকৃষ্ণ দিয়ে। আবার মজা কি জানো — অনেক পরে রবীন্দ্রনাথের গানে 'মূর্তি তোমার যুগল সম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।' পেয়ে গেলাম।"

এখানে রামকিঙ্কর এক অগাধ চেতনার অধিকারী মহামানব রবীন্দ্রনাথের এক উচ্চতর ভাবনার সাথে তাঁর শিল্প ভাবনার গোড়ায় আকস্মিক ও চমকপ্রদ সাদৃশ্য দেখতে পেয়ে যেন বিশেষ পুলকিত ও ধন্য হয়েছেন। তো যাই হোক এই মহান চিত্রশিল্পী ভাস্কর রামকিঙ্করের



সঙ্গীত প্রীতি বা পাগলামির আর একটি আলোচনা এখানে করা যাক যা হল তাঁর রতনপল্লীর প্রতিবেশী হৃষিকেশ চন্দ মহাশয়ের স্মৃতিচারণ। তিনি লিখছেন যে তাঁর বাড়িতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে বেজে যাওয়া সানাই-এর সুর মাঝে মধ্যেই থেমে যাচ্ছে। তিনি গিয়ে দেখেন সানাই বাজিয়েদের বারবার থামিয়ে দিচ্ছেন রামকিঙ্কর — আলাপ শাস্ত্রসম্মত হচ্ছে না বলে। আর গেয়ে শুদ্ধ সুর শুনিয়ে দিচ্ছেন। তিনদিন নাকি আহার নিদ্রা বন্ধ রেখে ঐ করে যাচ্ছিলেন। বহুকষ্টে ধরে বেঁধে তাঁকে স্নান খাওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হত। বস্তুত এই ছিলো রামকিঙ্কর। সুরের প্রতি এইরকমই ছিল একনিষ্ঠ ঝোঁক বা আত্মসমর্পন। তিনি বলতেন "গান আমার খুব প্রিয়। শুনতে বড়ো ভালো লাগে। মিউজিকের সঙ্গে পেন্টিং-এর কোথায় যেন ভীষণ একটা যোগ আছে। গান বিশেষতঃ ক্ল্যাসিক্যাল শুনতে শুনতে আমার মাথার ভিতরে একধরণের ছবি ফুটে ওঠে। আবেগ কাজ করে। ফৈয়াজ খাঁ, আমীর খাঁ ইত্যাদিরা ব্রেইনে ইমারত গড়তে জানেন। ... রবীন্দ্রনাথের গানের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। আহা, কী গান তাঁর।"

বাঁকুড়ার বাড়ীতে যখন আসতেন — দেখেছি দোলতলার শ্রী বাসুদেব চন্দ্রকে গীতবিতান নিয়ে আসতে বলতেন। তারপর চলতো তাঁর গান গাওয়া। পাশে বসা দুই বন্ধু অতুল কুচলান ও বিশ্বনাথ নন্দী সহ বাঁকুড়ার বহু কৌতুহলী ও অনুরাগী মানুষরা তা মুগ্ধ হয়ে শুনতেন। সেসব গানের রেকর্ড এখনও বাসুদার কাছে আছে। এছাড়া তাঁর তোলা বহু ফটোও। তিনি চেষ্টায় আছেন কি করে ওগুলি প্রকাশের আলোয় আনা যায়। সে যাই হোক। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের কবিতাও তিনি পড়েছেন খুব মন দিয়ে। বলেছেন, "ভালো লাগে।" তবে মূলতঃ তাঁর গানকেই তিনি তাঁর দুঃখের রাতে বা আনন্দের দিনে অগাধ ভালবাসা ও ভরসায় আঁকড়ে ধরতেন। তিনি আকাশের মত অসীম অনন্ত রবীন্দ্রনাথকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। কথা বলেছেন, শিক্ষিত হয়েছেন, তাঁর মূর্তি গড়েছেন এতো বহু জন্মের সাধনার পাওয়া। তিনি তাঁকে দেখেছেন — "দূর থেকে, দীর্ঘকায় তিনি। তখন ঈষৎ নূব্জ। কখনো সকালের দিকে বসে আছেন ইজিচেয়ারে। পেছনে হাত দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছেন একাকী উত্তরায়নের মাঠে। সন্ধ্যা নেমে আসছে খোয়াই-এর দিগন্ত ছুঁয়ে। কখনো কখনো বন্ধু-আত্মীয় পরিবৃত হয়ে গল্প করছেন বসে।" ভয়ে ভয়ে তিনি কখনো মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন। দেখেছেন, "এক্সপ্রেশন কেবলি বদলাতে থাকে। এই দেখছি একরকম। নিমেষেই অন্য মূর্তি। চোখ মুখ একেবারে আলাদা। যেন ভেল্কি। শিল্পীকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে।" সত্যি এ বড় বিভ্রাটেরই ব্যাপার — তাঁর পোর্ট্রেট নির্মাণে। শিল্পী অতুল বসুও একবার খুব বেকায়দায় পড়েছিলেন তাঁর পোর্ট্রেট নির্মাণকালে। যাইহোক রামকিঙ্কর করেছেন তাঁর একাধিক পোর্ট্রেট। একটি পছন্দ হয়নি নিজের তাই ভেঙে ফেলেছেন। তার ফটো আছে বিশ্বভারতীর উত্তরায়ণে। ভেঙেছিলেন তার কারণ তিনি বলতেন — "শিল্পের জগতে হয় হলো, নয় হলো না। এর মাঝামাঝি কিছু নেই।" অন্য দুটি মূর্তির একটি সিটিং নিয়ে আর একটি মন থেকে — বিমূর্ত। সিটিং নিয়ে মূর্তিটিতে রবীন্দ্রনাথ ঝুঁকে আছেন। বন্ধু এন্ড্রুজের মৃত্যুতে শোকাহত রবীন্দ্রনাথ।



ঐ দৃশ্য রামকিঙ্কর দেখেছেন — "দূরে মাঠে দাঁড়িয়ে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় গুরুদেবের এই শোকাহত রূপ আমার মাথার ভিতরে তালগোল পাকিয়ে দিল।" তিনি ঐ মূর্তিই ধরলেন সিটিং নিয়ে। তা সিটিং বলতে এই যে রবীন্দ্রনাথ এণ্ড্রুজের স্মরণ সভার জন্য কিছু লিখছেন আর রামকিঙ্কর তাঁর পোর্ট্রেট নির্মাণ করে চলেছেন — অদূরে দাঁড়িয়ে। এতে তিনি ধরেছেন রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ দিককে — "সিরিয়াস রবীন্দ্রনাথ।" তিনি এ প্রসঙ্গে অন্য জায়গায় বলেছেন যে — "বাজারের মিষ্টি মোলায়েম কবি গুরু নয়। দেখো এই রবীন্দ্রনাথকে খুব কম লোকই চিনেছে। সারাটা জীবন লোকটা কী বলে গেলো, করে গেলো নিজের হাতে — শিলাইদায় — এখানে শান্তিনিকেতনে — বুড়ো বয়স ভিক্ষে করে — কে দেখে মন দিয়ে বলো দেখি। সারা জীবন এমন হাড়ভাঙ্গা খাটুনিই বা কজন খেটেছে হে আমাদের দেশে ? ভাবছে শুধু স্বপ্নই দেখছে কবি। হাঃ হাঃ আর আমরাও ওঁকে স্বপ্নেই দেখছি। জলজ্যান্ত মানুষটাকে — সত্যি মানুষটাকে দ্যাখ।" এর নির্মাণে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁর নাকে। তিনি বলেছেন — "সেদিন যতক্ষণ ছিলাম শুধু একটি জিনিস লক্ষ্য করেছি। সে ওঁর নাক। ওঁর মুখে নাক একটা প্রধান দ্রষ্টব্য। প্রোফাইলে সেটা আরও স্পষ্ট ধরা পড়ে খাঁড়ার মতো। ব্যক্তিত্বের অনেকটাই ঠাঁই নিয়েছে ঐ নাকে।" আর একটি তিনি গড়েছিলেন নিজের ভাবনায় সে বিমূর্ত রবীন্দ্রনাথ — এ তাঁর দেখা উপাসনা গৃহের কাঁচের জানলার ফাঁক দিয়ে। হয়ত এদেখাই তাঁর সম্পূর্ণ দেখা। এক পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রনাথকে। অন্তরের যাবতীয় বর্ণনা নিয়ে এখানে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত। দেখা, কল্পনা, ভাবনা সব মিলেমিশে এক রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ব্যক্তিত্বের নানা দিক এখানে বিধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন — "তাঁর ভক্তি খুব নত ভাব। আবার আত্মবিশ্বাসের জোর — দুনিয়া আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াক আমি টলছি না — এই হিম্মৎ। অগাধ ভালবাসা — খসে পড়া পাতাটির জন্যও দুঃখ। আবার কঠিন — নিজের লোক মারা গেছে মনে খেদ নেই — কাঁদন নেই। বাবা কী তেজ দেখো মনের।" এসমস্তই রামকিঙ্কর ধরতে চেষ্টা করেছেন ঐ বিমূর্ত রবীন্দ্রনাথে, এখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের চোখের বদলে দিয়েছেন একটা গোলকার বল। কারণ তাঁর চোখে ছিল যে অগাধ দৃষ্টি।! কারো বা কোনোকিছুর ভিতর-বার দেখে নেওয়ার ক্ষমতা — তাই বোঝাতে চেয়েছেন তিনি। গুরু নন্দলালকে যখন এ মূর্তি রামকিঙ্কর দেখান তিনি সেটি উপরে তুলে দিয়ে বলেছেন, "Looks like a Star"। রবীন্দ্রনাথ জানতেন না এ মূর্তির কথা। রামকিঙ্কর বলেছেন, "কেউ ওঁকে গিয়ে বলেছিল। 'ওটা যে কী করেছে চোখে বল দেওয়া, চেনা যায় না।' রসিক লোক তো, বলেছিলেন - ঐটেই ঠিক করেছে।" তিনি বলেছিলেন, "বিভিন্ন মুডে রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি। তাঁর কয়েকটি মুহূর্ত আমার সামান্য ভাস্কর্যে রূপ দেবার চেষ্টা করেছি। সফল হয়েছি সে দাবী তো আমি করতে পারি না। তবে গুরুদেব প্রশংসা করেছেন।' তবু যখন তিনি তাঁর জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় এসে শুনতে পান তাঁর ঐ শোকাহত রবীন্দ্রনাথকে "রবীন্দ্রনাথের প্রতি অবমাননা কর" তিনি দেখতে অমন কদাকর নন ইত্যাদি বলেছেন এবং তাঁর সাথে সুরে সুর মিলিয়েছেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, তখন তিনি উদাসীন চোখে একটি কথাই বলেছিলেন, "পছন্দ না হলে তুলে ফেলে দিক।"



পরে অন্যত্র বলেছেন, "রবীন্দ্র পুতুল গড়িনি মনে রেখো, খাঁটি হলে টিকে থাকবে, না হলে আস্তাকুড়ে ঠাঁই পাবে।" এ প্রসঙ্গে পরবর্ত্তীকালে এক মর্মান্তিক সত্যকথা শুনিয়েছিলেন তিনি। বলেছেন, "আর্টিস্টের কপাল দেখো — যেমন খুশি থাপ্পড় লাগিয়ে দিচ্ছে যে পারছে। আমাদের বাঁকুড়ায় থিয়েটার দলের একটা ঘর ছিলো। থিয়েটারের নানা সরঞ্জাম থাকতো তাতে। ঢোল ছিলো একটা। দেখতাম, যে যখন পাচ্ছে একবার পিটিয়ে দিচ্ছে।" এখানে বলাবাহুল্য যে অন্য পথের পথিকদের চিত্রশিল্পী বা ভাস্করদের মত এতবেশি অর্বাচীন মন্তব্য ও আক্রমণের শিকার হতে হয়না। বস্তুতঃ অধিকাংশ বড় শিল্পীর ভাগ্যটাই বুঝি এইরকম। সহযোগিতার বদলে উল্টোটাই জোটে তাঁদের একশভাগ।

যে অহেতুক কাজের তাড়না তাঁদের পাগল করে রাখে। গরীবও করে রাখে তা-ই। কারণ ঐ অহেতুক নির্মাণের চেষ্টা যে এক বিরাট খরচের প্রশ্ন। তবু "আয়নার মতো ঝকঝকে দুধের মতো সাদা করে মুক্তোর চেয়েও লাবণ্য দিয়ে তার গম্বুজটা গড়ে গেলো যারা; দেওয়ালের গায়ে অমর দেশের পারিজাতলতা চড়িয়ে দিয়ে গেলো যে নিপুণ সব মালী, তারা রোজ মুজুরি কত পেয়েছিল? তাছাড়া পুরো খেতে পায়নি বলে তাদের শিল্প কোথায় ম্লান হয়েছিল বলতে পারো?' একথা বলেছেন অবনীন্দ্রনাথ। না, ম্লান হয়না কখনো, কেননা আনন্দই যে যা কিছু সৃষ্টির মূল প্রেরণা। তাঁর কাজের বিনিময়ে সমাজ তথা দেশ কী দিল বা না দিল তা নিয়ে কখনো চিন্তাই করেননি তিনি। কলের বাঁশি ভাস্কর্যের ছুটন্ত সাঁওতাল বালকটির হাতের বাঁশি দিয়ে উড়ন্ত আঁচলকে ছুঁতে যাওয়ায় যে আনন্দ তা মূলতঃ রামকিঙ্করের শিল্প প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সীমাহীন আনন্দকে সীমার মধ্যে ধরতে চাওয়ার পরম ব্যাকুলতাই। আর তিনি তাঁর কাজের মধ্যেই তা পেয়ে যেতেন বলেই মর্মে মর্মে অনুভব করে উপনিষদের সেই মহান সত্যকে অতি সহজ ভাবেই তিনি বলতে পারতেন যে, "আনন্দ হতেই এই বিশ্ব সম্ভূত।" তো এই পরম উপলব্ধির মানুষদের কি আর পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ জোটে নাকি ছোটেন তাঁরা তার পিছনে। বদলে নিন্দা বান্দা গালাগালি, লাঞ্ছনা অপমান ইত্যাদিই তাদের পুরস্কার। মূলতঃ রামকিঙ্কর তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় ধরে এসবই পেয়েছেন। লাগাতার। "ঐ শান্তিনিকেতনেই অনেকে তা সহ্য করেনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পাখির ডানার মতো আগলে রাখতেন। ...একটাই কারণ যা হতে পারে তা হল, রবীন্দ্রনাথ শিল্পী হিসাবে মহান।" — একথা বলেছেন শিল্পী প্রকাশ কর্মকার। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের সমকালীনতায় দংশিত হয়ে তাঁর ছবিতে ছবির যে আত্মাটিকে ধরে দেখিয়েছেন তা এদেশে তিনি বপন করতে চেয়েছিলেন। করেছেনও অত্যন্ত সফলতায়। তিনি তাঁর নিজের ছবি বিষয়ে বলতেন — "পরোয়া করিনা। আমি পরোয়া করিনা। আমার যেমন মনে হয়েছে আমি তেমনই এঁকেছি। আমি চাই না যে আপনি তা বুঝুন। আপনার যা মনে হয় আপনি তা-ই বলুন।" তিনি চেয়েছিলেন তাঁর প্রতিষ্ঠানে চিত্র বা ভাস্কর্য নির্মাণে কোনরকম ধরাবাঁধা প্রকরণ কৌশল বা বাঁধাবাঁধি গঠন প্রক্রিয়া থাকুক। তিনি ছিলেন এ ব্যাপারে অত্যন্ত উদার মনের মানুষ। সকলকে বারবার নিজের খুশিমত কাজ করে যেতে উৎসাহ দিতেন। "নন্দলালের প্রতি তাঁর



নির্দেশই ছিল কাউকে বেশি কিছু শেখাবে না।" কবিগুরুর এই বাণীর কথা বলেছেন রামকিঙ্কর। তিনি আরো বলেছেন — "রবীন্দ্রনাথর আইডিয়া ছিল মর্ডার্ন, উনি আমাদের কাজ করতে দেখতেন আর বলতেন, খালি করে যাও, নতুন নতুন কাজ করো। ওদেশে কতো ভালো ভালো কাজ হচ্ছে। তোমরাও করো।" আসলে অবনীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, "ইউরোপ, যে চিরকাল বাস্তবের মধ্যে আর্টকে বাঁধতে চেয়েছে সে এখন সীলমোহর মায় জালা পর্যন্ত ভেঙে কি সঙ্গীতে কি চিত্রে ভাস্কর্যে, কবিতায় সাহিত্যে বাঁধনের মুক্তি কামনা করছে; আর আমাদের আর্ট যেটা চিরকাল মুক্ত ছিল তাকে ডানা কেটে পিঁজরের মধ্যে ঠেসে পুরতে চাচ্ছি আমরা" ঠিক এইরূপ ভাবনায় ভাবিত রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন এদেশের স্বাধীন শিল্পচর্চাকে বর্তমান পিঁজরের থেকে বের করে এনে পুনরায় স্বাধীনতা দিতে। আর এই কারণেই গুণীজনের মতে তিনি ছবি আঁকতে না জানলেও তার ছবি অনেকের চেয়ে ছবি হয়ে আছে। রামকিঙ্কর তাঁর আঁকা ছবি বিষয়ে আবেগতাড়িত কণ্ঠে বলেছেন — "চিরন্তন, চিরন্তন", বলেছেন, "ওঁর ছবিগুলো বেশ মজার, নানা রকমের, হুইম সিক্যালি তো। পেলিক্যান বা অন্য কোন কোম্পানি যেন অনেকগুলো রঙের বোতল ওঁকে দিয়েছিল। উনি তাতে তুলি ডোবাতেন আর আঁকতেন। রঙগুলো ল্যাকার মেশানো ছিল। তাই দেখবেন ছবিগুলো কেমন ঝকঝক করে। ট্রেস করতেন ও কখনো সখনো। নানা ধরণের ফিগার এঁকেছেন। রঙও বিচিত্র। তবে দু-একটা জিনিস স্টিরিও টাইপ হয়ে গিয়েছে। যেমন নাক। সেটা কখনো বদলান নি। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে রঙের ব্যবহার দারুন। ন্যাচারাল কালার আনবার চেষ্টা করেছেন। মহুয়ার কভারের রঙ দেখবেন। ঠিক যেন মৌ ফুলের রঙ। খুব কড়া অবজারভেশন ছিল কিন্তু। রিয়ালিস্টিক কোথাও কোথাও আছে। ...নিজের ছবি অর্থাৎ সেলফ পোর্ট্রেটও সুন্দর। সব মিলিয়ে বেশ অদ্ভুত রস।" রামকিঙ্কর এই পর্বত প্রমান প্রতিভার ছবি আঁকার শৈলী দাঁড়িয়ে দেখেছেন। একথা ভাবতেই রোমাঞ্চ লাগে। রোমাঞ্চ লাগে তাঁর পরিচালিত নাটকে রামকিঙ্করের অভিনয় করার সৌভাগ্যও হয়েছিল। রামকিঙ্করের মত অতি সংবেদশীল, প্রখর মেধা ও অনুভূতি সম্পন্ন মানুষের কাছে সেসব উলুবনে মুক্তো ছড়ানোর ব্যাপার হয়নি পরিবর্তে কাজের হয়েছে বলতে গেলে একশ ভাগই। তিনি এমন একজন মহাঅহৈতুকী সাধনার সাধকের দর্শন পেয়ে ধন্য হয়েছেন। হয়েছেন তাঁর একান্ত ভক্ত অনুরাগী দাসানুদাস। হবারই কথা। বস্তুত এমন এক সান্নিধ্যই যে সবার কাছে এক ঈর্ষার। তিনি কোথাও এক সমালোচনার উত্তরে বলেছিলেন "রবীন্দ্রভক্ত ? হ্যাঁ, আমি তো তাই। ...উনিতো একজন পর্বত প্রমাণ প্রতিভা। কারুর কিছুর অতিরিক্ততায় তাঁর কি যায় আসে ? তবে দেখেছি ওঁর উপস্থিতি, ব্যক্তিত্ব। ভোলা যায় না। ...ওঁর সামনে বসে একটুও নার্ভাস হয়না এমন লোক খুব কম দেখেছি। কত লোক এসেছে এখানে কীসব অভিযোগ-টোগ নিয়ে। এই সাহিত্যের ব্যাপার আরকি। এসেছে বেশ মেজাজ নিয়েই — হ্যান বোলেঙ্গে ত্যান বোলেঙ্গে — এসে সামনে বসে কেঁচো। মুখে রা-টি নেই। মুখ তুলে তাকাতেই পারে না। লোকটার মধ্যে কী যে ছিলো। অথচ দ্যাখো ব্যবহারে অমায়িক। ওঁর চোখ দুটোই সাংঘাতিক। ওঁর ওই খাঁড়ার মতো নাক আর চোখের চাউনির সামনে স্থির



হয়ে কাজ করাই তো দায়।" অথচ এই এমন যে হিমালয়ের মতো উঁচু রবীন্দ্রনাথ তাঁকেও নানা কারণে অনেক জিনিস সহ্য করতে হয়েছে। যা তিনি চাননি সে জিনিস তিনি সবলে উৎপাটন করার চেষ্টা করেননি বা করতে পারেন নি। এই জন্যই দেখা যায় যে বিশ্বভারতী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ধীরে ধীরে কমে এসেছে। তাঁর এই উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে যেসব আগাছা গজিয়ে ছিল সেইগুলি মহীরূহ হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর। শিল্পী বিনোদবিহারীর এ বড় যন্ত্রণার কথা। পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতার কারণে হয়ত নিজেকে প্রকাশ না করতে পারার যন্ত্রণা। এহেন যন্ত্রণা রামকিঙ্করের তো ছিলই আর তাইতো তিনি বলেছিলেন, " আমার সঙ্গে কার আত্মীয়তা ? ঐ পলাশের। পাতা নেই ন্যাড়া ডাল সর্বাঙ্গে আগুন।" তাঁর সারা বুক জুড়ে ছিল এই আগুন। তিনি তা চেপে রাখতেন কেননা তিনি ছিলেন অন্তর্মুখী ও প্রচার বিমুখ এক ব্যাক্তিত্ব। তাঁর যা কিছু অভিব্যাক্তি ছিল তাঁর কাজে, সৃষ্টিতে। আর তাই তিনি তার সমস্ত যন্ত্রণাকে শক্ত সিমেন্টের বাঁধনে বেঁধে বাইরে নিয়ে এলেন। নাম দিলেন "মাৎস্যন্যায়" তিনি দেখালেন কিভাবে গিলে খায় ছোট মাছকে কোন বড় মাছ। এই কাজটির প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন — "রবীন্দ্রনাথের বাড়ির এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াই - আর মনে হয় এই লোকটিকে সারাজীবন চেঁচাতে হয়েছে চারদিকের ব্যাপার স্যাপার দেখে। ...ট্যাঙ্ক গোলাগুলি, আকাশ থেকে বোমা —ছাতু হয়ে যাচ্ছে এক একটা দেশ। ইস্কুলবাড়ি, হাসপাতল, ম্যুজিয়াম, ক্ষেত খামার বাছবিচার নেই। উনি চেঁচিয়েই যাচ্ছেন। কে শোনে সেই চ্যাঁচানি? হুঃ সভ্য দেশ। সভ্যদেশের মুখোশের দড়িগুলো সব খুলে যাচ্ছে। বেরিয়ে পড়ছে আসল পোর্ট্রেট। পম্পার জলের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি খাই আর ঐ চ্যাঁচনি কানে আসে। একদিন মনে হলো দোঁতলার জানলা দিয়ে উনি দেখছেন ওঁর চোখের চাউনিটা আমার মাথায় পিঠে এসে বিঁধছে। তাড়াতাড়ি ফেলে দিই মুখের বিড়িটা। তারপরই ওই কাজ। বড়ো গিলে খাচ্ছে ছোটকে।" এখানে অস্বীকার করার উপায় নেই যে রামকিঙ্করের মত শিল্পী হতে গেলে যে প্রতিভার দরকার হয়, দরকার হয় তদনুযায়ী ত্যাগ তিতিক্ষা, সংযম অধ্যাবসায়, নিষ্ঠা ও পরিশ্রম তা পৃথিবীতে খুবই বিরল। তথাপি এতগুলি গুণের অধিকারী রামকিঙ্কর ছিলেন বড় মাছের মুখের ভেতর ছোট মাছের মতো। রবীন্দ্র-নন্দলাল পরবর্তী সময়ে অত্যন্ত অবহেলিত ও অপাঙ্ক্তেয় একজন। তবু তিনি থেমে যাননি। ঐ অসহযোগিতার মধ্যেও কাজ করে গেছেন। হয়ত মূহুর্মুহু সেসব গাঢ় অন্ধকারের ঝাপটানির ফলেই তিনি শিল্পের সারাৎসার সাকার রূপটিকে তুলে আনতে সক্ষম হয়েছেন বিভিন্ন ভাবে। উঁচু চেতনার অধিকারী এই শিল্প পাগল মানুষটা তাই স্বাভাবিক কারণেই ছিলেন বড়ো একা। কেননা হিমালয়ের যতই উপরে ওঠা যায় ততই দলবল হারিয়ে পারগ মানুষটা ক্রমশঃ একবারে একাই হয়ে যায়। রামকিঙ্করও শিল্পের উঁচু চূড়ায় উঠে চারপাশের সাধারণের মধ্যে অসাধারণ হয়ে উঠেছিলেন। হয়ে উঠেছিলেন বনিকী, স্বার্থপর খ্যাতিলোলুপ, অর্থগৃধ্র — ইত্যাদির ক্লেদমুক্ত পরিচ্ছন্ন এক মানুষ। আর তাই রক্তকরবী নাটকে বিশু পাগলের রোলটাই তাঁকে মানাত বেশি। রবীন্দ্রনাথের অন্য নাটকেও তিনি অভিনয় করেছেন। যেখানে রবীন্দ্রনাথ



স্বয়ং ছিলেন সে নাটকের পরিচালক। তিনি বলেছেন, "নাটক কি কম করেছি হে? করিয়েছিও নিজে। রবীন্দ্রনাথের নাটকই বেশি। আর যেখানে পরিচালক স্বয়ং উনি সেখানে নাটকের মজাটাই আলাদা। একজন গো-মুখ্যুও নাটকের মধ্যে ঢুকে পড়বে, রস পাবে। তা সে যতই কঠিন নাটক হোক। উনি যখন নাটকটা পড়ে যান তখন সেটা শুনতে পারলেই তো অর্ধেক কাজ হয়ে গেলো হে। তারপর উনি পার্ট বোঝান। বেশি কথায় নয়। তোমাকে ঠিক ধরিয়ে দেবেন আরকি। আর মাঝে মাঝে যখন অভিনয় করে দেখান সে তো মস্ত লাভ। উনি কিন্তু কখনোই ওঁর মতোই করতে বলেন না। তুমি করবে তোমার মতো, শুধু সুরটা ধরিয়ে দেবেন। ওঁর নাটক পরিচালনা জিনিসটাই দেখার মতো, শেখার মতো। তখন কিন্তু উনি ভীষণ সিরিয়াস। সেখানে তোমারও পার পাবার জো নেই যদি পার্ট নিয়েচো একবার। তা সে যত ছোট পার্ট-ই হোক।" আরো বলেছেন —"রিহার্সাল চলছে তো চলছেই। কী সিরিয়াস। পান থেকে চুন খসবার জো নেই। খসলেই অগ্নি শর্মা। আবার খুশি হলেও সে দেখার মতো। ফাইনাল শো হয়ে গেলো যখন তখন ঘোর কাটলো। যেন জ্বর ছাড়লো।" একবার তাঁর অন্তর্নিঃসৃত আসল কথাটি তিনি বলেছেন — "রবীন্দ্রনাথের নাটকে অভিনয় করতে পারা এক মস্ত ভাগ্য।" ভাগ্যই তো বটেই। আর সে ভাগ্য আর ক-জনারই বা হয়। তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বড় হয়েছেন। তাঁর চিন্তার ক্ষেত্রে প্রতিদিন এক একটা জগতের উন্মোচন হয়েছে। তিনি পরিপূর্ণ হয়েছেন। শিল্প চেতনার উর্দ্ধমুখী শিখাটি তাঁর আরো প্রলম্বিত হয়ে আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। রবীন্দ্রনাথও চিনে ছিলেন রামকিঙ্করকে। সেই কথায় আছে যে — - 'জুহুরী জহর চেনে।' তো এক প্রতিভা আরেক বড় প্রতিভার সাহচর্যে কিভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বড় হয়ে উঠেছিল তা আজ আমাদের জানতে কিছু বাকি নেই। সেই বিরাট প্রতিভা একদিন বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ-ই দেখে ফেলেন রামকিঙ্করের প্রথম সিমেন্টে করা 'সুজাতা' মূর্তিটিকে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি — "কে করেছে?" উপস্থিত কজনের মধ্যে সভয়ে একজন রামকিঙ্করের নামটি উচ্চারণ করলে তিনি বললেন, "ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।" ভড়কে গিয়েছিলেন সবাই এমনকি পরে মাস্টারমশাই নন্দলালও। বুঝিবা শান্তিনিকেতনে রামকিঙ্করের পাট শেষ। না তা হয়নি বরং ঢালাও লাইসেন্স পেয়েছিলেন তিনি। "সমস্ত আশ্রম এর চেয়েও বড় বড় মূর্তি গড়ে ভরে দিতে পারবি ? সব আশ্রম ভরে দে।" বলেছিলেন সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ! তারপরে একের পর এক সিমেন্টে কাঁকড় মিশিয়ে মূর্তি গড়েছেন রামকিঙ্কর অদম্য উৎসাহে আবেগের চূড়ান্ত সীমায় পৌছে। কিন্তু যখন দেখি আজকের কালজয়ী ভাস্কর রামকিঙ্করের ভাস্কর্যের মূল্যের চেয়ে বিশ্বভারতীর প্রশাসনিক প্রয়োজন বেশি হয়ে যায় তখন মানুষ সম্পর্কে হতাশ হয়ে সান্ত্বনা পেতে হয় ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিদের উপলব্ধির কাছে এসে যা হল সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। কোনো এক প্রসঙ্গে রামকিঙ্করের মধ্যেও এমনি এক চেতনা প্রবহমান ছিল বোঝা যায় — যখন তিনি বলেন "তুমি বলেছিলে না ব্ল্যাক হাউস থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হোস্টেলটা তুলে দিয়ে সংগ্রহশালা করতে। কি লাভ তাতে? একটা মরা মিউজিয়ামের পরিবর্তে ওখানে জীবনের



প্রবাহ বয়ে চলেছে। ভালোইতো। আফটার অল লাইফ ইজ ইমপরট্যান্ট।' তবুও আমরা যারা সাধারণ মানুষ রামকিঙ্করের মতো চেতনার উঁচু সোপানে পৌছতে পারিনি তাদের হৃদয়টা যেন দুমড়ে মুচড়ে হাহাকার করে ওঠে যখন জানতে পারি রামকিঙ্করের সাথে কোনোরকম আলোচনা ছাড়াই তাঁর বলিষ্ঠ কাজ 'ধানঝাড়া' ভাস্কর্যটিকে বিশ্বভারতীর জায়গার প্রয়োজনে বা শিল্পী শঙ্খ চৌধুরীর ভাষায় 'বিসদৃশ মনে হওয়ায়' মূল জায়গা থেকে সরিয়ে শ্রীনিকেতন শ্রী পল্লীর সংযোগ রাস্তার কোনে বসানো হয়। রামকিঙ্করের ছাত্র শ্রী দিনকর কৌশিক লিখেছেন — "স্থানান্তরিত করা কালীন এটি গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাঁরই যোগ্য ছাত্র সুশেন ঘোষ এই গুরুত্বপূর্ণ ভাস্কর্যটিকে ১৯৭২-৭৩ সালে একবার মেরামত করেন।"

বস্তুতঃ 'মাৎস্যন্যায়' ঘটনা এই পৃথিবীতে কোনো নতুন ব্যাপার নয়। আর হয়ত এসব আছে বলেই মানুষ প্রাজ্ঞ হয়। গভীর উপলব্ধির মধ্য দিয়ে চেতনার সারাৎসারে পৌছয় তার আসল সত্ত্বা। রবীন্দ্রনাথ সেই চেতনার অধিকারী ছিলেন। তিনি তাই আমাদের সে শিক্ষাই দিয়েছেন। "যে কেহ মোরে দিয়েছ দুখ দিয়েছ তারি পরিচয় / সবারে আমি নমি।" সেই জ্যোতির্ময়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে রামকিঙ্করও হয়ত অনেকটাই পৌছে গিয়েছিলেন সেইখানে যেখানে লাঞ্ছনা নিন্দা অপমান ও ধ্বংসকেও অট্টহাসিতে উড়িয়ে দেওয়া যায়।



বিমূর্ত রবীন্দ্রনাথ

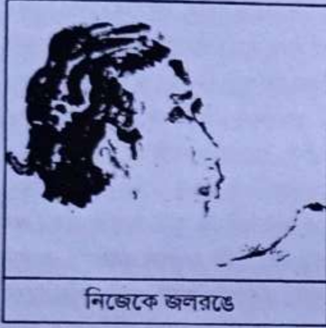
রামকিঙ্করের জীবনটাই এক বৈচিত্রময় নাটক। সেই তিনি আবার মানুষের তৈরী রঙ্গমঞ্চেও অবতীর্ণ হয়েছেন বিভিন্ন চরিত্রের পার্ট নিয়ে। বাঁকুড়ার ড্রামাটিক ক্লাবের নাটকে অভিনয় করেছেন, ড্রপসিন এঁকেছেন। কিন্তু নাটক পরিচালনা বিষয়ে শিক্ষিত হন রবীন্দ্রনাথের কাছেই। এখানে নাটক বিষয়ে তাঁর একটি মন্তব্য ঃ "নাটক জিনিসটা কী রকম জানো অনেকগুলো ঘোড়াকে একটা গাড়িতে যুতে দিয়ে চালানো। গাড়ি চালানো জন্য এলেম চাই হে। সেই এলেম কাকে বলে সেটা ওই সময় টের পাওয়া যেত ওঁকে দেখলে।" নাটক করা ছাড়াও রবীন্দ্রনাট্য ও অন্যান্য নাটকের বহু স্টেজ সাজিয়েছেন। পাত্র-পাত্রীদের মেক-আপও করেছেন তিনি। রামকিঙ্করের জীবনে এও এক অধ্যায় বিশেষ। 'রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে ছবি আঁকা শুরু করলেন এক দায়িত্ববোধ

থেকে। প্রায় দশদশটা বছর তিনি সবকিছু ছেড়েছুড়ে ছবি আঁকতে লেগে গেলেন।' রামকিঙ্কর বলেছেন — "এটাকে তাঁর একটা হাল্কা পাগলামী বলে মনে হতো প্রথম প্রথম। পরে অবশ্য বুঝেছি যে কবিতা প্রবন্ধ বা অন্য কোনো লিখিত শিল্প মাধ্যমে ওঁর অনেক কিছু প্রকাশ বাকী থেকে যাচ্ছে। এবং সেজন্য এত তাড়ায় ছবি আঁকছেন।" খুব মূল্যবান একথা কেননা রুশী শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিখকে ১৯৭০ সালে লেখা একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সে কথাই জানিয়েছেন মূলতঃ — যার কয়েকটি লাইন হল ঃ "শব্দ কেবল সত্যের একটি বিশেষ দিকই প্রকাশ করতে পারে, যেখানে শব্দ বাহিত ভাষা প্রবেশ পায় না, চিত্রের ভাষা সেই বিশেষ সত্যে যেতে পারে।" তো তিনি দশ-দশটা বছর ছবি এঁকে দেখিয়ে দিলেন ছবি কাকে বলে। ছবির আত্মাটাকে ধরে দেখালেন। তাঁর কথার প্রমাণ রাখলেন। কিন্তু দুঃখ এই একটাও মূর্তি গড়েননি তিনি। গড়লে হয়ত আরেক জগতের হদিশ পেয়ে যেতাম আমরা। ইচ্ছেও হয়েছিল তাঁর মাটি দিয়ে কিছু একটা করার। কাছে পেয়ে রামকিঙ্করকেই জানিয়েছিলেন তাঁর মনের কথা ঃ একতাল মাটি দিতে পারিস ? রামকিঙ্কর তখন ওঁরই মূর্তি গড়ছিলেন। খুব ইচ্ছে হয়েছিল তাঁরও যে, ঐ জ্যোতির্ময় পুরুষটির হাত দিয়ে কী অজানা বেরোয় দেখার জন্য। কিন্তু না, পারেননি দিতে তিনি একতাল মাটি তাঁকে। খুব আফসোস বয়ে বেড়িয়েছেন এজন্য রামকিঙ্কর তাঁর জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত। দিতে পারেন নি অদূরেই দাঁড়িয়ে ইঙ্গিতে প্রতিমা বৌঠানের নিষেধের জন্য। প্রতিমা বৌঠান রামকিঙ্করকে ডেকে পরে বলেছিলেন — "কখনও মাটিতে হাত দিতে দিও না। শরীর খারাপ, ঠাণ্ডা লেগে বিপত্তি হবে। তুমি মাটি এনোনা ওঁর জন্য। কক্ষনো না।" রামকিঙ্কর তাই পরের দিন মাটির বদলে প্লাস্টিসিন এনেছিলেন। কিন্তু কবিগুরুর অনিচ্ছা ঐ প্লাস্টিসিনে কাজ করায়। তিনি বললেন ঃ — "ওটা চ্যাট চ্যাট করে। মাটিই ভালো। তুই মাটিই নিয়ে আয় আজই।" কিন্তু প্রতিমা বৌঠানের নিষেধ অমান্য করতে পারেন নি রামকিঙ্কর। তিনি বলেছেন — "মন খারাপ হয়ে যায়। একটা মিডিয়মে কাজ করার কী আগ্রহ। অথচ পারলেন না। আমি আর কী করি। প্রতিমা দেবীর ভয়ে কথা শোনা হল না। কিন্তু আনতে পারলে কী পেতাম বলো দেখি। যদি সাহস করে ওঁকে খানিকটা মাটি দিতাম ওঁর হাতের কাজ হয়তো আমাদের ভাস্করদের পাথেয় হয়ে থাকতো।" এ যেমন রামকিঙ্করের এক খেদ তেমনি তাঁর আবক্ষ মূর্তি গড়ার পরই তাঁর মহাপ্রয়াণ — এও রামকিঙ্করের আরেক দুঃখ, যা চিরদিন তাঁর জীবনে কাঁটার মত বেঁধা হয়েছিল। □



মানুষ রামকিঙ্কর

"সাধারণ চিকিৎসালয়ে শুয়ে আমার বয়ঃকনিষ্ঠ সেই বন্ধুর প্রতি প্রণাম জানাচ্ছি যাকে আহত কুকুরের পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধতে দেখেছি।" বলেছেন রামকিঙ্কর সহপাঠী শ্রী প্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এসব কি উল্টোপাল্টা বলেছেন তিনি। কুলীন ব্রাহ্মণ হয়ে প্রণাম! নিশ্চিত এ তাঁর বুড়ো বয়সের ভীমরতি। কারণ কলকাতাতো আমাদের ঈদৃশ রামকিঙ্করকে চেনায়নি। বরং তাঁরা চিনিয়েছে — 'রামের কিঙ্কর আমি, রাম নিয়ে আয়, ইন্টারভ্যু দেব।" অথবা সুরেনের সঙ্গে গিয়েছিলুম তোমাদের কলকাতায়। একটা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে। সে উপলক্ষে একটা পুস্তিকায় আমার বিষয়ে লিখতে গিয়ে একজন লেখক আমাকে সাঁওতাল বলে পরিচয় দিয়েছে।" এ হল শ্রী রামকিঙ্করেরই জবানী। এছাড়া এই সেদিনও যে বইটি বেরল তারও পাতায় পাতায় সে এক অন্য রামকিঙ্কর। তবে একটা স্বস্তির কথা যে অন্য কোন জেলা বা প্রদেশের মানুষ ঐ শিব গড়তে হনুমান বানাচ্ছেন না। বানাচ্ছেন না, হয়ত রামকিঙ্করের প্রতি ঈর্ষা বা বিদ্বেষ কি প্রতিশোধের ব্যাপার স্যাপার নেই সেখানে ? রামকিঙ্কর যদি অভিজাত শ্রেণীর মানুষ হতেন, কিম্বা কলকাতার লোক। তা না হলেও কলকাতার মূর্তিগুলির বাপারে শুধুই বাহবা শুনিয়ে আসতেন তাহলে আমরা কি রামকিঙ্করের অন্য এক প্রতিকৃতি পেতাম ? কিন্তু না তা হয়নি। তাঁর পরিকল্পিত বহু মৌলিক কাজের উদ্দ্যোগ স্তব্ধ করে দিয়েছেন সে সময়ের কর্তাব্যক্তিরা? বহু বিতর্কিত 'ধানঝাড়া' মূর্তিটিকে সরানোর নামে ভেঙে ফেলার চেষ্টা হয়েছে ? অথবা বেত্রাঘাতের মত চরম লাঞ্ছনা ? হয়ত এ সমস্তই মূলতঃ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। হয়ত কোন প্রতিশোধ কিম্বা তাঁকে আর উঠতে না দেওয়ারই চক্রান্ত। একথা অনস্বীকার্য যে তাঁর মধ্য বা শেষ বয়সের প্রাজ্ঞ চোখের যেসব না করতে পারা কাজে না জানি আরও কতই না অমূল্য জিনিস পেয়ে যেতাম আমরা। রামকিঙ্করকে যাঁরা দেখেছেন, তাদের মধ্যে যাঁদের স্বচ্ছ লেখনী দিয়ে রামকিঙ্করের প্রকৃত সত্য রূপ বেরিয়ে এসেছে তাঁদেরই একজন শিল্পী সোমনাথ হোড় বলেছেন কুটিলতা, অসূয়া, পরশ্রীকাতরতা অথবা পরস্ত্রী গমনে পারদর্শিতা কোনটিই তাঁর আয়ত্তে আসেনি। এমন নির্মল চরিত্র স্বভাব শিল্পীর বহু বছরের ব্যবধানে কোটি কোটিতেও একজন আসেন। তিনি আরও বলেছেন, "কিঙ্করদা পানাসক্ত ছিলেন কিন্তু আশ্চর্য প্রায় ১৫/২০ বছরের ঘন পরিচিতি কালেও তাঁকে কোনোদিন বেসামাল হতে দেখিনি। এমন ভদ্র শান্ত সমাহিত চরিত্র দুর্লভ।" তথাপি এর পরেও যখন কেউ সে সূর্যের গায়ে থুতু ছিটোতে চায় তখন আর বলার কিছু থাকেনা সেই ভদ্দরলোকদের প্রতি। শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — "মানুষটির সম্পর্কে যেভাবে আমাদের ভাবনা কাজ করছে তা কেবলই তাঁকে



নিজেকে জলরঙে



শ্রদ্ধা জানানোর চেয়েও হেয় করেই চলেছি। এমন উন্মুক্ত খোলা হৃদয়বান মানুষটিকে ঘিরে এমন হওয়ার কথা নয়ত — আমার কাছে কেবলই মনে হয় — খাঁটি কিছুর সঙ্গে যা খাঁটি নয় তেমন করেই পরিমানের পরিমাপের কাজ করেই চলেছি।" খুব ন্যায্য কথা। আর তাইতো রামকিঙ্কর মানুষ সম্পর্কে তিতিবিরক্ত হয়ে বলেছিলেন — "মুখোশ পরা মানুষ। বাবা বড় ভয় করে ওদের। ...বর্ণচোরা জীব।" এছাড়া — "মাতব্বরী দেখেছো ? দিগগজ সব। যে কিছুই বোঝেনা সেও বিনা মূলধনেই কেমন বিচারক বনে যায়। আর হতভাগা আর্টিস্ট পড়ে পড়ে মার খায় বেদম।" বস্তুত শুনতে খারাপ লাগলেও একথা খুব সত্যি যে রামকিঙ্করের ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞাত সমস্যা ও ন্যূনতম জাতিগত সাপোর্টের অভাব তাঁকে তাঁর অতিমানবীয় মেধা ও মানুষ্যত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও একরকম একঘরে হয়েই থাকতে হয়েছিল। আর এহেন পরিস্থিতি হয়ত তাঁর পক্ষে শাপে বরও হয়েছিল। তিনি সামনেই পিয়ারসনপল্লী বা অন্যান্য সাঁওতাল গ্রামের দিকে ধাবিত হয়েছিলেন তাদের অতি সাধারণ ও প্রাণোচ্ছল জীবনযাত্রার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে। এই খেটে খাওয়া গরীব অথচ উচ্ছল মানুষগুলোর মধ্যেই তিনি পেয়েছিলেন বেঁচে থাকার নতুন তাগিদ ও সাথে সাথে সৃষ্টিরও লাগাতার প্রেরণা। আর অন্যদিকে হাহা — অট্টহাসি দিয়ে তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর চারপাশের অবাঞ্ছিত বাধা বা উপদ্রবগুলিকে। তিনি বলেছেন, "সংসারে ওসব আছেই। কিছুনা। ওগুলোকে আমল দিতে নেই।" আরও বলেছেন যে, "দুঃখ হয়, হাসিও পায়। হাসি দুঃখের ব্যাপার। জীবনটাই এইরকম।" তাঁর ছাত্র শিল্পী শঙ্খ চৌধুরী লিখেছেন — "কিঙ্করদার দেখা পেলাম ওঁর ছাত্রের দেওয়া মাটির বাড়ির বারান্দায়। চারিদিকে গরু, বাছুর, ঘরবাড়ি। বেশ পাড়াগাঁয়ের বস্তির মতো। ভাঙা চাল। কি কাজ করছেন জিজ্ঞাসা করতেও লজ্জা করে 'কেমন আছেন' জিজ্ঞাসা করায় বললেন, "ওসব কথা ছেড়ে দাও। মোড়াটা নিয়ে বসো। একটা গান গাও দিকি।" রামকিঙ্করের এরূপ বক্তব্যে প্রশ্ন কর্তার স্মরণে এসে যায় তাঁর গর্ভধারিণী মায়ের কথা — "জীবনের পূর্ণতার লক্ষণ নিরানন্দ নিরাসক্ত হওয়া।"

রামকিঙ্কর তাঁর জীবনের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নিরবিচ্ছিন্ন অবিচার। অপমান, লাঞ্ছনা বা মানসিক পীড়নকে ধরে রেখেছেন তাঁর কাজের মধ্যে — যেমন 'মাৎস্যন্যায়', 'কঙ্কালিতলার পথে', 'পলাতক' ইত্যাদি নানান ক্রিয়েটিভ রচনার মধ্যে। তিনি কখনো সেসব অন্যায় প্রতিরোধের চেষ্টা করেননি বা কারো কাছে ব্যক্তও করেননি। অথচ কালের অমোঘ নিয়মে তিনিই আজ ভাস্বর, দেদীপ্যমান। আর বিপরীতে দম্ভের মোহে যাঁরা ছিলেন হিমালয় প্রমাণ বাধা আজ তাঁরা ম্লান। শিল্পপ্রেমী আগামী প্রজন্ম তাদের কী বলে সম্বোধন করবে সেটাই দেখার।

এতো যে কাজে বাধা তথাপি এই শিল্প পাগল মানুষটার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল কি? তিনি কি এজন্য কষ্ট পেয়েছেন — যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন? এই প্রশ্নের উত্তর রামকিঙ্করের কাছ থেকেই জানা যাক্। তিনি বলেছেন, "আফসোস থেকে গেছে মনে। আমার এতো সাধের আইডিয়াটা রূপ পেলো না হে। খড়কুটো কুড়িয়ে এনে আগুন জ্বালাবার আয়োজন

করলাম। আর দিলো জল ঢেলে। "বার্থ অফ ফায়ার"এর ইতি।" জীবন সায়াহ্নে এসে বাঁকুড়ার মানুষ শ্রী সৌমেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপন জন পেয়ে মনের কথা খুলে বলেছেন তিনি। কালজয়ী ভাস্কর ও চিত্রশিল্পীর ফুটো চাল বেয়ে বর্ষা ঝরছে তাঁর বিছানায়। কেই বা দেখে আর কোথায়ই বা জানাবেন তিনি ভেবে পান না। পাটোয়ারী বুদ্ধিতে নেহাৎ-ই অপটু সদাশয় মানুষটা নিজেই এর মীমাংসা করে ফেলেছেন — মশারির উপর অমূল্য অয়েল পেন্টিংগুলো বিছিয়ে দিয়ে। তাঁর ছাত্র দিনকর কৌশিক এসে দেখেন সে কাণ্ড ঃ "এসব ছবি এখানে রাখলেন কেন ? বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে যাবে না ?" এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, আমার উপরে জল পড়ার বদলে, ছবির উপর পড়লে কিছু যায় আসে না।" সত্যি! এ কত অভিমানের কথা। কিন্তু সাদাসিধে মানুষ রামকিঙ্কর জানতেন যে চারপাশের মানুষ কতটা কংক্রিট। তিনি যে কত যত্নে ও পরিশ্রমে, মমতায় বিশাল মাপের করে বহু ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরী করলেন। সেখান থেকেও কোনো প্রত্যাশা রাখেননি। সুপ্রতিষ্ঠিত ছেলেদের থেকে দূরে কোনো বৃদ্ধাশ্রমে নির্বাসিত থাকার মত তিনি কাটিয়ে দিলেন তাঁর অতি কষ্টের বার্ধ্যক্য জীবন। হয়ত এখানেও সেই জাতিগত ..... মনে পড়ে যায় গীতার সেই বাণী ঃ

দুঃখেস্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতাস্পৃহঃ

দুঃখ বা সুখ, নিন্দা বা খ্যাতি — সব ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন অবিচল, সমাহিত শান্ত পুরুষ। নিন্দার কথায় তিনি বলেছেন, "ওতো হয়ই সংসারে। সকলের কি দেখার চোখ দেখার মন এক ? ছেড়ে দাও। ওতে কী এসে যায় ? সংসারে রঙ থাকে দেখোনা। হাঃ হাঃ।" আবার যখন তাঁকে ভারত সরকার পদ্মভূষণ উপাধি দিল তখনও তাঁর নিস্পৃহ উক্তি, "আরে হৃষিকেশবাবু, আজ সন্ধ্যায় একটা মজার খবর এসেছে। তার পেলাম ভারত সরকার আমাকে কি একটা পদ্ম-টদ্ম দিয়ে দিল।" আরও বললেন, "ওদিয়ে কী হবে ? অন্য কাউকে দিয়ে দিলেই তো হোত।" তাঁর জীর্ণকুটিরে একটি ছোট গীতা ছিল। গীতার বাণীগুলি যেমন আত্মস্থ করার চেষ্টা রেখেছিলেম তেমনি সেই মহান বক্তা — মহাভারতের নায়ক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ও এক প্রগাঢ় ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি প্রতি জন্মাষ্টমীতেই একটি কৃষ্ণের ছবি আঁকতেন। যার মধ্যে কৃষ্ণের জন্ম এক বিখ্যাত ছবি তাঁর। শান্তিনিকেতন পর্বের আগেও বাঁকুড়াতে একটি কৃষ্ণ ও রাধার প্রেমলীলা এঁকেছেন তিনি। 'অনন্য রামকিঙ্কর' গ্রন্থে সে ছবি তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার কথাই ঘোষণা করে। তিনি সৌমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলেন — "কৃষ্ণকে আমিও খুঁজছি হে সারাটা জীবন ঐ রাধারই মতন। হাঃ হাঃ।" তো আক্ষরিক অর্থেই শিল্প পাগল, ক্ষ্যাপা বাউল মনের মানুষটা — যিনি নিজের জন্য কিছুই চাইলেন না। শুধু সৃষ্টির মধ্যে যে আনন্দ — তাই-ই চেয়েছিলেন। কিন্তু ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও দম্ভে ভরা চারপাশ সেটুকুও পেতে দেয়নি তাঁর সৃষ্টির পাশে আরও ম্লান হয়ে যাবার ভয়ে ? তো গভীর দুঃখে জীবন সন্ধ্যায় এসে তিনি তাই বলেছেন, "ফরমাসী কাজ বাবুদের বাড়িতে মাটি কাটছে বাগানে। মাঝি কোদাল চালাচ্ছে, ঝুড়ি নিয়ে বইছে মেঝেন। দিন শেষে মজুরি নাম-কো-আস্তে। তবু ওরই মধ্যে হাসি গান। ওদিকে ঘরে বসে ঐ গান শুনে



পূর্ণেন্দু পত্রীর স্কেচে রামকিঙ্কর

গোমরা মুখো বাবু ভাবছে ফাঁকি দিচ্ছে কাজে। জ্বালা দেখো দেখি। পাওনাটাতো দেবেই না তারপরে আবার খুশিটাও কেড়ে নেবে।" এসবই ছিল তাঁর প্রতীকী — সান্ধ্য ভাষা। কিন্তু তবুকি সবটা খুশিই কেড়ে নিতে পেরেছে বাবুরা ঐ সাঁওতাল-মাঝিদের। না, পারেনি। তেমনি পারেনি রামকিঙ্করের খুশিটাও। তিনি শান্তিনিকেতনের আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে হাহা করে করে আজও হেসেই চলেছেন বিভিন্ন কংক্রিট কাজের মধ্যে। সে হাসি তাঁর সমস্ত বাধা অতিক্রম করে বিজয়ীর হাসি — কালজয়ের হাসি। আর যাঁরা দেখেন তারাও সে হাসির মধ্যে সংক্রামিত হয়ে যান। আর ভাবতে থাকেন — এমন হাসতে ও হাসাতে পারা কি চাট্টিখানি কথা! কিন্তু সেই গোমরামুখো বাবুরা যে এখনও আছেন। চলছে তাঁদের চক্রান্ত তাঁর হাসিকে বিলীন করার। আর তাই হয়তো আজও এই হাটটেক প্রযুক্তির যুগেও তাঁর মৌলিক কাজগুলি ভালভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হল না। কালবৈশাখীর তীব্র শ্বাস তারা কি আর সহ্য করবে ?

ব্যক্তি রামকিঙ্কর ও তাঁর জীবন যাপনের মতই ছিল সাদামাটা অনাড়ম্বর হাস্যোজ্জ্বল ও বেগবান তাঁর নির্মাণগুলি। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন — "রামকিঙ্করের মতো শিল্পী তিনি জীবনে আর দ্বিতীয় দেখেননি। তিনি ছিলেন নিমগ্নচিত্ত বাঁধনহীন একটি মানুষ। সেই মানুষটিকে চিনলেই তাঁর কাজগুলিকে চিনতে অসুবিধা হবেনা। কারণ তাঁর কাজ এবং তিনি ছিলেন একাত্ম।"

বস্তুত রাককিঙ্করের সাফল্যের একটি দিক বলা যেতে পারে তাঁর সারাজীবন ব্যাপী কথায় ও কাজের মধ্যে মিল থাকা। তিনি যা ছিলেন না তা তাঁর মূর্তিতে নেই। তিনি ভাবতেন যে শিল্পের জগতে হয় হলো নয় হোল না। মাঝামাঝি কিছু নেই। আর তাই তাঁর নিজের না-পছন্দ নির্মাণগুলি তৎক্ষণাৎ ভেঙে গুড়িয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলে তবে শান্ত হয়েছেন। তিনি তাঁর স্বাধীন মত প্রকাশে কখনও দ্বিধা করেননি আর হয়ত এই মানসিকতার জন্যই কলকাতার পথে পথে বসানো মূর্তিগুলি বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মতই জানিয়েছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে আফসোস রয়ে গেছে তাঁর মনে। তিনি বলেছেন, "কী জানেন, বয়েস হয়েছে অনেক। এখন সেয়ানা হয়েছি। এটা বুঝেছি সবকথা বলতে নেই। বুঝলেন, সত্যি কথাটা বলতে নেই। না না না।"



তারপর বলেছেন, "কারো কোনো ওপিনিয়নের দরকারই বা কী ? অবশেষে বলি, আপনি নিজেকেই জিজ্ঞেস করুন। নিজে কি খুশি ? আপনার ইচ্ছাটা — চেষ্টাটা সাচ্চা ?"

তো এই হল গিয়ে শেষ বয়সের রামকিঙ্কর যেখানে তিনি নীরব — কোনো মন্তব্য করতে রাজি নন। তিনি সেয়ানা হয়েছেন। অথচ পূর্বে এসব লাভক্ষতির হিসেব তিনি করেননি। শিল্পী ঈশা মহম্মদ লিখেছেন, "তিনি অর্জন করেছিলেন চরিত্রের দৃঢ়তা, ঋজুতা ও নির্ভিকতা যা তার পরবর্তী জীবনে শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে সব প্রচলিত ধারণাকে উপেক্ষা করে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কাজ করবার ক্ষমতা এবং সাহস জুগিয়েছে। সেই স্বাধীনচেতা, বলিষ্ঠ আত্মমগ্ন মানুষটি জীবনে লাভক্ষতির কথা ভাবেন নি। শুধু চেয়েছিলেন ভালবাসতে ও ভালবাসা পেতে।" বদলে অনেকের কাছেই তিনি পেয়েছেন ঘৃণা। অনেকেই মনে করিয়ে দিয়েছে যে সে কে। সে কী। আর তাইতো আঁকলেন লালন ফকির। পা-টা তুলে দেওয়া। পাশে লিখে দিলেন, 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।' এই ছবিটি মনে করতে গিয়ে পরে তিনি বলেছেন, "হুঁ-বেঠিক বলোনি কথাটা। আমার মনের ভিতরেই ওটা ছিলো। লাথি। লালনের পা-টা তাই সোজা উঠে গেছে। দেখা যাচ্ছে পায়ের পাতা।"



রামকিঙ্করের লালন

"স্টুডিও-র সামনে একটা মহানিম গাছ ছিল। সেখানে ছিল সিমেন্টে বাঁধানো একটা বসার জায়গা আর ঐ জায়গাটাই ছিলো কিঙ্করদার অফিস। ক্লাসের পরে ঐখানে বসে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে গল্পগুজব করতেন। কখনো বা গান জুড়ে দিতেন। তাঁর প্রিয় গান ছিল, 'আরও একটু বসো।' গান করতে করতে কখনো কখনো দু-চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ত জল। বলেছেন তাঁর প্রিয় ছাত্র কুণালকান্তি সাহা। শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর এক ছাত্র। তিনি বলেছেন "তাঁকে কেউ কোনদিন ঝুঁকে কুজো হয়ে আলস্যে বসে থাকতে দেখেনি। এই ভাবটি আমরা তাঁর সৃষ্টির মধ্যেও দেখতে পাই। কলা ভবনে তাঁর স্টুডিও-র সামনে মহানিম গাছের তলায় সবসময় বসতেন দৃঢ় সোজা হয়ে। মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত কোথাও ছন্দের টোল ছিলনা। ছিল সুঠাম সুদৃঢ় আর সেই সঙ্গে মাথা উঁচু করা দৃপ্তি।"

একবার রতনপল্লীর মাটির বাড়ীতে দু-দিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। প্রতিবেশী হৃষিকেশ চন্দ মহাশয় না এসে দেখলে হয়ত মারাই যেতেন। এর থেকে বোঝা যায় পার্থিব সমস্ত প্রয়োজনকে দু-পায়ে মাড়িয়ে সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে তিনি একমাত্র শিল্প সৃষ্টির চেষ্টায় নিমগ্ন ছিলেন। বলাবাহুল্য এরকম ত্যাগের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতেই বিরল। তাঁর এত যে বোধের প্রাচুর্য, চিন্তার তীক্ষ্ণতা ও ভাস্কর্যের পরিমাপগত বিষয়ের চুলচেরা গাণিতিক হিসাব — যা বিস্ময়ে হতবাক করে বিপরীত পক্ষে তাঁর বাস্তব জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনকভাবে তিনি নিতান্ত



অপটু ও বেহিসেবি ছিলেন তাঁর মহান ত্যাগ মানসিকতার জন্য।

জীবন যাপনে বাস্তব বুদ্ধির যে অভাব অথবা মাথাঘামানোয় অনিচ্ছুক বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করা যায়। "তিনি চাকুরীতে আছেন। সব সম্পত্তি থাকে বিছানার তলায়। শ'চৌদ্দ পনের টাকা স্থান পেয়েছে তাঁর বালিশের নীচে। তিন চার দিনের মধ্যেই সব শেষ।" এই অবস্থা জেনে প্রতিবেশী হৃষিকেশ চন্দ মহাশয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করছেন, "আমাকে বলুন তো কি কি খাতে কত খরচ করেছেন, একটা হিসাব করে দেখি।" রামকিঙ্কর তাঁর কথায় শুধু ব্যাকুল ভাবে একটা কথা বোঝাতে চেষ্টা করছেন যে — "নিশ্চয়ই খরচ হয়ে গেছে, তাইতো বালিশের তলায় আর কিছু নেই। যদি খরচ না হতো তাহলে তো থাকতোই। এ সামান্য কথটা বুঝতে পারছেন না কেন ?" হৃষিকেশবাবু এর পর আর কথা বাড়াননি। কিন্তু একটা কথা হলো, তিনি একবারও ভেবে দেখলেন না যে — তাঁর ছাত্র দিনকর কৌশিকের ভাষায় — "তাঁর বাড়ীতে যে সেবিকা কাজ করত সে রান্নাও করত, বাড়ি দেখাশোনাও করত। সে তাঁর সহধর্মিনী ছিল, মডেলও ছিল। সব কাজে কিঙ্করদার সঙ্গে থাকত। বালিশের তলায় তার অবাধ গতি ছিল, মনের ইচ্ছায় টাকা খরচ করত।" ঐ সেবিকার একটি বিশেষ কাজ ছিল তার উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য তাহল "তাঁর একটি বিশেষ কাজ ছিল কিঙ্করদার জন্য মদ জোগাড় করা।" বলেছেন — শ্রী দিনকর কৌশিক মহাশয়। প্রকৃতপক্ষে রামকিঙ্কর অবশ্য এসব জাগতিক ব্যাপার-স্যাপারে মোটেই মনোযোগী ছিলেন না। তিনি একটা বিড়ি পেলেই সন্তুষ্ট — যাতে সুখটান দিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টির ভাবনায় মুখর হয়ে উঠতে পারবেন। কিন্তু বিড়ি যে নেই একটাও। একটা দু-টাকার লাল নোট ছিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সেটাও। তাহলে বিড়ি কেনার কি হবে ? তিনি বালিশের তলা বরাবার হাতড়াচ্ছেন। "না কোথাও নেই কিঙ্করদার কথিত লাল নোট। খুঁজি তন্নতন্ন করে।" তাঁর সাথে চিরুনী তল্লাসি চালাচ্ছেন সৌমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। "শেষটায় চাদরের তলা থেকে বেরল মলাট ছেঁড়া একটা খাতা। ..... হঠাৎ তারি মধ্যে মনে হল লাল-রঙের একটা কী ভাজ করা। হ্যাঁ, টাকাই বটে। তবে দু-টাকার নোট নয়, চেক। কিন্তু তারিখ ? সেও ঐ চিরকুটের মতই পার হয়ে গেছে বহুকাল।"

"পেয়েছো?" কিঙ্করদার দৃষ্টিও ওটার ওপরে। ঝকঝকে চোখে প্রাপ্তি আর আবিষ্কারের আনন্দ।"

"নোট নয় এটা। চেক।"

"ওঃ আমি ভাবি মিললো বুঝি।" কিঙ্করদা আবার হতাশ। চাদরের তলায় মোটা অঙ্কের চেক অবহেলায় বাতিল হয়ে পড়ে রইল। ছোট লাল রঙের নোটের জন্য তিনি দিশাহারা।" 'শিল্পী রামকিঙ্কর ঃ আলাপচারি' গ্রন্থের লেখক সৌম্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অবাক বিস্ময়ে এই কথাটাই সেদিন ভেবেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় তাঁর আরেক ছাত্র শিল্পী কে জি সুব্রহ্মনিয়ামের কথা ঃ তিনি খুব বেশি রকম ভাবে মানুষই ছিলেন কিন্তু চিরাচরিত পার্থিব মানুষের একটু উপরেই চলে গিয়েছিলেন তিনি।"

কিন্তু এইসব মহামূল্য চারিত্রিক বৈশিষ্টগুলি তো শিখিয়ে পড়িয়ে ঢোকান যায় না। এইসব



মানুষ জন্মান। যেমন কজন আর তার মতো অঝোর ধারে কাঁদতে পারে যখন তাঁর বন্ধু স্ত্রী শৈলজ মুখার্জ্জী টিটেনাসে মারা গেলেন। "কিঙ্করদা যখনই দিল্লী আসতেন তখন অনেক রাত পর্যন্ত শৈলজদার সঙ্গে কাটাতেন।" লিখেছেন শিল্পী দিনকর কৌশিক। "যখন তাকে বলা হল শৈলজদা আর নেই — দেখা গেল তিনি মুষড়ে পড়েছেন। ..... কিছুক্ষণ পর আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর দুগাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল। (প্রদর্শনী) দেখা শেষ করে ইতিমধ্যে তিনি অঝোর ধারায় কেঁদে ফেললেন।" এই হল রামকিঙ্কর।

আবার উত্তাল অজয়ের কবলে পড়ে নানুরের বানভাসি মানুষের বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনতে শুনতে তাঁর দু-গাল বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরে পড়েছে। শিল্পী শর্বরী রায় চৌধুরী লিখেছেন, 'একটা সম্বর্দ্ধনা দেবার জন্য আনা হল তাঁকে। একটা গান গাইতে বলা হল। উনি গাইলেন — সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে ফুল ডোরে বাঁধা ঝুলনা।" এই গানটা গাইতে খুব ভালো বাসতেন। আর গাইলেই — দু-চোখ দিয়ে গড়িয়ে আসতো জল।" এমনি আরো অশ্রুপাতের ঘটনা যখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ডাকলেন, বললেন, 'বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বি।' তখনও রামকিঙ্করের চোখে এসেছিলো অশ্রুর বন্যা। তিনি বলেছেন — "ঘরে ফিরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগলাম। যতই ভাবি মনে হয়, দিনটা আজ আমার সার্থক। হঠাৎ খেয়াল করলাম, আমি কাঁদছি জল পড়ছে দুচোখ দিয়ে ঝরঝর করে। জল ঝরছে তো ঝরছেই।" এসবই রামকিঙ্করের অতিসংবেদনশীল কোমল মনের পরিচয়। একবার কাঁদতে দেখেছিলেন তাঁকে হৃষিকেশ চন্দ মহাশয়, যখন রোগারোগ্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে যেতে চাননি। কেননা জন্মভূমির চেয়ে প্রিয় ছিল তাঁর কাছে শান্তিনিকেতন। তিনি একবার বলেছিলেন যে তাঁর জন্ম ১৯২৫ সালে। অর্থাৎ যে বছর তিনি এই সাধনপীঠে এসে পৌঁছান। তাই অশ্রুসজল চোখে সামনে পেয়ে হৃষিকেশ বাবুকেই বলেছিলেম বাধা দিতে। বলেছিলেন — "হৃষিকেশবাবু আমাকে আপনারা পাঠাবেন না। আমাকে শান্তিনিকেতনেই মরতে দিন।" কিন্তু কারো কথায় তাঁরা কর্ণপাত করেননি। অসহায় রামকিঙ্কর সেদিন বলেছিলেন — যাচ্ছি — শান্তিনিকেতন ছেড়ে। যাচ্ছি — কিন্তু আর ফিরব না। — রবীন্দ্রনাথও ফেরেননি।" না, তিনিও ফেরেননি, ফেরার কথাও তো নয়। ওই চুয়াত্তর বৎসর বয়সে মস্তিষ্কে অপারেশান সেটা যে কোন উদ্দেশ্যে ভগবানই জানেন। তো থাক সে আলোচনা। আপাতত তাঁর হৃদয়বত্তার যে বহু কাহিনী আছে তারই কিছু এখানে চর্বিত চর্বন করা যাক। তিনি তাঁর ছাত্র রবিপালের এক প্রশ্নোত্তরে বলেছেন : "না, আমি তোমাদের এই পৈশাচিক উল্লাস (পাঠাবলি) দেখতে পারিনা। এই রকম অহেতুকী উল্লাস বন্ধ করা উচিৎ।" এখানে উল্লেখ, কঙ্কালীতলার পথে খসড়া মুর্তিটি তারই এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ - যা তিনি বড় করে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারেননি।

১৯৫৩ সালে দিল্লীতে যক্ষ-যক্ষীর কাজটি চলাকালীন কর্মচক্রে পড়ে কয়েকজনের প্রভু হয়ে পড়েছিলেন তিনি। এসময় অধীনস্থ কর্মীদের প্রতি তিনি কেমন আচরণ করতেন ? শ্রী রবিপাল লিখেছেন, "সে সম্পর্কে প্রধান খোদাইকার সেখ ইমান প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলেছেন



— তখন এক একজন কর্মীর বারো টাকা করে দৈনিক মজুরি ছিল। কিঙ্করজী সেসব তো ঠিক মিটিয়ে দিতেন। উপরন্তু সরকারী ছুটির দিন ও রবিবারে কাজ না করলেও পুরো মাইনে দিয়ে দিতেন — এমন মানুষ ছিলেন বাঙালকা কিঙ্করজী। সেখ ইমামের এই স্বীকারোক্তি মানুষ রামকিঙ্করকে অন্য মাত্রায় দেখতে সাহায্য করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

"একটি ঘেয়ো কুকুর তাঁর প্রিয় ছিল। তাঁর গায়ে সযত্নে নিম টুথপেস্ট মাখিয়ে দিতেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে বাঁচেনি। বহুদিন পর্যন্ত তার জন্য দুঃখ করেছেন। খেতে বসলে একদল বিড়াল তাকে ঘিরে বসত। অনেক সময় পাত থেকে খাবার নিয়ে পালায়। তিনি নির্বিকার হাত দিয়ে তাড়াবারও চেষ্টা করতেন না।" এ বিবরণ প্রতিবেশী হৃষিকেশ চন্দ মহাশয়ের।

শিল্পী সোমনাথ হোড় লিখেছেন — মানব আর পশুশাবকে খুব একটা তফাৎ করতেন বলে মনে হয় না। কুকুরছানা, বিড়ালছানা তাঁর থালার খাবারের ভাগ নিচ্ছে, উনি বলছেন, "যে যা পারিস তুলে নে, বাঁচতে হবে তো।" রোজকার এ দৃশ্য অবিশ্বাস্য এবং অনুপম। সামান্য মানবদেহে কী বিশাল হৃদয় ধারণ করেছিলেন। তাঁকে পেয়ে আমরা ধন্য আমাদের বৈভব বর্ধিত। এখানে বলতে ইচ্ছে করে যে এ দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য রতন পল্লীর বাড়িতে দুই বৎসর থাকাকালীন এ লেখকেরও হয়েছে। যাই হোক এমনি কতো তাঁর মানবতার উদাহরণ সে সময়কার বহু মানুষের স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে — যেহেতু সেসব কখনও ম্লান হবার নয়। সৌমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, দু-তিন দিনের মধ্যেই কিঙ্করদার ঘরটি হয়ে উঠেছিল ছোটখাটো একটি বন্যা ত্রাণ শিবির।" এই দরদী সমব্যথী মানুষটি যেমন বিপন্নের আশ্রয়স্থল ছিলেন তেমনি তিনি নিজে যেখানে যেখানে উপকৃত হয়েছেন — তাঁদের প্রতি ছিল কৃতজ্ঞতায় ভরা তাঁর অন্তর। বাঁকুড়ার অনন্ত পাল থেকে শুরু করে রামানন্দ রবীন্দ্রনাথ নন্দলাল রাধারাণী ও সহকারী বাগাল রায় — কারো প্রতি তাঁর অকৃতজ্ঞতা ছিল না। তিনি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী সম্পর্কে বলেছেন, "ঢের পেয়েছি আমি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে। ঢের। সেই কষ্টের দিনে টানাটানির যুগে যা পেয়েছি - আজ বুঝি সেতো কম নয়। একথা হাজার বার বলবো। এখানে এসেছি বলেই তো হলো। শান্তিনিকেতনে না এলে কী হতো আমার দশা।" গুরু নন্দলাল প্রসঙ্গে তিনি শ্রদ্ধায় নতশির হয়ে পড়তেন। তিনি রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর অন্যান্য ছাত্রদের বলেছিলেন — গুরু নন্দলাল ছিলেন বিশ্বকর্মার বরপুত্র বুঝেছ ? রামকিঙ্কর তাঁর মাষ্টামশাই প্রবন্ধেও সেকথা লিখেছেন : "আমাদের আচার্যদেব ছিলেন বিশ্বকর্মার বরপুত্র। তাঁর কাজের ভিতর সত্য ও সুন্দর প্রতিভাত হয়েছিল। তাঁর সান্নিধ্যে এসে আমরা পরমধন্য হয়েছি।"

রামকিঙ্করের মডেল, সেবিকা হলেন রাধারাণী গড়াই। এই রাধারাণীর জন্য তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। যেহেতু ঐ রাধারাণীর জন্যই তাঁর দিল্লীতে যক্ষ-যক্ষী মূর্তি নির্মাণে সাফল্য। এজন্য তিনি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। দিল্লীর ঐ কাজটি থেকে পাওয়া বহু অর্থ তিনি রাধারাণীকে দিয়েছেন। বলেছেন — "তোমার টাকা অনেকগুলো পেলাম। তোমার যত দরকার হয় নাও। আমাদের ঘর থেকে কখনও যাবে না।" কেন বলেছিলেন ? কেননা তিনি



জানিয়েছেন, "রাধারানীর স্থূল দেহটা স্টাডি করে যক্ষী বা লক্ষীর প্রতীক রমনী জাতির সূক্ষ্ম ইনার স্পিরিট ধরতে চেয়েছি। ঈশ্বরের করুণা পেতে হলে যেমন কোন এক প্রফেটের (দিব্য প্রেরণা প্রাপ্ত শিক্ষক) মাধ্যমে যেতে হয়, সেইরকম ইনার স্পিরিটকে ধরার জন্য রাধারানী একটা মাধ্যম ছাড়া বেশি কিছু নয়। দেখবে প্রাচীন যক্ষী মূর্তির দেহ গঠনের সঙ্গে রাধারাণীর দেহ গঠনের অদ্ভূত এক সাদৃশ্য আছে, বিশেষ করে নিতম্বের অংশে বা নিম্নাঙ্গে। এই জন্যই বলছি যে ঈশ্বরের অসীম করুণা রাধারানীর সঙ্গে ঠিক সময়ে যোগাযোগ হয়েছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।" একথা 'অনন্য রামকিঙ্কর' গ্রন্থে রামকিঙ্করের সাথে রবিপালের এক সাক্ষাৎকারের কথা। এখানে উল্লেখ্য যে রাধারানী সে টাকায় ভুবনডাঙ্গাতে দু-দুটো দালান করেছিলেন। রাধারানী বলেছেন — "বাড়ী-টা করেছিলাম — ওতো সব টাকা দিয়েছিল।" শুধু ঐ যক্ষী নির্মাণে সাফল্যের কারণেই নয়, অন্য নানাভাবেও তিনি যে উপকৃত হয়েছিলেন সেকথা বলতেও ভুলেননি। বলেছেন, "আর আমার এখানে রাধারানী। খাওয়ায় দাওয়ায়। ভাবতে হয়না। কাজ করে গেছি নিজের মনে। আমি আর আমার কাজ। না না, ও নাহলে হতো না।" বাগাল রায় ও কাশীনাথ — তার দুই যোগানদার বা জোগাড়ে। তাঁদের উপর তিনি কতো অত্যাচার করেছেন — কম্বুকন্টে এর কমই ঘোষণা করেছেন তিনি। বলেছেন — ঐ যে কাশী, বাগাল — ও বেচারীরা খেটে খেটে হয়রান। মাচা বাঁধো। কাঁকর বালি জোগাড় করো, সিমেন্ট মাখো। তারপর যোগান দাও এটা সেটা। রাতে লণ্ঠন তুলে ধরে দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। ঘুমে ঢলে পড়লেও নিস্তার নেই। বাবা জ্বালিয়েছি কম ? আহা, টু-শব্দটি করেনি কখনও কেউ।" সব সময়ের কাজের সাথী দরদী ও মাটির মানুষ বাগাল রায় অবশ্য তা ভাবেননি কোনোদিন। ঈশ্বর যেন পরিকল্পনা করেই এই অনুগত মানুষটাকে রামকিঙ্করের সাথে জুড়ে দিয়েছিলেন। বাগাল রায় বলেছেন, "বললেন, 'চল, আর একটু কাজ করবো।' বলতাম চলুন। রাতেও কাজ করতেন। কাজ করবো বললে না বলতাম নাতো।"

বাগাল রায় বিয়ে করেছিলেন কিন্তু তাঁর কোনো সন্তানাদি ছিল না। অন্যদিকে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন আপাদমস্তক শিল্পী রামকিঙ্কর বিয়েই করলেন না তাঁর আর্ট ওর্য়াক-এর বিঘ্ন হওয়ার ভয়ে। হয়তো কখনো ইচ্ছে হয়েছিল কারোকে বিয়ে করার কিন্তু সফল হননি। এটা একটা মর্মান্তিক ব্যাপার যদিও তবু বিবাহ বিষয়ে তিনি তাঁর গাঢ় অনিচ্ছার কথাই বিভিন্ন জায়গায় যে ব্যক্ত করেছেন তা জানা যায়। শুধু বিবাহই নয় শিল্প ভাবনায় ও রচনায় একনিষ্ঠ এই মানুষটার কাছে মা-বাবা, জন্মভূমি, আত্মীয় পরিজন বন্ধুবান্ধব — সবকিছুই গৌণ বিষয় ছিল। তিনি শিল্পী দিনকর কৌশিককে বলেছিলেন, "যে সমস্ত জরুরি ফর্ম বা আকৃতি বাইরে আসার জন্য আমার মধ্যে জন্ম নেয় এবং আমাকে আলোড়িত করে তোলে তাদের রূপদান করে আমি অবশ্যই আমার ভিতরে একটা স্বস্তি এবং প্রশান্তি লাভ করি। তুমি কি তা বোঝ না ?" আরও বলতেন, "তুমি জানো আমার পেটে সূর্য জ্বলজ্বল করছে। সেটা প্রকাশের জন্য আমাকে সব সময় তাড়া দেয়।" আর এই আভ্যন্তরীণ উদ্দীপনার



পাশাপাশি মূর্তিমান বাধা হিসাবে দারিদ্র যেখানে সেই ক্ষেত্রে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন — "গরীবের শিল্পী ছেলের কল্পনা। একটা পথ খোলা রয়েছে, সংসারের মধ্যে না-ঢোকা।" আরেক জায়গায় বলেছেন, "সংসার — সংসার থেকে তফাৎ-ই রইলাম এসব ঝগাড়ঝাটি ঝঞ্ঝাট থেকে। বাবা রোজগারের তাগাদা — কী দরকার ? কাজ নিয়েই কেটে গেলো... আবার ঐ ছেলেপুলে মানুষ করা — কাজ কাজ সব গোল্লায়।" প্রতিবেশী হৃষিকেশবাবুকে তিনি একবার বিবাহ না করার জন্য আফসোসের কথাও বলেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি তা শুধরেও নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "হৃষিকেশবাবু, বিয়ে-থা না করে কি ভুল করেছি? একাকী রোগশয্যায় পড়ে থেকে মাঝে মাঝে ভাবি আজ যদি স্ত্রী পুত্র বিছানার পাশে ঘিরে বসে থাকত, সেবা যত্ন করত, তাহলে হয়ত নিজেকে এতটা অসহায় মনে হত না। আবার তখনি মনে হয় আমি ঠিকই করেছি। নিজের সব সুখ সুবিধা বিসর্জন দিয়ে একমনে শিল্পের সাধনা করেছি। এটাই ঠিক করেছি। কি বলেন ?" পাখির নীড়ের মতো কোনো স্নিগ্ধ শান্ত ভালোবাসায় ভেজা শান্তির আশ্রয় হয়তো দেখেছিলেন কারো চোখে। কিন্তু তা কখনোই তাঁর লক্ষ্যের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠতে পারেনি। তাইতো তিনি যন্ত্রণা কাটিয়ে আবার উঠে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। তা সে যাইহোক, বিয়ের ব্যাপারে তাঁর সামনে ছিল আরেক পাহাড় প্রমাণ বাধা — তা অর্থ। যে বয়সে সবাই বিয়ে করে সেই বয়সে অর্থের মুখ তিনি দেখেননি। বলেছেন, "অবৈতনিক কাজ করেছি কলাভবনে। নন্দলাল বাবু তখন পেতেন পঞ্চাশ টাকা। পরে আমি আর বিনোদবাবু পেতাম সাড়ে বারো টাকা করে। দু-বেলা মাছ ভাত আর টিফিন হিসেবে লুচি হালুয়া-লাগত দশটাকা। বাকি টাকায় হাত খরচা চলতো।" কাজে কাজেই ও ভাবনা তিনি ভাবতে পারেননি। শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাবার কথাও ভাবেননি কখনো। তা বিয়ের ক্ষেত্রে বাধা হলেও বাস্তবিক এই পরিস্থিতিতে তিনি আতঙ্কিত হতেন ছবি আঁকা ও মূর্তিগড়ার ক্ষতি হবে বলে। তিনি বলেছেন এই প্রসঙ্গে "হয়তো ঠিক এটাও কারণ নয়, বিয়ে করার কথা যত বারই ভেবেছি, মনে হয়েছে বাধ্যবাধক সংসার করলে ছবি আঁকার ক্ষতি হবে। ছবি আঁকতে পারবো না। মূর্তি গড়তে পারবো না — এই ভয় থেকেই বিয়ে করার কথা ভাবিনি। ভীতু ভাবছো ? স্বার্থপর ভাবতে পারো। নিজের শিল্প সত্ত্বাকে বেশি ভালোবেসে ফেললে একটু ভীত, একটু স্বার্থপর হতেই হয়। তুমি বিয়ে করেছো ? করো আর নাই করো, কখনো শিল্পের জগৎ থেকে সরে যেওনা। যদি ভয় থাকে, ভীতু হয়ো, একটু ভেবে দেখো :"

তো রামকিঙ্করেরর জীবনী থেকে একটা জিনিস শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে যাঁদের আভ্যন্তরীণ শিল্প ভাবনা প্রকাশের লাগি রোদন করে চলে অথচ সামনে রূঢ় দারিদ্রও রয়েছে, তিনি তাঁদের জন্য বলেছেন — একটা পথ খোলা রয়েছে, সংসারের মধ্যে না ঢোকা।" কিন্তু এটা একটা মস্ত ঝুঁকিও বটে। কারণ শিল্পের জন্য কে আর অসুন্দর বার্ধক্য জীবনকে স্বীকার করে নেয় যেখানে তিনি একাকী রোগশয্যায় পাশে স্ত্রী-পুত্রাদি-নেই বলে অসহায় বোধ করেছেন। পাশে আপনজনের বেড়া না থাকায় তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছাকে পাত্তা না দিয়ে কলকাতায় সু-চিকিৎসার জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যে প্রসঙ্গে দিনকর কৌশিকের কথা উত্থাপন



করা যায় ঃ "কিন্তু তারপর তাঁর আর খোঁজখবর নিচ্ছিলেন না। ডাক্তাররা কী সার্জারী করেছে সে খবর কেউ নেয়নি।" সুতরাং একথা হলফ করে বলা যায় যে প্রকৃত সাধক ছাড়া এহেন ত্যাগ কারো পক্ষে সম্ভবই নয়। তিনি সাধক ছিলেন — তাই শান্তিনিকেতনেই থেকে গেলেন — শিল্প সাধনার নিমিত্তে ঐ রবীন্দ্রনাথের কথাকেই সত্য করে দিয়ে, যেখানে তিনি বলেছেন; "যারা সাধক তাঁরা এখান থেকে যাবেন। আর যাঁরা পথিক তাঁরা এখান থেকে চলে যাবেন।'

রামকিঙ্করের দিল্লীর যক্ষ-যক্ষী নির্মাণের পাথর খুঁজতে যে কয়েক লক্ষ টাকা অপব্যয় ঘটিয়ে দিয়েছিল কেউ — তার নানা সমালোচনায় তিনি ছিলেন নির্বিকার। তেমনি "মানসম্মান পাবার পূর্বে এবং পরে সে হাজার হাজার টাকার ছবি এঁকে এবং মূর্তি গড়ে উপার্জন করেছে কিন্তু তার অমায়িক ব্যবহার ছাত্রপ্রীতি ও বন্ধুবাৎসল্য কমেনি।" বলেছেন সহপাঠী শ্রী প্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নিজের না হওয়া কাজের প্রতি যেমন নির্মম ছিলেন তেমনি অন্যের বেলাতেও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁর আপন অভিমতটি বলে দিতে দ্বিধা করতেন না। যেমন সুনীল দাস নামে জনৈক তরুণ শিল্পীকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, "সুনীল একসময় ঘোড়া আঁকত, এখন সে ঘোড়ার ডিম আঁকতে আরম্ভ করেছে।" এইরকমই ছিল তাঁর অকপট ও সরাসরি মন্তব্য — ঠিক যেমন তিনি বলেছিলেন কলকাতার পথেঘাটে ছড়ানো মূর্তিগুলির বিষয়ে যদিও প্রথমটা তিনি সে ব্যাপারে রাজী ছিলেন না। তো তারই প্রতিক্রিয়ায় কি তাঁকে নানান অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছে এবং হবেনও। তাই হয়ত পরে তিনি একটু শুধরে নিয়েছিলেন নিজেকে ঃ কী জানেন বয়েস হয়েছে অনেক। এখন সেয়ানা হয়েছি ..... একথা তিনি এক শিল্পীকে বলেছিলেন যাঁর অনুরোধই ছিল, তাঁর নিজের আঁকা ছবি বিষয়ে রামকিঙ্করের একটা ওপিনিয়ন। তো রামকিঙ্করের এই যে নিজেকে শোধরানো সে তো বহু ধাক্কা খেয়ে। যেমন — নেতাজীর ম্যাকেট ফিরে এসেছে। "বার্থ অফ ফায়ার" এর ইতি। "কঙ্কালী তলার পথে" কতৃপক্ষের উন্নষ মেশানো না শব্দটির জন্য আরম্ভই করতে পারলেন না। রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তিটি "রবীন্দ্ররাথের প্রতি অবমামনাকর" বলে — সরিয়ে ফেলার তোড়জোড় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। ধানঝাড়া মূর্তিটি তাঁকে না জানিয়েই সরানো। এবং "স্থানান্তরিত করা কালীন এটি গুরুতর ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।" — এসবই তাঁকে বদলে ফেলার পক্ষে অনেক বেশিই। কিন্তু তবু কি তিনি সাধারণ মানুষের চোখে যা আশ্চর্য — সেই অকপট মন্তব্য, মানবিকতা, বেড়ালের সাথে একপাতে আহার, আমাদের কাছে অদ্ভুত মানসিকতাগুলির সবকটি বদলাতে পেরেছিলেন? না, পারেন নি। যেমন পারেন নি — অধ্যাপক বিনয় ভট্টাচার্য্যের দেখা শ্রীনিকেতনের রাস্তায় এবং হৃষিকেশ চন্দের দেখা রতনপল্লীর পাকুড়গাছের তলায় তাঁর হামাগুড়ি দিয়ে আলোছায়ার খেলা স্টাডি করা। কারোকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে বেমালুম ভুলে গিয়ে নিজে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়া। রতনপল্লীর অন্ধকার পথে পথ হারিয়ে কাঁটা ঝোপের মধ্যে পড়ে বিকট অট্টহাসি হেসে চলা। কিম্বা কখনো কারোকে কোনো কাজ করিয়ে বেমালুম ভুলে তার সেই পারিশ্রমিকের বাকি টাকা না দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া ও পরে স্মরণে এলে তখনই বর্ষাসিক্ত রাতে তার বাড়ি গিয়ে ক্ষমা চেয়ে পারিশ্রমিকের অনেক বেশি দেওয়া।





বিপুলকান্তি সাহার কংক্রিটের রামকিঙ্কর

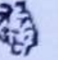
আবার কোনো ছাত্রীর শ্রদ্ধার উপহার যে দামী সোয়েটারটি তড়িঘড়ি খুলতে না পারায় অম্লান বদনে ব্লেড দিয়ে চিরে ফেলা। কখনো বা তাঁর ছাত্র বলবীর সিং-এর গড়া তাঁরই পোট্রেটের মুখের নিম্নাংশ ভেঙে এই বলে তাঁকে সংশোধন করা যে "আমার মুখের এ অংশটা এগিয়ে এসেছে হে — এগিয়ে এসেছে কুকুরের মতন। হাঃ হাঃ হাঃ।" এ সবই কি তিনি পাল্টে ফেলেছিলেন ? নাকি পেরেছিলেন। না, পারেন নি কেননা পৃথিবীর তাবৎ বড়ো মানুষেরা যে এমনই শিশুর মত স্বচ্ছ ও সাবলীল মানসিকতার অধিকারী হন যা দেখে আমাদের অস্বাভাবিক লাগে। অবাক লাগে। অবাক লাগে যখন দেখি এমনই মানুষদের নিয়েও জলঘোলা চলে। সত্যকে মিথ্যা করে ক্রুসে চড়ায়। কেননা ধ্বংসাত্মক মস্তিষ্কের কোষে কোষে যে আক্রোশেরই সহাবস্থান। সেখানে সৃষ্টির রোমাঞ্চ নেই, আনন্দ নেই। তবে রামকিঙ্কর অবশ্য তা নিয়ে তেমন মাথা ঘামান নি। তিনি তাঁর হা হা হাসিতে সেসব ধুলোবালির মত উড়িয়ে দিয়েছেন, ঝেড়ে ফেলেছেন। রামকিঙ্করের জীবনে গানই ছিল একমাত্র ভরসাস্থল। যেখানে তিনি সুখে দুখে নিজেকে সঁপে দিতেন। আর এক্ষেত্রে রবীন্দ্রগানই ছিল তাঁর কাছে প্রাণের আরাম ও আত্মার শান্তি। তিনি সৌম্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছেন — "গান না গাইলে বাঁচবে কি করে।" বলাই বেশি যে কী গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এই বাক্য — যা আমাদের সত্ত্বাকে নাড়া দিয়ে যায়। শান্তিনিকেতনের রাতের আকাশ বাতাস কাপিয়ে ভরাট গলায় তিনি গাইতেন। "মাঝে মধ্যে পূর্ণিমা রাতে তিনি বাইরে বসে এত জোরে গান গাইতেন যে তা অনেকদূর পর্যন্ত শোনা যেত।" এই স্মৃতিচারণ তাঁর ছাত্র শ্রী মিঠারাম ধরমানীর। তাঁর আরেক ছাত্র শ্রী অমৃতলাল বেগড়। তিনি লিখেছেন, "তিনি রবন্দ্রীসঙ্গীত গাইতেন নিজস্ব ঢঙে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় স্টুডিও-র বাইরে একটি গাছের তলায় তক্তাপোষে বসে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন। তিনি গাইতেন পরিষ্কার এবং উচ্চস্বরে পূর্ণ শক্তি দিয়ে। তাঁর স্বরের আরোহ অবরোহ কলাভবনের নীরব নিস্তব্ধ পরিসরকে মাধুর্যে ভরিয়ে দিত। আমার প্রতিদিনের প্রধান ঘটনাবলীর মধ্যে ছিল তাঁর সন্ধ্যাকালীন গান। আমি ভাবতাম মানুষের গলা থেকে এ হেন অপার্থিব স্বরে বেরোয় কি করে ?" তিনি রামকিঙ্কর সম্পর্কে অন্য কথায় লিখেছেন, "তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিল অগম্য, অজানা। তাঁর

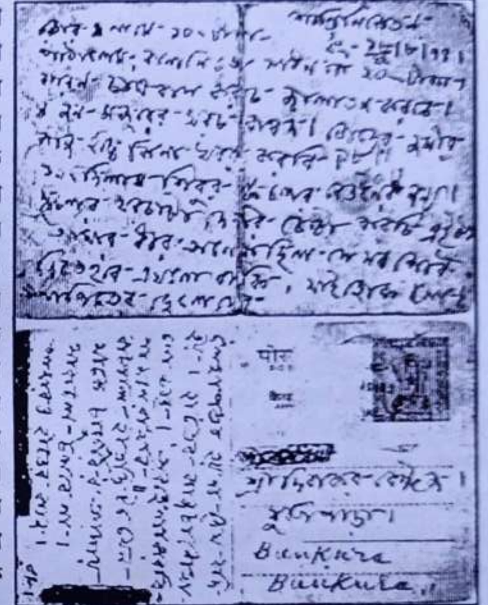


হাবভাব ও চালচলনে ছিল বিজেতার অবিচল দর্প। তিনি ছিলেন — বেপরোয়া, নিজের আনন্দে নিমগ্ন, শিশুর মতো অবোধ ও আস্থাবান। তাঁকে সবসময় তরতাজা মনে হোত। খুব অল্প লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। তাঁর নিজের ছাত্র ছাড়া আর কারো সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে দেখিনি।" আসলে কোনো মানুষ যখন সুরের দিকে এগোয়, বেসুরো তখন অনেক পিছনে পড়ে যায়। রামকিঙ্করও ওইভাবে সঙ্গীসাথীহীন একা হয়ে পড়েছিলেন। আপাদ-মাথা শিল্পী এই মানুষটা যেমন লাভালাভের কথা ভাবেননি, তেমনি ভাবেননি তাদের স্থায়িত্বের ব্যাপারেও। কাজেই তাঁর ছিল আনন্দ। বলতেন — "গভীর অরণ্যের মধ্যে ফুল ফুটে থাকে, সেখানে হয়ত তাকে কেউ দেখবে না। ফুলের ফুটে ওঠাই কাজ এবং সার্থকতা।" এখানে রামকিঙ্কর নিজের হয়ে ওঠার কথাই বলেছেন। যেখানে তিনি ক্রমশ সিদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবেন। তিনি শিল্প নির্মানের ক্ষেত্রে কারোবা কোনো নির্দেশমত কিছু করতে কখনোই রাজী ছিলেন না, বলতেন — "কেউ অর্ডার দেয়নি, তবু গাছ হচ্ছে।" এক প্রশ্নোত্তরে তিনি আরকিটেকচার ও স্কাল্পচারের মধ্যে ফারাকটা কি বলেছিলেন — "একটি হেতু আর একটা অহেতুক। একটি কারণে আর একটি অকারণে।" তিনি মনে প্রাণে বুঝেছিলেন যে "আর্ট জিনিসটা চিরদিনের ডিস্‌স্যাটিসফ্যাকশন, অহেতুকী।" বলেছেন, "আবার সেই অনুভূতি, জীবনের অভিজ্ঞতা, নৈসর্গিক সচেতনতা, সৌন্দর্যবোধ, শব্দের অনুভূতি এসব মিলিয়ে একটি অহৈতুকীর প্রকাশ।" এই হিসেবে তো আর্টকে কখনই মূল্যের হিসেবে পরিমাপ করা চলেনা। আর তাই তিনি মনে করতেন "আমি মনে করি আর্ট বিক্রয়যোগ্য পন্য নয়।" বলেছেন, "শিল্প তো এক অর্থে রহস্যময় মায়া। এই-ই জীবনকে মূল্যবান করে তোলে।" আরো বলেছেন — "আমাদের ক্ল্যাসিক্যাল গান একভাবে ইনফিনিটকে ধরেছে শুধু সুর দিয়ে, অনুভব দিয়ে। ...ছবিতেও তাই — কখনও বর্ণনা বা অর্থ দিয়ে ধরা হয়, কখনও হয় অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের বর্ণনা বাদ দিয়ে শুধু রাগিনীর মতো রূপ দিয়ে।" রামকিঙ্করের এইসমস্ত সরল অথচ ভাবগম্ভীর কথাগুলির মধ্য দিয়ে আমরা খুব সহজেই ব্যাক্তি মানুষটাকে একরকম বুঝে নিতে পারি যেখানে তিনি ছিলেন বাইরের, এক অতিসাধারণ আবরণের ভিতরে এক মহামানব।

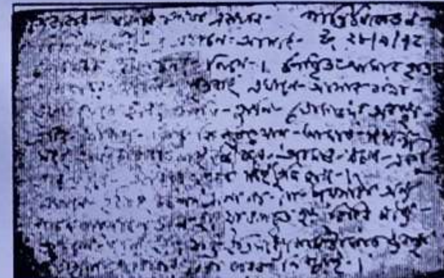
শিল্প পাগল অসংসারী নিঃসঙ্গ মানুষটা অনেকের প্রতিই কৃতজ্ঞ ছিলেন। কৃতজ্ঞ ছিলেন আপন ভাইপো দিবাকর বেইজের প্রতিও। কেননা "কাকাবাবুর বাবা এবং মায়ের সেবা যত্নের ভার পড়ে আমার উপরেই।" বলেছেন — দিবাকর বেইজ। তাই তিনি ভাইপোর সংসারে নিয়মিত যোগান দিয়ে গেছেন সাধ্যমত। সৌম্যেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর সংসার থেকে তফাৎ থাকার কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে গেছে ভাইপো দিবাকরকে। তিনি যখন বলছেন,"সংসার —সংসার থেকে তফাৎ-ই রইলাম - এসব ঝগড়াঝাটি ঝঞ্ঝাট থেকে।" ঠিক তখনই তাঁর দিবাকরের কথা মনে পড়ে, কথা পাল্টে ফেললেন। বললেন, "না না মানুষ তো করলাম ভাইপোকে। দিবাকর। বাঁকুড়ায় সংসার।"

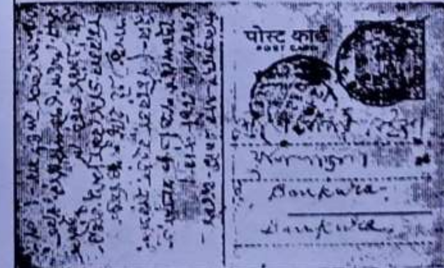
হ্যাঁ, বাঁকুড়ার সংসার অবশ্য তিনি দেখেছেন। বর্তমানের দালান বাড়িটি তাঁরই পাঠানো





টাকায় নির্মিত। আমার বাবা দিবাকর বেইজ দাদুকে টাকা টাকা করে জ্বালাতন করত ঠিকই তবে রাধারানীর খরচ মিটিয়ে ও তার চোখ এড়িয়ে যা পাঠাতেন তাতে বাবার অনটনের সংসারে খুব একটা সুরাহা হত বলা যায় না। একবার ১০টাকা পাঠিয়ে তিনি ১৮. ৮. ৭৪ তারিখে বাবাকে লিখেলেন — "তোর নামে ১০টাকা পাঠালেম। বালসিতে সাধনকে ২০ টাকা কারণ চাষবাস করচে, জ্বালাতন করচে। ৪জন মজুরের খরচ বাবাদ। তোদের জমীর কাজ হচ্ছে কিনা খবর করবি। ১০ দিলাম শিবুর স্কুলের বেতনের জন্য। স্কুলের খরচটা দেবার চেষ্টা করচি। এইটা আমার ধার অনেক

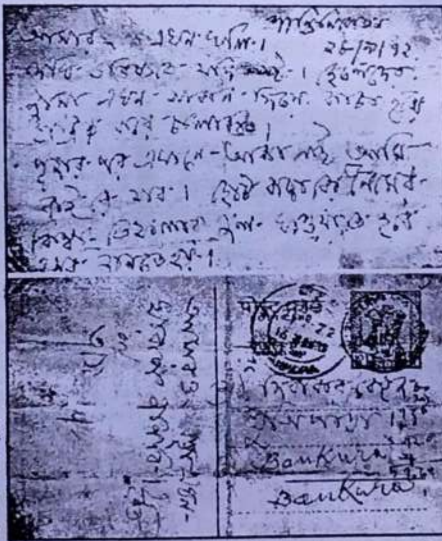




ছিল সেসব শোধ দিতে হবে। এখনো বাকি। যাই হোক .....। নাপিতের ছেলেদের লেখাপড়া হয়না। দেখ যদি হয়। হাতের কাজটা শোখানো চাই। অবহেলা করবি না, মনে রাখবি। বাটালি-হাতুড়িটা যেন থাকে। চাকুরির আশায় থাকলে চলবে না। আমারও হাতের কাজ হবে" 'রা'। আমার মা একবার ছেলেমেয়েদের নিয়ে দাদুর ওখানে যাবার কথা লিখে জানালে তিনি ২৮. ৯. ৭২ তারিখে লিখেছিলেন — "দিবাকর, যমুনার লেখা একখান চিঠি পেলেম। ও এখানে আসবে লিখেছে ছেলেদের নিয়ে। উপস্থিত আমার হাত একেবারে খালি। সুতরাং এখানে

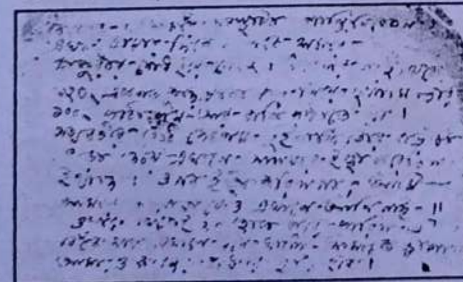


আসার কথা ভুলে যেতে হবে। আমি জানি, তোমাদের অবস্থা এখন খারাপ —কিন্তু কি করা যায় — আমার সম্বন্ধে সবই জান। চাকুরি নাই, কিকরে আমার চলে একটু ভাবতে হবে — আমার খরচা সবই তুমি জান। এখানে হঠাৎ চলে এসোনা, সে পয়সাটা অন্য কাজে লাগালে ভাল হয়। যা বলতে হয় চিঠির মধ্যে লিখলে ভাল হয়। যদি ইতিমধ্যে কোন টাকার ব্যবস্থা হয় তাহলে পাঠাবার চেষ্টা করব নিশ্চয়ই। মাকড়াদের স্বর্ণকার আর একটি ফটো পেলেম - চেষ্টা করব। ছেলেদের পঞ্চতিক্ত খাওয়াতে হবে (চিরতা, বহড়া, হরিতকি, গুলঞ্চ) এই হচ্ছে পঞ্চতিক্ত। চিরতার ভাগ বেশী। সেদ্ধ করতে হবে একটা ভাড়ে। ..... ছটাক করে খেলে পেট পরিস্কার থেকে অনেক রোগ সেরে যায়"। 'রা'

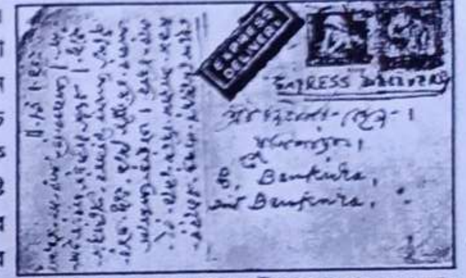


২৮. ৯. ৭২ তারিখেই তিনি আর একটি চিঠিতে লিখলেন "আমার হাত এখন খালি। দেখি ভবিষ্যতে যদি পাই। ছেলেদের জামা এখন সাবান দিয়ে কাচা হয়ে ইস্ত্রি করে চালাবি। পূজোর পর এখানে আশা নাই, আমি বাইরে যাব। ছোট বাচ্চাকে নিমের কিম্বা তেফলার জল খাওয়াতে হবে। এসব জানতে হয়। আমার অবস্থা এখন খারাপ জানবি।" 'ইতি রা'

বাবা কিন্তু হাল ছাড়লেন না। তিনি এবার দিদিকে দিয়ে চিঠি লিখে পাঠালেন। উদ্দেশ্য — দাদু যাতে কিছু টাকা পাঠান। তো এই চিঠিতে ভীষণ উদ্বিগ্ন ও বিষন্ন দাদু তড়িঘড়ি একজনের কাছে ধার নিয়ে ১০০টাকা মানি অর্ডার করে একটি Express delivery চিঠি পোষ্ট করলেন। তারিখ বিহীন এই চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন "দিবাকর, আমার অবস্থাটা এখন ভাটার দিকে চলেছে। আমার চাকুরি শেষ হয়ে গেছে। ধবলের কাছ থেকে ১২০ একশত কুড়ি টাকা ধার নিয়ে ছিলাম তার ১০০ টাকা পাঠালেম আর বাকি পাঠাতে হবে। সত্যবতীর চিঠি পেলেম তুই নাকি তোর বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে এখানে

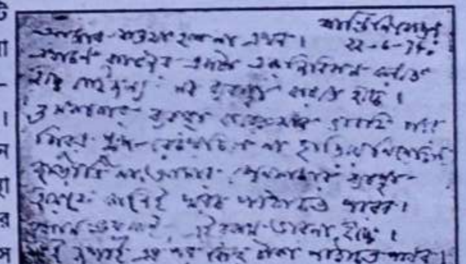


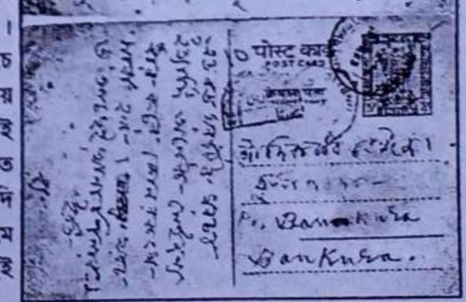




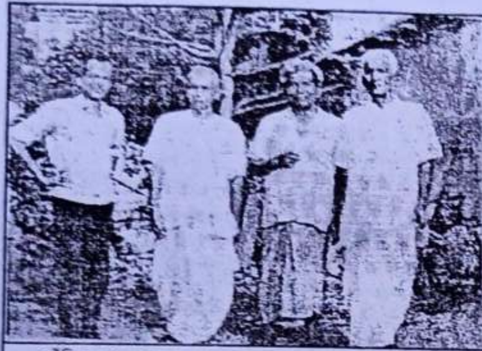
আসবার ইচ্ছা করেছিস্ ইত্যাদি। ওসব ইচ্ছা করিস না। আমি মা বাবাকেও এখানে আনি নাই। ওখানে থেকেই যা হোক করে পারিস-ত বেঁচে থাক। এখানে এসে খালি আমাকে জ্বালা আমারও কাজের বাধার সৃষ্টি হবে। ছেলেমেয়েদের কাপড় এবারের মতন সাবান দিয়ে কেচে রং করে দিবি। তাছাড়া আমাকে আবার দিল্লী যেতে হচ্ছে তার জন্যে আবার টাকার প্রয়োজন হচ্ছে। এখন বাঁকুড়া যাওয়া হল না। আশাকরি আর সব ভালো।" 'ইতি রা'

দাদুর সেবিকা ও মডেল রাধারানী গড়াই পছন্দ করতেন না যে দাদু তাঁর আত্মীয় পরিজনদের দেওয়া থোওয়া করুক। মাঝে মধ্যে যখন আমার পড়ার বই কেনা, স্কুল ও টিউশনির বেতনের জন্য রতনপল্লীতে গিয়ে উঠতাম রাধারানী দিদিমা ক্ষুন্ন হতেন দেখেছি। বলতেন, "পড়াশোনা করে আর কি হবে। একটা যা হোক্ কাজ করো এবার। বাবুর টাকা নাই।" দেখতাম যে দাদু চুপ করে আছেন। আমিও জানতাম তিনি দেবেন। এবং আসার সময় দিতেনও। আমার পড়ার ব্যাপারে তাঁর একটা দায়িত্ব বোধ ছিল। তার নমুনা স্বরূপ — তাঁর ২২. ৬. ৭৪ তারিখে পাঠানো একটি চিঠি এখানে তুলে ধরা হল — যা সম্বোধন বিহীন। বাবাকে লেখা — "আমার যাওয়া হল না। এখন। এখানে কাজের একটা একজিবিসন করতে হচ্ছে। সেইজন্য সব ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। ও সকলের ব্যবস্থা করে যাব ভাবছি পরে। শিবুর স্কুল রেখেছিস না ছাড়িয়ে নিয়েছিস। ছাড়াবি না। আমার পেনসনের ব্যবস্থা হয়েচে কাজেই পাঠাতে পারব। কোন ভয় নাই। এইরকম ভাবনা হচ্ছে ১৫ই জুলাই এর পর কিছু টাকা পাঠাতে পারব। এতবড় ঘরটির খরচা ইত্যাদি অনেক সেইজন্য ধারকরে কোনরকমে সারা (নো) হল। খরচ তো আছেই খানা পিনায়।" 'ইতি রা'





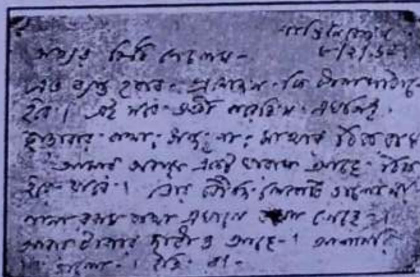




বাঁদিক থেকে বাসুদেব চন্দ্র ও বাল্যবন্ধু অতুল কুচলান, বিশ্বনাথ নন্দীর মাঝখানে রামকিঙ্কর

তা আমার পড়ার খরচ যেহেতু দিতেন নিয়মিত, আমিও তাঁকে খুশি করতে ভালো ফল করায় ওঠে পড়ে লাগতাম, করতামও। এবং যথারীতি চিঠি লিখে বা বাবার সাথে গিয়ে দেখাতাম পরীক্ষার ফল। এমনি একটি চিঠির উত্তরে আমাকে জানালেন তিনি — "শিবু তোমার চিঠি পেলেম। পরীক্ষায় পাশ করেচ জেনে খুশি হলেম। আমার নাম রেখেচো। এমনি করে যেও। স্কুলের মাস্টার মহাশয়দের একটি করে ছবি এঁকে দেবে। তাঁরা তোমার উপরে খুশি থাকবেন। এবার বাঁকুড়ায় কেউ মেলার সময় আসে নাই। বাবাকে চিৎ হয়ে শুয়ে বুকে রোদ লাগাতে বলবে। স্কুলের খবর তোমার বইয়ের খবর পেলে পর যাদের পুরনো বই আছে তাদের পায়ে হাতে ধরে আদায় করবার চেষ্টা করবে। পয়সা দরকার হলে দিতে হবে বইকি। মামা বাড়ির খবর ভালত? শীতের সময় বুড়ো লোক অনেকেই মরে যায়। বস্তা দিয়ে জামা করা যায়। সেলাই করতে জানা চাই। অনেকে (র)ই দামী কাপড় না হলে শীত কাটেনা বলে তারাই মরে। সাহেব বাবুদের — নকল বাবুদের নকল করবার চেষ্টা। "ইতি রামকিঙ্কর"।





এই চিঠিতে তাঁর দায়িত্ববোধ, আত্মসম্মানবোধ, মমতা ও কর্তব্যের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর ও শহুরে কেতা দুরন্ত মানষিকতার প্রতি তীব্র দ্বেষ পরিলক্ষিত হয়। ভাইপো দিবাকরের সংসারের প্রতি তাঁর শুধু





নজরই ছিলনা, ছিল যথেষ্ট দুর্ভাবনাও। পরবর্তী চিঠিতে আমরা তাই-ই দেখতে পাই। লিখেছেন তিনি ঃ সত্যর চিঠি পেলেম। এত ব্যস্ত হবার প্রয়োজন কি। টাকা পাঠানো হবে। এই সবে ভর্ত্তী করেছিস এখনই ছাড়াবার কথা মন্দ না। মাথার ঠিক রাখ। আমার অবস্থা একটু খারাপ আছে, ঠিক হয়ে যাবে। তোর বৌদি লোকটি ভাল নয়। নানারকম কথা এখানে বলে গেছে। আবার টাকার দাবীও আছে আশাকরি সব ভালো।" 'ইতি রা'

"(পুনশ্চ) —তোরা আপনার কাজ ভালো করে করার চেষ্টা কর। এটাই ত আশা। না হলে আমার ভাবনা।"

বাবার মুখে শুনেছি আমাদের বাড়ীর যে সেপটিক ট্যাঙ্কের নির্মাণ নাকি তাঁরই আইডিয়া মাফিক। এ ব্যাপারে অবশ্য তাঁর চিঠিতে কিছু প্রমানও রয়েছে। তিনি লিখেছেন — 'দিবাকর, আশাকরি টাকা পেয়েছিস। পায়খানাটার কথা হচ্ছে ইঁদুরে মাটি ফেলেছিল যে দিকটায় সেটা বন্ধ করা চলবে না। সেটায় বরঞ্চ একটা ছোট সিমেন্টের পাইপ নীচের দিকে মুখ করে লাগিয়ে দিস। মুখে তারের জাল। তাহলে জল সব সময় পড়তে থাকবে। আর সামনের যে রাস্তাটা আছে সেটা পরিস্কার করে দিস্ যাতে জলটা সব সময় বেরতে পারে। আশাকরি মেয়ে ছেলেদের শরীর ভাল। সত্যবতী স্কুলে যাচ্ছেত? আমার কাজ এখনো চলবে। কবে শেষ হবে কে জানে।

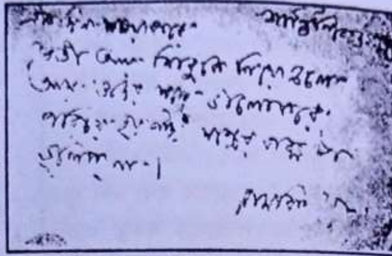


অতুল বিশ্বনাথকে আমার কথা বলিস্।" 'ইতি রা'

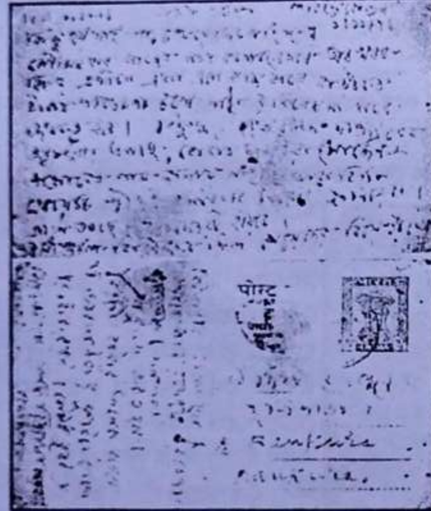
অসংসারী উদাসী ও বাউল মনের মানুষ রামকিঙ্করের এ সমস্ত চিঠিগুলি আমাদেরকে একটু ভাবায় বটে। তিনি বিস্মৃতি হতে পারেননি, এড়াতে পারেননি রক্তের টানকেও। এমনি প্রমান স্বরূপ তার এক চিঠি ঃ "একদিন সময় করে রেবতী আর শিবুকে নিয়ে চলে আয়।



যন্ত্রের বাক্সটা ভুলিস্ না।" 'রামকিঙ্কর'

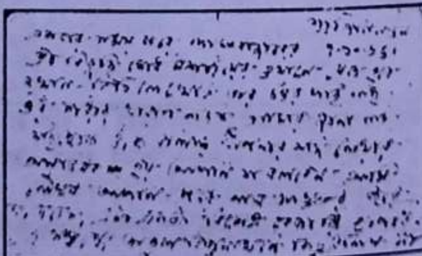


বাঁকুড়াতে ভাইপো দিবাকরের কাজের বাজার মন্দা। একথা বারবার চিঠিতে জানাতেন তিনি। তাই হয়তো শান্তিনিকেতনে ভাইপোর কাজের ব্যাপারে কারোকে বলেছিলেন — তিনি লিখেছেন — ১. ১১. ৭৪ তারিখে। "চিঠি পেলেম বাকী জমিতে কিছু হয় নাই - না খেয়ে ফেলেছিস? সৌম্যেন বাবু কাজের কথা বলেছিলেন তার খবর কি ? এখানে একা এসে কাজ করে বাড়ীতে টাকা পাঠানো চলে নাই ? বিবেচনা করে দেখতে হবে। বিষ্ণুপুরে হয়ত কোন ডাক্তারের তত্ত্বাবধনায় আছে। বোকা মানুষরা সার্জেন ডাক্তারের নাম জানায় নাই। থাক্ চিঠি পেয়েচি। শীঘ্রই মৌকুচি ফিরবে জানিয়েচে। ভাল আচে। রক্ত দেওয়া হয়েচে।"



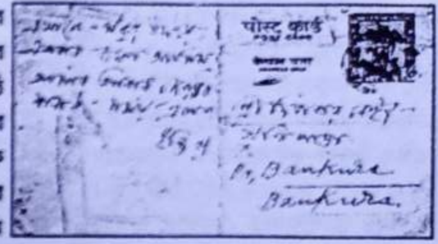
চিঠিতে যে চিকিৎসা সংক্রান্ত বক্তব্যটি — সম্ভবতঃ তাঁর ভাগ্নে আশুতোষ পরামানিকের ব্যাপারে। আশুতোষ পরামানিকের ছেলে, সাধন পরামানিককেই তিনি তাঁর উইলের এক অংশীদার করে গেছেন। যাইহোক পরে তিনি ঐ চিঠিতেই ভাইপোকে লিখেছেন, "জমিগুলি বিক্রী করে দিলে মেয়েদের বিয়েটিয়ের কি করবি — ভাবতে হবে। এখানে কাজ রয়েচে ধরতে পারা গেল না। যা বুঝিস করতে হবে। বিক্রী করার অনেক রয়েচে তো ভাবনা কি ? ফুরিয়ে গেলে পরে কি করবে। সেটা বুঝ। সোমেনকে আমি জিজ্ঞাসা করেচি।" 'রামকিঙ্কর'

বাঁকুড়া লালবাজারের অধিবাসী বিশ্বজননী শ্রী শ্রী সারদামায়ের ভক্ত শিষ্য বিভূতি ঘোষ মহাশয়ের সাথে তাঁর চিঠিতে যোগাযোগ ছিল। একটি চিঠিতে তিনি বিভূতি বাবুর খবর নিয়ে জানাতে বলেছেন — কারণ দুখানি চিঠির তিনি কোন উত্তর পান নি। এজন্য উদ্বিগ্ন।

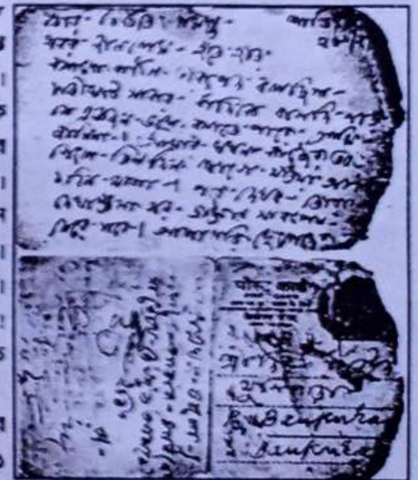




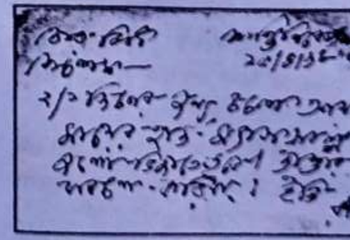
লিখেছেন — "একবার সময় করে লালবাজারের শ্রী বিভূতি ঘোষ মশাইয়ের ওখানে যেতে হবে। — ২ খানি চিঠি লিখেচি তার উত্তর পাই নাই। ওঁর শরীর খারাপ নাকি আমার জানা নাই। যাইহোক ওঁকে বলিস আপনার যদি লেখার অসুবিধা হয় আপনি যা বলবেন আমি লেখব। আপনি পরে নাম স্বাক্ষর করে দেবেন। এটা একটা বিশেষ দরকারি ব্যাপার। এ সম্বন্ধে অতুল বিশ্বনাথকে কিছু বলিস্ না। এখানে খবর দিয়ে একবার চলে আসিস। আমার আবার দিল্লী যাবার সময় এল।" 'ইতি রা'



একবার দাদুর বৌদি বা আমার ঠাকুমা'র হাত ভেঙ্গে যায়। সে খবর চিঠিতে বাবা জানিয়েছিলেন। চিঠি পেয়ে ২৮. ২. ৬৮ তারিখে লিখছেন — "তোর চিঠিতে সমস্ত খবর জানলেম। হাতের হাড় বসানো কঠিন। তারাপদ বলছিল সতীঘাট যাবার বাঁদিকে বাগদি পাড়ায় কে একজন ভাল বসাতে পারে -আমি জানিনা। আমার এমন কাজের তাড়া। গেলে তিনদিন লাগে - যাওয়া আসা ১দিন থাকা। পরে দেখব। তোরা দেখাশুনা করে। ডাক্তার যা বলেন খাওয়া। সেরে যাবে। আশাকরি ছেলেদের অবস্থা এখন ভালো। এখানে আবার সাধনের মা চোখ দেখাতে আসবে।" 'ইতি রা'



এই চিঠির দেড়মাস পরে তিনি আবার লিখলেন — "তোর চিঠি পেলেম। ২/১ দিনের জন্য চলে আয়। মায়ের হাত 'ম্যাগসাল্ট' জলে ভিজাতে হবে। ডাক্তার যা বলে করিস।" 'ইতি রা'

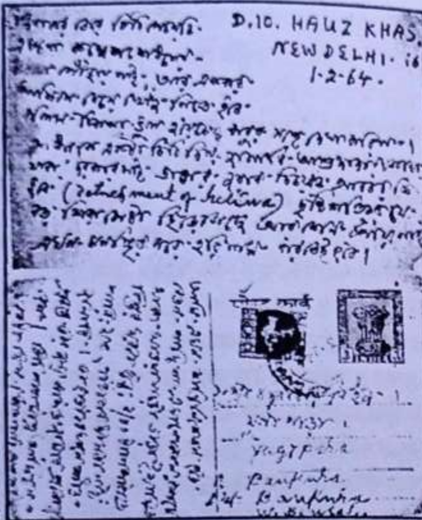


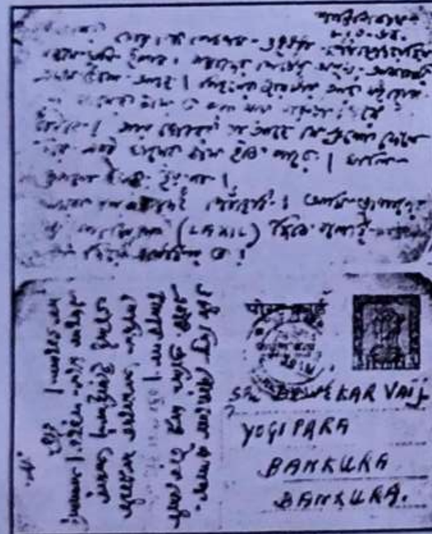
এখানে উল্লেখ্য তারিখ অনুযায়ী রামকিঙ্করের মা বেঁচে ছিলেন না। তিনি ভাইপোর মাকেই — ওই ভাবে 'মায়ের হাত' লিখেছেন।

১. ২. ৬৪ তারিখে যখন নিউ দিল্লীতে যক্ষ যক্ষীর কাজে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময়ের একটি



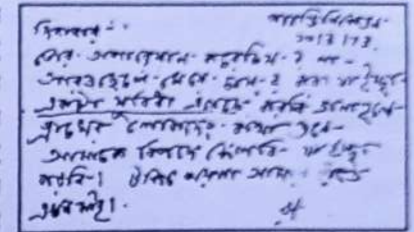
চিঠি দিল্লী থেকে পাঠানো। "দিবাকর তোর চিঠি পেয়েছি। এখনো কম্পেনশেষনের টাকা পৌঁছায় নাই। আর একবার অফিসে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে। বলিস্ ঠিকানা ভুল হয়েচে। বাবুর সঙ্গে দেখা করিস। সাধনকে একটা চিঠি দিস। জানাবি আশুদাদার কোথাও যাবার দরকার নাই। ডাক্তার জবাব দিয়েচে আবার কি হবে। আমি এখন শান্তিনিকেতন হতে বেতন পাচ্চি না। এখানে কোন রকমে থাকা খাওয়া গাড়ি ভাড়া ইত্যাদিতে বিস্তর খরচা হচ্চে। ২/১০ টাকা পাঠাতে পারি। ২০০ পাঠাবার ক্ষমতা নাই জানবি। তাছাড়া এখানে শীত প্রচণ্ড। তারজন্য কাপড় জামার প্রয়োজন বেশ। চিঠি পাবা মাত্র অফিসে খবরটা দিস্। আশাকরি সব ভাল।" আর একটি চিঠিতে তিনি কিছু ওষুধের পরামর্শ দিচ্ছেন। লিখেছেন — "দিবাকর তোর চিঠি পেলাম। ওষুধটা পৌঁছে দিয়েচিস্ জেনে খুশি হলাম। বাচ্চাদের পেটের অসুখ আশাকরি এখন ভাল আছে। পিছনের জায়গাটায় আর যা হোক একটু ঘাসের চাষ করা যায় গরুটা খেয়ে বাঁচবে। সার গোবর যা আছে সেগুলো ফেলে দিয়ে একটু ঘাসের চাষ হতে পারে। খালি শুকনো খড়ে হয়না। আমরা নিরাপদেই পৌঁছেচি। আমি জুলাপের জন্য লাক্সিল (Laxil) দিতে বলেছিলাম। সেটা দিয়ে এসেছিস ত ? ওটা কিন্তু জোরালো জুলাপ। একটি গুলি মাত্র তার বেশী চলবে না। ভর্তী পেটে রাত্রে খেতে হয়। সেদিন আমাদের যাত্রাটা ভালই হয়েছিল। আমার এখনো মনে পড়চে। আশাকরি সব ভালো।" 'ইতি রা'


D.10. HAUZ KHAS,
NEW DELHI-16
1-2-64.


(LAXIL)
YOGI PARA
BANKURA
BANKURA.



বেশ মনে পড়ে বাবার হার্নিয়া অপারেশনের কথা। দাদুকে জানানো হয়েছিল। তিনি এই সুযোগে আরেকটি অপারেশন এর সাথে করে নেওয়ার উপদেশ করেছেন। তা হল ভ্যাসেকটমি। ১০. ৩. ৭৩ তারিখে সেই নির্দেশেই তাঁর চিঠি — 'দিবাকর, তোর অপারেশন করেছিস ? না আরও ছেলে মেয়ে চাস ? কর যা ইচ্ছা। একটা সুবিধা এসেছে করবি তা না হলে গ্রামের লোকেদের কথা শুনে আমাকে বিপদে ফেলবি। যা ইচ্ছা করবি। টাকা পয়সা আমার হাতে এখন নাই।" 'রা'




Bankura
Bankura.

কিন্তু বাবা দাদুর নির্দেশ পালন করেন নাই। যদিও চিঠিতে নির্দেশ পালন করার কথাই লিখেছিলেন তিনি। তাঁর উত্তরে দাদু লিখলেন — দিবাকর, তোর চিঠি পেলাম। আমি খুব খুশি হলেম। এখন ভালভাবে থাকতে হবে। পায়চারী করতে হবে একটু করে। যদি কোন গোলমাল হয় ডাক্তারের পরামর্শ নিস। একজনের গোলমাল হয়েছিল —পরে ওষুধের দ্বারায় ভাল আছে। এখন কথা হচ্চে সাধন, সাধনের ভগিনীপতি আমাকে টাকা টাকা করে বিরক্ত করচে। আমি এখানে ছিলাম না। আবার যাচ্ছি। কখন আসছি কোন ঠিক নাই। ওরা এখানে যেন না আসে। দেখা হবে না। আশাকরি ছেলেরা সব ভালো আছে। নীম পাতার সত্ত্বা খাওয়াবি।" 'ইতি রা'

কাঠের মিস্ত্রী ভাইপো দিবাকরের সাংসারিক অবস্থা কখনোই ভালো নয়। এছাড়া তাঁর হৃদয় ঘটিত সমস্যাও ছিল। তাই ধানজমি বিক্রী বা বসতবাটী লাগোয়া জায়গা বিক্রির কথা ভাবতে হয় তাঁকে। কিন্তু সে ব্যাপারে দাদুরও যে সম্মতি চাই। তাই তাঁকে চিঠি লেখা হলে তিনি জানালেন, "দিবাকর আগেও লেখেচি আবারও লেখলেম সেই — জায়গার ব্যবস্থা তোরই উপরে আচে — যা ইচ্ছা সেটা করবি। আমি যাই আর না যাই। ২/১ দিনের মধ্যেই স্ট্যাম্প দিয়ে পাঠাচ্ছি। আমার

অবস্থা এখন খারাপ, টাকা নাই জানবি। নিজের ব্যবস্থা নিজে করতে হবে।" 'ইতি রা'

পরে ঐ মাসেই ১৭. ২. ৭৩ তারিখে কিছু ভেবে নিয়ে তিনি লিখলেন - যা তাঁর বসতবাটী লাগোয়া জায়গাটির প্রতি মমতারই প্রকাশ। তিনি লিখলেন, "দিবাকর, ভেবে দেখছি, এখন জায়গাটা দেব কিনা। যদি কোন টাকা ইতিমধ্যে পাই তাহলে বিক্রি করব না। দরটা জেনে রাখবি।" 'রা'

একবার ১১. ৮. ৭৩ তারিখে তিনি বাবার কোন পত্রের উত্তরে লিখেছেন — 'টাকা পাঠানো সম্ভব নয়। জমিটার ব্যাপারে, বন্ধক - ৭৫৫ যদি হয় ? আমার দর ২৫০০ আড়াই হাজার হচ্চে। যদি সম্ভব হয়, হলে রাজি আছি। মনে রাখবে (বিক্রী) ১০০০ হাজার করতে করতে তোর সব উড়ে যাবে। আমাদের অবস্থা খারাপ জানবে। পরে জানাব। চারদিক হতে টাকা চাচ্চে। আমি তাবড় লোক ? চাসবাস হচ্চে। বিক্রী করে দে সেটাই ভালো। চাস হচ্চে কি ?" 'রা'

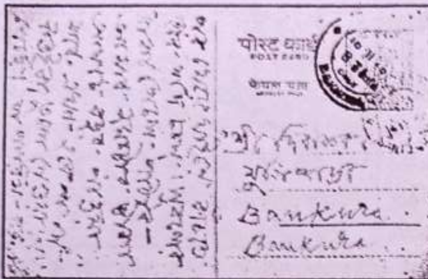
এপরের চিঠিতে তিনি বসতবাটীর লাগোয়া ফাঁকা জায়গাটির পরিবর্ত্তে ধানজমি বিক্রির কথা বলেছেন কেননা বসতবাটীর বাড়তি জমিটি বিক্রি তাঁর কাছে এক হৃদয়বিদারক ব্যাপার। তাই তিনি লিখলেন — "চিঠি পেয়েচি। ৫০টাকা শিবুর জন্য পাঠাব। ১৬ তারিখের এধারে হবে না। পেনসনের টাকার ব্যাপার আলাদা। একজন ছেলেকে পড়াতে পারবি না? জমি যদি বিক্রী করতে হয়, বসতবাটীটা নয়, ধানজমিটাই করবি। আমার হাতে কোন টাকা এলে পর বাড়ীর কথা ভাবব, এখনত কেউ কেড়ে নিচ্ছে না। পড়ে থাক। এখানের ব্যাপার অন্য। তুই এখানের কথাটার কোন কথাটা বুঝলি না। বড় বাড়ীর কথা, অনেক কাজ - দরজা জানালা ...আলমারী টেবিল চেয়ার —অনেক

ব্যাপার। ভয় পেয়ে গেছিস না ? ভাল। অনেক লোক আছে।" 'ইতি রামকিঙ্কর'

চিঠির শেষাংশে দাদু —শান্তিনিকেতনে থেকে কোনো একটি কাজ ধরার কথা বলছেন — যেখানে অনেক কাজ আছে। কিন্তু বাবা তাতে রাজী না হওয়ায় এই চিঠি। ২. ১. ৭৪ তারিখে চিঠির উত্তরে তিনি আবারও জমি বিক্রির কথাই লিখেলেন। এখানে উল্লেখ্য — ধান জমিগুলো যে চাষ করতো তার নাম রসময়। শুনতাম ঠিকমত উৎপাদিত ধান সে দিত না। তাই ওগুলো বিক্রির পরিকল্পনা বাবার এই দুঃখের দিনে। তিনি লিখলেন — "চিঠি পেলেম। দলিলটা তোকেই আনতে হবে। সুবলের দ্বারায় হবে না। এখানে এলে বলব। পয়সা যোগাড় করেই চলে আয়, ফিরে দেব। তোর আর্থিক অবস্থা কবে ভাল ? জমিটা বিক্রয় করার কথাত বলাই আছে। আমার সাধ্য নাই - -পাকা কথা বলছি। রসময় দুবস্তা দিচ্ছে ভালই, নিয়েনে। ২দিন চলবে ত। ১/২ দিনের জন্য আসতে বলচি। আমার অবস্থাও খারাপ। দেখবি আমার চাকুরি বাকুরি ত নাই। জমানো পয়সা ছাড়া আর কি আছে।" 'ইতি রা'

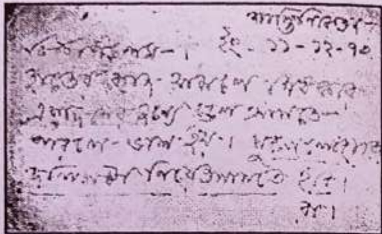
এই চিঠির প্রায় দেড় মাস আগে ১৪. ১১. ৭৩ তারিখে একটি চিঠি তিনি পাঠান তাতে লেখা ঃ 'যা টাকা ছিল সেটাই তুলে আমার খাবার জন্য একটু জমি করলাম। তার কি হয় সেটা বোঝা যাবে পৌষ মাঘে। তোদেরও পেয়ে যাবি দেখ কি হয়। সুবলের টাকাটা পেলে কাজ হত, তাও পাচ্ছি না, মহামুস্কিল চলচে। আমার খরচ সেটা বন্ধ করতেই হবে কেন ? অভাবের জন্য ? সুবলকে তাগাদা দিয়ে চলেচি, ফল হচ্চে না। তোদের ধানগুলো পেলে পর খেয়ে খাইয়ে বাঁচতে হবে যদি চাস। সুবলের টাকা পেলে



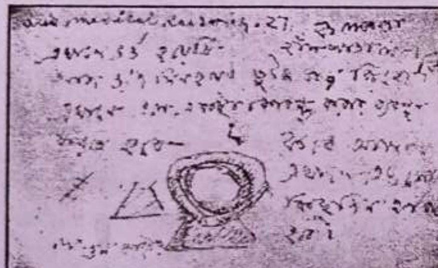


পাঠাবো। আমার জমিটার টাকা আসচে বছর পাওয়া যাবে। সে কতই বা। তুলে নেওয়া হয়ে গেচে। যা পারিস কর।"
'রা'

এরপর ১১. ১২. ৭৩ তারিখে ছোট্ট চিঠি। লিখেছেন — "চিঠি পেলেম। হাতের কাজ থাকলে শেষ করে একদিনের জন্য চলে আসতে পারলে ভাল হয়। সুবল লোহারের দলিলটা নিয়ে আসতে হবে।" 'রা'



সত্তর সালের পাঁচের মাসে তিনি অসুস্থ হয়ে কলকাতা ২৭এ কোন একটি হাসপাতালে ভর্ত্তি ছিলেন। সেই সময়কার দুটি তারিখ বিহীন চিঠি। তবে পোষ্ট অফিসের স্ট্যাম্প দেখে জানা যায় সে দুটি যথাক্রমে ৬. ৫. ৭০ ও ২২. ৫. ৭০ তারিখে পাঠানো। চিঠি দুটি খুব কাঁপা হাতে লেখা, কষ্টে লেখা অসুস্থতার জন্য। পায়খানা বসার জন্য দুটি কোমড বানানোর ফরমাস দিচ্ছেন। তিনি কাঠ মিস্ত্রি ভাইপোকে লিখেছেন - এখানে ভর্ত্তি হয়েচি আজ ৬/৭ দিন হল। তুই কোমড করেছিস কি ? এখানে এলে একটা কোমড করার ব্যবস্থা করতে হবে। কবে এসেছিস ? এখানে এখনো কিছুদিন থাকতে হবে। সকলকে আমার খবর দিস" 'রা'। এখানে উল্লেখ্য যে ঐ চিঠিতে তিনি একটি কোমডের ছবিও এঁকে দিয়েছেন - যার তলায় লেখা 'সেগুন কাঠের'।

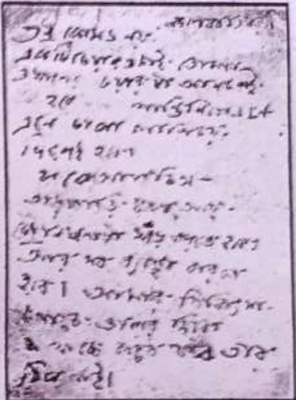




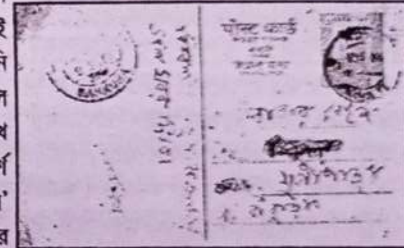
পরের চিঠিতে লিখেছেন — "শুধু কোমড নয়। একটি চেয়ারও চাই। তোমার ওখানের চেয়ারটা আনলেই হবে। শান্তিনিকেতনে এনে চাকা লাগিয়ে দিলেই হবে। কবে আসছিস ? তাড়াতাড়ি চলে আয়। কোমডটা খাড়া



করতে হবে। আর সব ব্যবস্থা করতে হবে। আমার চিকিৎসা চলছে, ভালর দিকে যাচ্ছে। কবে ফিরব তার ঠিক নাই। বিশ্বনাথ অতুলকে আমার - খবর দিবি।"
'রামকিঙ্কর'



এখানে দাদুর বাস্তব বুদ্ধির অভাব লক্ষ্য করা যায় এই চিঠিতে। কারণ বাঁকুড়ার বাড়ি থেকে একটি চেয়ার বয়ে নিয়ে সেখানে তাতে চাকা লাগানোর কথা তাঁর মূলতঃ অবোধ বালকের মত। অথচ শিল্পের ক্ষেত্রে যেখানে তিনি ছিলেন অন্য মানুষ বুদ্ধির চূড়ান্ত চূড়ায় যার অবস্থান। তাঁর এই সমস্ত চিঠিপত্রে বাঁকুড়ার আত্মীয়দের প্রতি একটা প্রবল মমতা ও কর্তব্যবোধের পরিচয় পাইআমরা। দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে তিনি সর্বক্ষণ যে মনে রেখেছিলেন তা তাঁর প্রত্যেক চিঠিতেই তাঁদের উল্লেখ থেকে বোঝা যায়। এমনি চিঠিতে যোগাযোগ সঙ্গীতার্য রাজেন্দ্রলাল দত্তের সঙ্গেও। সাধারণ শারীরিক অসুখ বিসুখে তাঁর যে আয়ুর্বেদিক পরামর্শ 'detouchment of Retina'এবং 'ম্যাগসাল্প' ইত্যাদি কথাগুলি পাই তা থেকে তাঁর চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারেও যে একটা অনুসন্ধিৎসা ছিল - তা বোঝা যায়। তো এসবই বলাবাহুল্য বাউলমনের অধিকারী -– নির্লিপ্ত উদাসীন রামকিঙ্করের অন্য এক পরিচয় - যা আমাদের চমকিত করে। অন্য ভাবে ভাবায়। শুধুমাত্র শিল্পের জন্যই শিল্প গড়ায় নিমগ্ন ত্যাগী মানুষটাকে যেন অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ হয়ে যায় আমাদের কাছে। আমরা আরেকবার বিস্মিত হই। □





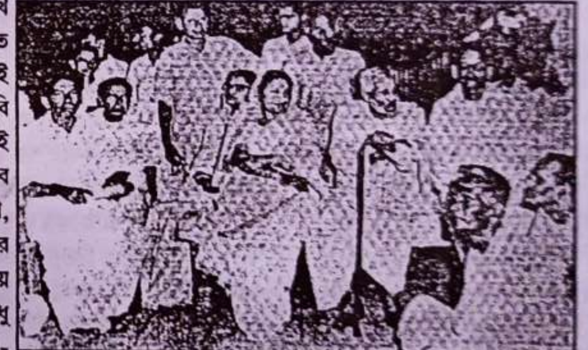
রামকিঙ্কর নিজের চোখে

রসিক রামকিঙ্কর

"যাঁরা গম্ভীর বিষয় নিয়ে ঐকান্তিক গবেষণা করেন। তাঁরা প্রায় সময়েই চটুল রহস্যও করতে পারেন। কারণ রহস্য প্রাণশক্তিরই একরকমের প্রকাশ।" বলেছেন — শিল্পী বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর 'চিত্রকর' প্রবন্ধে। তিনি 'চিত্রকথা' গ্রন্থের নন্দলাল পরিচ্ছদে লিখেছেন — 'ছাত্রকে পোষ্টকার্ড পাঠিয়েছেন তাতে একজোড়া তোপসে মাছ! চিঠিতে লেখা আছে 'এখানে মাঝে মাঝে ডিমভরা তোপসে পাওয়া যাচ্ছে। এই ছবি ও লেখা শিল্পীর কৌতুক প্রিয়তারও ইঙ্গিত দেয়। এরকম চাপা কৌতুক তাঁর অনেক স্কেচে আমরা পাই।' রামকিঙ্কর বলেছিলেন যে মাষ্টারমশাই নন্দলাল খেজুর গাছের মতন। ভেতরটা রসে ভরা। তো এই রঙ্গপ্রিয়তা যে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামীজী বা রবীন্দ্রনাথেও কম ছিলনা, তা আমাদের অজানা নয়। তাই শিল্পকলার প্রতিটি পল অনুপলকে প্রবল আলিঙ্গনে সারাজীবন যিনি আঁকড়ে ধরে ছিলেন সেই রামকিঙ্করও যে বিশেষ রসিক প্রবন হবেন তাতে আর আশ্চর্য্যের কী আছে। এখানে তাঁর কয়েকটি রঙ্গরসিকতার উল্লেখ করে আমরা সেই বিরাট শিল্পীর বিচিত্র চরিত্রের এই দিকটিতেও আলোকপাত করে দেখতে পারি - যেখানে তিনি একজন রসিক মানুষ।

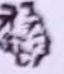

ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক রামকিঙ্করকে দেশিকোত্তম পুরস্কার প্রদান

শিল্পী শর্বরী রায়চৌধুরী বলেছেন — "কিঙ্করদা অনেক মজার মজার কথা বলতে ভালবাসতেন।" অথচ সততই অন্তর্মুখী ও নিঃসঙ্গ প্রিয় মানষিকতার কারণে অধিকাংশের কাছেই অপরিচিত রয়ে গেছে তাঁর চরিত্রের এই মধুর দিকটি যেখানে ফল্গুধারার মত এতটাই রসের প্রবাহ ছিল যে শেষ বয়সে অসুস্থ থাকাকালীনও তিনি কৌতুক করেছেন। কৌতুক করেছেন — ডাক্তারের প্রেসক্রাইব করা একগাদা ঔষধ বিষয়ে। যা কাগজে মোড়া বেশ কপাতা ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, বেটে লম্বা শিশিতে-সিরাপ, টনিক এটা সেটা। সেগুলো দেখিয়ে সহাস্যে তিনি বলছেন — "একেবারে ভোজ।" ওষুধে তার একান্তই অনীহা ছিল যে। খুব অসহ্য না হলে খেতে চাইতেন না তা। তো একবার ঘাড়ের ব্যথায় অনেক কষ্ট পেয়ে ইদানিং ভালো আছেন। বলছেন —(আজ) "খুব ভালো। বোধহয় ভয় পেয়ে ভেগেছে। হাঃ হাঃ হাঃ। যমদূত হে যমদূত। ঘাড়ে ধরেছিল কেমন বলো দেখি। অন্য আরেকটি কথা যদিও রসিকতা নয় তবুও তাঁর রসিক মানসিকতার রঙ লেগেছে তাতে। বলছেন — 'আমি খাবো তোমার কি ?' বিষয়টি হচ্ছে - ডাক্তারবাবু বলে গেলেন যে বিড়ি-সিগারেট খাবেন না একদম। তো ডাক্তারের বিদায় ক্ষণেই তিনি যে এতক্ষণ সুবোধ বালকটির মতন চুপটি ছিলেন এবার মুখ খুলেছেন — "বিড়ি সিগারেট ও দু-একটা খেলে আর কী হবে। ও বাবা ছাড়া মুস্কিল। ডাক্তাররা ওরকম বলে। ঐ রকম বলতে হয় ওদের। দেখো ঐ - জ্বালাতেই বিয়ে-থা করেনা কেউ কেউ। এটা খেয়োনা, ওটা খেয়োনা। 'আমি খাবো তোমার কী ?" তাঁর এই কথাগুলিতে আত্মপক্ষ সমর্থনের ভঙ্গীতে আমাদের হাসির উদ্রেক করে তবে বেশি রসাত্মক লাগে তাঁর বক্তব্যের শেষ লাইনটিতে। একবার তাঁকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হল। কিন্তু তিনি লুকিয়ে বাড়ি চলে এলেন, যা তাঁর বরাবরের অভ্যেস। সেখানে তাঁর ব্যবহৃত মরচে পড়া টিনের কৌটের (বিড়ি রাখার পাত্র) বদলে কোম্পানীর নাম লেখা ওষুদের খালি টিন ও চা খাওয়ার নতুন পেয়ালা দেওয়া হয়, যা পেতে তাঁর সে কী আহ্লাদ। তিনি সেসব দেখিয়ে রসিকতা শুরু করেছেন — বলছেন, 'বিড়ির পাত্রটা কেমন নতুন চেহারা নিয়ে ফিরেছে দেখেছো ?' তারপর যখন উক্ত নতুন ঝকঝকে পেয়ালার চা এল, —তিনি একগাল হেসে বললেন "মাঝে মাঝে হাসপাতালে বেড়াতে গেলে বেশ লাভ হয় হে। হাঃ হাঃ। অথচ লাভ বলে মনে করতেন না তিনি তাঁর জীবনের বিরাট বিরাট প্রাপ্তিতেও। কেননা তিনি অনন্য। বস্তুত মানুষের চেয়ে অনেকটাই উপরে চলে গিয়েছিলেন বলে তাঁর কাজের ব্যাপারে কারো নিন্দা-মন্দা বা সমালোচনায় কান দিতেন না তেমন। তবু কখনো কখনো মাত্রাতিরিক্ত সোরগোল হলে কিঞ্চিত দুঃখ তো পেতেন। এমনি একদিন একজন আর্টক্রিটিক-এর পাল্লায় পড়ে কিছুক্ষণের জন্য বিপর্যস্ত রামকিঙ্কর তাঁর বিদায় মুহূর্তেই জানাচ্ছেন — "ঝড় বইয়ে দিয়ে গেলো হে তোমাদের ঐ আর্টক্রিটিক। আর ইংরেজীর তোড় দেখেছো ? খুব সুবিধে হয়, বুঝলে ? যদি মুখে একবার খই ফোটাতে পারো তো আর কথাই নেই। এগিয়ে যাবে ছবি বোঝো আর নাই বোঝো। আমাদের সব ব্যাপারেই তাই।" হ্যাঁ, আমাদের সব ব্যাপারে ভড়ং-টাই বেশি। যা নয় তাই সাজতে চায়। শুধু সাজতেই আনন্দ অধিকাংশের। তাই গাঢ় জীবনের অস্তিত্বই যেন আজ খুঁজে পাওয়া ভার। তাই যখন কোনো সাজা ভদ্দরলোককে বিশ্বাস করে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে যাই তখন মনে পড়ে যায় তাঁর ঈষৎ কৌতুক মিশ্রিত আরেক বেদনার সুর। "দেখো ভদ্দরলোকদের অনেক সময় ঠিক বুঝিনা। বুঝতে পারিও না। ওখানে সুর বড় কম। ভিতর বার এক না হলে খুব মুস্কিল হে। কিছুতেই চেনা যায় না। না চিনলে কি


বাঁকুড়া কংগ্রেস কর্তৃক সংবর্দ্ধনার অনুষ্ঠানে রামকিঙ্কর



ভাব জমে ? ঐ দূরে দূরেই ভালো — কেমন আছেন — ভালো আছেন। অনেকে আলাপ করতে আসে ঢং ঢাং দেখি। বেসুর ধরা পড়ে। তারপর আবার কী থাকে জানো ? ভড়ং যা নয় তাই সাজতে চায়। কেউ পণ্ডিত সাজে। কেউ কবি আর্টিস্ট। কেউ ভালো মানুষ। কেউ দাতা কর্ণ, যাত্রা দলের সং সব। মনে মনে হেসে মরি। মুখে চুপ করে থাকি। তারপর অবার ধান্ধা থাকলে তো কথাই নেই। চলে গেলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। যেন বন্ধ ঘরের জানলা দরজা সব খুলে গেলো - খোলা হাওয়া ঢুকলো — প্রাণটা জুড়লো হে।" তবু জীবনের চলার পথে মানুষকে তো বিশ্বাস করতেই হয়। যদিও ক্রমাগত ঠকতে ঠকতে একসময় চোখের সে উজ্জ্বলতা আর থাকে না। ভয় হয় এই বুঝি আরেক ধান্ধাবাজের হাতে পড়ে গেলাম। সারাজীবন নিরবিচ্ছিন্ন নিপীড়ন ও প্রতারণার শিকার রামকিঙ্করের মানসিক পরিকাঠামো ক্রমশঃ পাল্টে গিয়েছিল। তিনি একটু সেয়ানা হয়েছিলেন। তাই যখন শিল্প সমালোচক ধরণের কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন শিল্পী (রামকিঙ্কর) কোথায় ? তিনি বলেন — "শিল্পী তো এখন নেই, একটু বাইরে গেছেন বোধহয়। তো, যিনি শিল্পী রামকিঙ্করকে খুঁজছেন, বললেন — "একটু আলাপ করতে চাই।" ঘটনাটি হল লণ্ডনপ্রাবসী জনৈক ব্যক্তি যিনি বিশ্বভারতী কলাভবনে এসেছেন শিল্পী রামকিঙ্করের ছবির একজিবিশন দেখতে। রামকিঙ্কর তাঁকে ঐ কথা বলেছেন এই ভেবে যে উনি হয়ত আর্টক্রিটিক এবং 'কে জানে ভালো লেগেছে না মন্দ লেগেছে।' তো উক্ত ভদ্রলোক বারে বারে চশমা খুলে কাগজ নাকে ঠেকিয়ে ক্যাটালগ দেখে আর দু-পা পিছিয়ে গিয়ে ছবি পরখ করে। শেষে বলে ঠিক আছে একটু ঘুরে আসছি।" রামকিঙ্কর তাঁর জীবন সায়াহ্নে স্মৃতি চারণ করে চলেছেন — সৌম্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এসব। তো এই বলে বেরিয়ে গেলেন তিনি। খানিক বাদে আবার এসে হাজির 'এসেছেন ?' প্রশ্ন করতেই — হ্যাঁ, এসে তো ছিলেন কিন্তু এইমাত্র বেরিয়ে গেছেন। রামকিঙ্কর এরপর বর্ণনা করেছেন যে, "ভদ্রলোক বিমর্ষ। তারপর আমি নিজের মনে ঘুরছি। ছেলেমেয়েদের ভিড় এড়িয়ে। এমন সময় কাছে এসে হঠাৎ বললেন — মিস্টার বাইজ, এইবার বোধহয় এসে গেছেন শিল্পী। আমি তো মহা অপ্রস্তুত।" এইসব স্মৃতি কথার পর রামকিঙ্করের মুখে ছিল কৌতুকের হাসি। কিন্তু সেতো শুধু নির্ভেজাল হাসিই ছিলনা। আজ আমরা জানি সে হাসিতে ছিল বিস্তর লাঞ্ছনা, অবমাননা ও নিপীড়নের কথাও। আজকের এই বিশ্ববরেণ্য রামকিঙ্কর জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ বিসর্জন দিয়ে শিল্পভাবনার গভীরে নিমগ্ন থেকে যে অমৃত তুলে এনে দেশকে আজ বিশ্বের দরবারে এক বিশেষ সম্মানের আসনে বসিয়ে গেলেন বিপরীতে তিনি কিন্তু পেলেন শুধু উপেক্ষা আর অপমান। অভিজাত ভারতবর্ষ তাকে গুরুত্ব দিতে যেন এখনও তেমন স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারছে না। আর তাই তিনি সরে গিয়েছিলেন ভদ্দরলোকদের থেকে দূরে-বহুদূরে। প্রত্যন্ত সাঁওতাল পল্লীর খেটে খাওয়া মানুষেরাই হয়ে উঠেছিল তাঁর আপনজন। তবু মানসিক দিক দিয়ে অতিসংবেদনশীল রামকিঙ্করকে অভিজাতদের ঐ উপেক্ষা দগ্ধ করেছিল, ক্ষতবিক্ষত করেছিল। আর তাই যখন তাঁকে ভারত সরকার পদ্মভূষণ উপাধি দিল তিনি পরম অভিমান ভরে ও সকৌতুক উচ্ছলতায় বলেছেন, হৃষিকেশবাবু আজ সন্ধ্যায় একটা মজার খবর এসেছে। তার পেলাম ভারতসরকার আমাকে কি একটা পদ্ম-টদ্ম



দিয়ে দিল। ও দিয়ে কি হবে ? অন্য কাউকে দিয়ে দিলেই তো হোত। বলাবাহুল্য যখন তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হয় — তখন তিনি প্রায় অনাহারে রতনপল্লীর জীর্ণ কুটিরে কোনরকম বেঁচে মরে দিন কাটাচ্ছিলেন। কেউ তাঁর খোঁজ রাখেনি। কেউ কেউ অবশ্য তাঁর ছবি হাতানোর ধান্ধায় এসেছে। এইভাবে বহু ছবি লুঠও হয়ে গেছে। আর তিনি টিনের থালায় কলাই করা বাটিতে অতি সাধারণ খাবার খেয়ে দিন কাটিয়েছেন, যা আমরা রবি পালের 'অনন্য রামকিঙ্কর' গ্রন্থের এক আলোকচিত্রে দেখতে পাই। তবে সে দৃশ্য দেখার দূর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য এই লেখকেরও হয়েছে। তো তাই তিনি ওইরকম আরেকটি সম্মান প্রদর্শনের অনুষ্ঠানে টেবিলে রাখা তারজন্য কিছু ফলমূলের উপহারের দিকে আঙ্গুল তুলে কৌতুক করেছিলেন, "বাঃ বেশ খাওয়া যাবে।" এসমস্ত আচরণ তাঁর সাধারণ মানুষের কাছে পাগলামি। কিন্তু যাঁরা তাকে চিনতেন তাঁরা বুঝতেন সে সান্ধ্যভাষা। এখানে আরও কয়েকটি তাঁর হাল্কা রসিকতার উল্লেখ করা যায়। যেমন — 'ধরো আজ আমার বেড়ালের বিয়ে।' কিম্বা — 'খিদে পাচ্ছে হে খুব। হাউ মাউ লাগিয়ে দিয়েছি সাতসকালে। রাধারাণী গেছে ঘাবড়ে।" এই রসিকতাটি চিকিৎসায় কিছুটা সুফল পাওয়াতে ও খিদে বেড়ে যাওয়ায়। তো তিনি বলছেন — 'চা আর কী সব দিয়েছিল। সব সাবাড়।' একবার নন্দলাল রামকিঙ্করের প্রসঙ্গে কারোকে বলেছিলেন, "ও হচ্ছে পাঁকা বাঁশ।" এই কথাটিকে নিয়েও তিনি কৌতুক করেছেন — যেখানে রয়েছে তাঁর হেঁয়ালি বা সান্ধ্যভাষা। শান্তিনিকেতন পরিমণ্ডলে ব্রাত্য ফলত দুর্বল ছিলেন রামকিঙ্কর। তাই তিনি পরিহাস করেছেন "ভাগ্যিস কারু পিঠে পড়িনি। তাহলে বাবা বংশ একেবারে ধ্বংস।" অবশ্য কারো পিঠে পড়ার বদলে আমরা জানি যে তাঁর পিঠেই পড়েছে এক দাম্ভিক লাঠি। খেয়ো খেয়ির জগৎ তাকে ছেড়ে কথা বলেনি কখনও। এ প্রসঙ্গে স্মরণে এসে যায় আরেকটি নাম। যেনামেও রয়েছে আশ্চর্য রকমভাবে একটি যুক্তাক্ষরসহ মোট পাঁচটি অক্ষর এবং শেষাংশে 'কর' — এই ধ্বনি। তিনি আম্বেদকর। এখানেও ছিল রামকিঙ্করের মত লাঞ্ছনা ও তার সাথে লড়াই এর এক উথাল পাথাল অধ্যায়। রামকিঙ্কর খেয়োখেয়ির জগতের দিকে দৃকপাত না করে বরং ডুবে গিয়েছিলেন শাড়ির আঁচল ওড়ানোর ভাবনায়। ঠিক কি উপায়ে তাকে ওড়ানো যায়। কারণ ঐ আঁচল ওড়ানো যে চাট্টিখানি ব্যাপার নয় কংক্রিটে। তাই তাঁর সরস উক্তি, "তুমি তো দেখছো পতপত করে উড়ছে শাড়ির আঁচল। বেশ হালকা মেজাজেই দেখছো। আর আমি ওই ক'মনি ওজনের আঁচলের ভাঁজে চাপা পড়ে গেছি। ওকে উড়িয়ে রাখি কি করে ? ওর মধ্যে লোহা আছে, আর কংক্রিট আছে কতখানি ভাবো দেখি। ওকে উড়িয়ে রাখা মুস্কিল হে। ছবিতে বাবা এসব সমস্যা নেই। শাড়ি শুদ্ধ আকাশে গন্ধর্ব কন্যাকেই উড়িয়ে দিতে পারো এক তুলির টানে। ...মেয়েদের আঁচল নিয়ে আমি একেবারে নাস্তানাবুদ। হাঃ হাঃ।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি অবশ্য আঁচল উড়িয়েছেন। এবং তা পত পত করেই উড়ছে। আঁচল দিয়ে উড়িয়েছেন চারপাশ থেকে তাঁর দিকে ধেয়ে আসা লাগাতার বিষবাষ্পকেও। এখন সেসব আর দাঁড়াতেই পারছেনা যে সেখানে। আর তাই তিনি বিজয়ীর হাসিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে আজও শান্তিনিকেতনের পথের পাশে হেঁটে চলেছেন। সে হাসিতে রয়েছে মহাকাল বিজয়ের উল্লাসও। □

ব্যথিত রামকিঙ্কর

অনেকটা ঈশ্বরের মতই ছিলেন রামকিঙ্কর। যিনি গড়তেন পরম ধীশক্তি দিয়ে শারিরীক ও মানসিক কষ্টকে উপেক্ষা করে, পরম মমতায় দিন ও রাতকে একাকার করে দিয়ে। আবার নিজের কাছে তা অপছন্দের হলে হাজার চোখের কাছেও সেই অপরূপ সৃষ্টিকে নির্মমভাবে ভেঙে ফেলতে দ্বিধা করতেন না। কিন্তু তাতেও স্বস্তি ছিলনা তাঁর — একেবারে গুঁড়িয়ে মাটির নিচে কবরস্থ না করা পর্যন্ত। তিনি বুঝেছিলেন, "কাজের জগতে তো মাঝামাঝি কিছু নেই। হয় হলো, নয় হলো না।" কিন্তু যে সৃষ্টি তাঁর মনোমত হয়ে উঠত তাঁর দিকেও তো আর ফিরে তাকাতেন না। আরেক নতুন কিছু রচনার উন্মত্ত আহ্বানের প্রতি সাড়া দিয়ে ছুটে যেতেন। প্রচণ্ড আবেগ ও উচ্ছ্বাসের শেষ সীমা মাড়িয়ে তিনি জন্ম দিয়ে গেছেন একে পর এক মৌলিকত্বের নতুন ভাষা — তার স্থায়িত্বের কথা মাথায় না রেখেই। আসলে সেসব ভাবতে গেলে ইনট্যুইশান যে ভেঙে যায়। যে পাখি ধরা দিতে চায় অবচেতনের সীমা ভেঙে চেতনের দোরগোড়ায় এসে তা যে হাতছাড়া হয়। ঐ কাজেই তার আনন্দ — মনেপ্রাণে বুঝেছিলেন সেকথা। সেই আনন্দই হল যে আসল প্রাপ্তি বড় পুরস্কার। কে বাহবা দিল কি নিন্দে করল তাতে কি-ই বা এসে যায়। 'এই আশ্রমটা তুই ভরিয়ে দিতে পারিস তোর কাজে ?' হ্যাঁ, পেরেছিলেন কিছুটা রামকিঙ্কর বহু বাধা সত্ত্বেও তাঁর সাধ্যে যতটা কুলিয়েছে। বিশ্বভারতীর সেই অভাবের দিনে মাষ্টারমশাই নন্দলাল সহ তাঁর পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন অনেকেই। নৈলে কি আর পারতেন করতে অত কাজ। তবুও যখন জীবন সায়াহ্নে এসে কষ্ট পেতে দেখি তাঁর না করতে পারা বহু কাজের জন্য, তখন কষ্ট হয় আমাদেরও। মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের কথা। তিনি কোন এক প্রসঙ্গে শিল্পী বিনোদ বিহারীকে বলেছিলেন, 'আর্টিষ্ট, কবি — আমাদের একই দশা। কেউ আমাদের দ্যাখেনা।' আর তাইতো কাজ করতে পারা দূরের কথা খোদ ফ্রান্সেও মদগ্লিয়ানির মতো শিল্পীকে প্যারিসের পথে পথে ঘুরতে হয়েছে দিনের পর দিন খিদের জ্বালায়। অথচ মরার পর ছবি নিয়ে কাড়াকাড়ি। আর ভ্যানগখেরও একটি ছবিও বিক্রি হয়নি তাঁর জীবৎকালে। তবুও আপাদ-মাথা শিল্পীরা তাঁদের ভিতরের তাগিদে কাজ করে যান এবং যাবেনও। কে প্রশংসা করল কি নিন্দে করল সেসব তোয়াক্কা না করেই সৃষ্টির উন্মাদানায় মেতে কাজ করে চলেন। রামকিঙ্কর এমনই এক কথা শুনিয়েছেন আমাদের। বলেছেন — "তবু দেখো এর মধ্যেই কাজ চলছে খেয়ে না খেয়ে, মান সম্মানের তোয়াক্কা না করে, কানে তুলো দিয়ে, পিঠে কুলো বেঁধে। যারা মরে ভূত হবার পর লোকে বাহবা দেবে মরার আগে তাঁরা এমনি ভাবেই কাজ করে চলবে।" আরও বলেছেন, "কে কী বললো না বলল, কী এসে যায় বলো। উপোষটুপোষও মনে থাকে না কাজের মধ্যে ঢুকে পড়লে। ওটা কেল্লা হে। কেউ ছুঁতে পারবে না তোমাকে ঐ কেল্লায় সেঁধিয়ে পড়তে যদি পারো।" কিন্তু তাঁর পরিকল্পিত বহু কাজই তিনি করতে পারেন নি। সম্ভব হয়ে ওঠেনি বহু বাধা ও অসহযোগিতাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে না পারায়। তবু বহু চেষ্টায় ও পরিশ্রমে অনবরত ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়ে যেগুলি নিজের পছন্দ



মাফিক খাড়া করতে পেরেছিলেন তার কোনটি যদি অন্যত্র সরানোর প্রয়োজনে তেমন সাবধানতা অবলম্বন না করায় ভেঙে যায় তখন সেই স্রষ্টার মনে নিদারুণ পুত্রশোকের বেদনা বাজে। তাঁর ছিন্নভিন্ন সৃষ্টির মতই তিনিও অদৃশ্য এক হাতুড়ির আঘাতে চৌচির হয়ে যান — সেকথা আর কজনই বা অনুভব করে। সেদিনের বহু বিতর্কিত 'ধানঝাড়া' ভাস্কর্যটি সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা অত্যন্ত মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক সে কথা। বলেছেন, "ভাঙলো ওটাকে। বিড়লার বাড়ি হবার সময়। শুনেছি, ঠিকাদারের লোক হাড়গোড় ভাঙা মূর্তিটা গোরুর গাড়ি নিয়ে সরিয়েছে। আমাকে কেউ জিজ্ঞেসও করল না। কেউ না, আমি আর যাইনি ওদিকে। আমার ছাত্র ওটা সারিয়ে সুরিয়ে বসিয়েছে পরে।" তো রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা মাফিক যিনি আশ্রমটা মূর্তি দিয়ে ভরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তার কোনটা বিসদৃশ জন্যই যদি সরানো হল — সে তাঁকে জিজ্ঞাসা না করেই ? কেন ? তাঁর আরেক ছাত্র শিল্পী দিনকর কৌশিক লিখেছেন, "মহিলা হোস্টেলকে বিস্তৃত করতে প্রয়োজনীয় জমির জন্য এই উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্যটিকে এর মূল জায়গা থেকে সরিয়ে শ্রীনিকেতন শ্রী পল্লীর সংযোগ রাস্তার কোণে পরে বসানো হয়েছে। স্থানান্তরিত করা কালীন এটি গুরুতর ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।" রামকিঙ্কর এক প্রগাঢ় বেদনা মাখা চিত্তে বলেছেন, " ও কাজটা জানো এক নাগাড়ে বহুদিন ধরে করেছিলাম। সারাদিন কাজ করতাম সকাল থেকে সন্ধে। ভালো লাগতো খুব। আলোটা ঘুরে যেত। এতে দেখার সুবিধে হয় নানা সময়ে। রামকিঙ্কর ছাত্র শ্রী সুষেন ঘোষ এটিকে সারিয়ে সুরিয়ে বসিয়েছেন পরে। কিন্তু সে সারানোয় কতটা রামকিঙ্কর পুনঃ স্থাপিত হতে পারে অবনীন্দ্রনাথের একটি বক্তব্য থেকে তা বোঝার চেষ্টা করা যাক। তিনি বলেছেন, "শিল্পী কি কঠিন প্রক্রিয়ায় রচনা করেছে তা তো রচনায় রেখে দেয়না, মুছে দিয়ে চলে যায় তার হিসেব, এবং এই কারণে ঠিক সেই কাজটি নকল করতে চাইলে আমরা ঠকে যাই, ঠেকে যাই। হদিশ পাইনে কি কি উপায়ে কোন পথ ধরে গিয়ে শিল্পী তার পরশমণি আবিষ্কার করে নিলে। সুতরাং বলতে হবে একজনের টেকনিক অন্যের অধিকারে কিছুতেই আসতে পারে না, সে চেষ্টা করাই ভুল। কেননা চেষ্টা কাজের উপরে আপনার সুস্পষ্ট ছাপ দিয়ে যায়। এবং আর্টিস্টের কাজে সেই ব্যর্থ চেষ্টার দুঃখটাই বর্তমান থেকে যায়। যে দেখে তাকে পর্যন্ত পীড়া দিতে থাকে।"

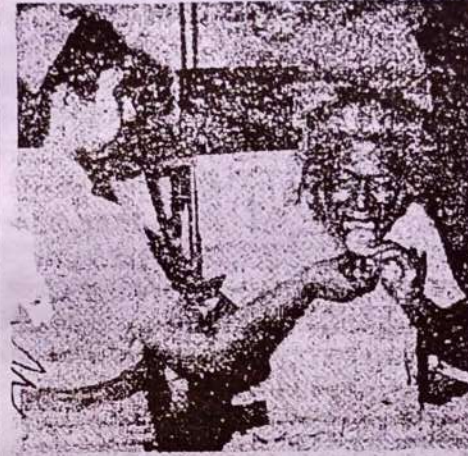
আসলে রামকিঙ্কর সেখানে ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই ব্রাত্য জন। হয়ত একাও। আর ফলতঃ তেমন মানুষের বেষ্টনী না থাকায় বেত্রাঘাতের মতও চরম লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছে তাঁকে। তো জগৎ সংসারের এই চিরকালীন রূপ যে ওই দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার তা দেখে অনেকে আগেই তিনি করেছিলেন একটি কাজ 'মাৎস্যন্যায়'। বস্তুত পৃথিবীর পরিস্থিতিটাই এই রকম। এখানে কেউ প্রভু আবার কেউ ভৃত্য। কেউ সৃষ্টি করে আবার কারোবা ধ্বংসের তাণ্ডবেই যত আনন্দ।

ক্ষতিগ্রস্থ ধানঝাড়ার মত কালজয়ী ভাস্কর রামকিঙ্করের অন্যান্য কাজও নষ্ট হচ্ছে নানাভাবে — রোদে জলে, মানুষের অত্যাচারে অবহেলায়। এই হাইটেক প্রযুক্তির যুগেও



তাঁর আসল কাজগুলি রক্ষা করার পরিকল্পনা এখনও নেওয়া হল না কোথাও। আশু মহারাজ, অনিল বরণ রায়, অনন্তজ্যাঠা, রামানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নন্দলালের থেকে যে সম্পদ পেয়ে রামকিঙ্কর তাঁর সারা জীবন ধরে মাটি সিমেন্ট পাথরে ক্যানভাসে, খাতার পাতায় গেঁথে দিয়ে গেলেন আজ তার অধিকাংশই ক্রমশঃ ক্ষয়ের দিকে। কত যে নষ্ট হয়েছে ছবির স্তূপ, কেবা কারা নিয়ে গেছে যা থাকলে হয়ত একটা নতুন ধারারই সূত্রপাত হয়ে যেত। যদিও তা হয়েছেও কিছুটা। কিন্তু কেন এই অবহেলা ? তিনি ভব্য সমাজের লোক নন বলে ? রসিক মেথরের পরিত্যক্ত ঘরটির পর ছাত্র শঙ্খ চৌধুরীর শ্মশান প্রান্তরের খড়মাটির ঘরটিই ছিল তাঁর আবাসস্থল। এহেন পরিস্থিতি যেখানে তবু তো তিনি কাজ করে গেছেন। কিন্তু কতো কাজ করতে পারেননি। কতো কাজ বাতিল হয়েছে তাঁর। এমনি একটি বাতিল কাজ হল 'মৎস্যকন্যা'। যার একটি ছোট্ট ম্যাকেট আমরা দেখতে পাই। তিনি মৎস্যকন্যার পরিবর্তে করলেন 'মৎস্যমহিষ' — বিরলালয় ছাত্রী নিবাসের সামনে। তিনি বলেছেন, "ফোয়ারার তলায় দুটি মৎস্যকন্যা করি এই ছিলো ইচ্ছা, কালো সিমেন্টে করলে বেশ কষ্টি পাথরের মতো মূর্তি হতো। কিন্তু কারো কারো আপত্তি কানে এলো। তাঁরা সব কর্তাব্যক্তি। শেষে রেগেমেগে বদলে ফেললেন সাবজেক্টটাই। মেয়েকে করে দিলাম মোষ। কত রকম মানুষ থাকে দ্যাখো।" এছাড়া বাতিল আর একটি তাঁর পরিকল্পিত কাজ 'কংকালীতলার পথে' —যা প্রচলিত বলি প্রথার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ। তাও করতে পারলেন না। তাঁর ছাত্র রবিপাল লিখেছেন, "রামকিঙ্করকৃত এই মূর্তিটিকে ঘিরে বিতর্ক শুরু করা যেতে পারে। হয়েছিলও। আর সেই গূঢ় কারণেই হয়ত রামকিঙ্করের মত স্ব-অর্জিত উচ্ছল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ভাস্করের মূর্তিটিকে বড় করার শেষ ইচ্ছা থাকলেও সেই অন্তিম ইচ্ছা উঁচু তলার উন্নস মেশানো 'না' শব্দটির জন্য পূরণ হতে পারেনি।" বড় হতাশ হয়ে জীবনের শেষ লগ্নে এসে বলেছিলেন, "কাজটা প্রথমে হাত দিলে হয়ত শেষ করতে পারতাম।" তিনি অন্য এক জায়গায় বলেছেন, "কাজ করা কত কঠিন, কাজ করাতে পারেনা, বাধ সাধতে পারে। পণ্ড করে দিতে পারে। আফসোস থেকে গেছে মনে।" তিনি একথা তাঁর অন্য একটি পরিকল্পিত কাজ বাতিলের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন — যা হল "বার্থ অব ফায়ার।" বলেছেন, "বহুদিন আইডিয়াটা ঘুরছিল মাথায়। বহুদিন। কাজটা আর শেষ হলো না। শেষ করবো কি — কর্তৃপক্ষ বললেন পরীক্ষার হলে পরীক্ষা হবে। আমি বললাম বেশ, হোক পরীক্ষা, কাজ বন্ধ রাখছি। সব চুকে গেলে আবার ধরবো। বলে তা হবে না। কে কী বুঝেছে, বুঝিয়েছে কে জানে। বাবা আমার কী ? থাক। আমার এত সাধের আইডিয়াটা রূপ পেলো না হে। খড়কুটো কুড়িয়ে এনে আগুন জ্বালাবার আয়োজন করলাম। আর দিলো জল ঢেলে। বার্থ অব ফায়ার এর ইতি।" তাঁর ছাত্র কে জি সুব্রহ্মনিয়ম বলেছেন, "এইরকম আরো কিছু কাজ করার পরিকল্পনা নিয়ে ছিলেন তিনি, যেমন —পিয়ার্সন পল্লীর পটভূমিকায়, ঠাকুর-গান্ধীর বিশাল মূর্তি। এবং একেবারে নতুনভাবে গান্ধী মূর্তি – যেখানে ভেঙেপড়া পৃথিবীর উপর দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে বিজয়ীর উন্মত্ততায় হেঁটে যাবেন তিনি। পরিকল্পিত এই কাজের খসড়া স্কেচটি ছিল তাঁর করা একটি





পি জি হাসপাতালে অসুস্থ রামকিংকর। যুগান্তর চিত্র

রামকিংকর অসুস্থ

স্টাফ রিপোর্টার : 'কলকাতা চললি, তবে এখন মেয়ে পাবে কাঁচি, কবে যে শান্তিনিকেতনে ফিরে যাবো —

অসুস্থ শিল্পী রামকিংকর বেইজ কলকাতায় পৌঁছিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে, পি জি হাসপাতালের উডবার্ণ ওয়ার্ডের ১৬নং বেডে শুয়ে শুয়ে তিনি কথা বলছিলেন। লম্বা লম্বা জটের মত শাদা, কালো চুল, খাপ খাঁচ দাড়ি, আর কালো দুটি চোখের করুণ দৃষ্টি। শিল্পীর সারল্য নিয়ে রামকিংকর বিছানায়। হাসপাতালে। প্রকৃতির আশ্রয় থেকে এই ইট কাঠের শহরে এসে তিনি নির্বাক, অসহায়। চলে তাড়াতাড়ি অসুখ সারিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে। বাড়ি মানে শান্তিনিকেতন। এখানে এসে কেমন লাগছে ? প্রশ্ন করতেই শিল্পী বললেন আসতে তো ভালই লাগল। ক-ত্রো-দিন পর এলুম কলকাতায়। অথচ দৃষ্টিতে কেমন এক শূন্যতা। যেন দেখেও দেখতে পাচ্ছেন না কিছু। কেউ এসেছিলেন দেখতে ? সত্যজিৎ রায়, গণেশ পাইন কিংবা বন্ধুদের কেউ ?

প্রশ্ন করতেই তিনি মাথা নেড়ে ফিস ফিস করে উঠলেন, না, না, কেউ আসেনি। একটু থেমে বললেন, উৎপাত শুরু করেছে ডাকতাররা। কী সব ছবিটবি তুলে নিচ্ছে। এই তো সবে শুরু। চোখে মুখে এক অশান্ত যন্ত্রণা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানালেন, রামকিংকরের অসুস্থতার সব খরচ বহন করবেন রাজ্য সরকার। তাঁদের উদ্যোগেই রবিবার তাঁকে শান্তিনিকেতন থেকে এখানে আনা হয়েছে।

২৪ মার্চ, ১৯৮০, যুগান্তর পত্রিকার একটি প্রতিবেদন।

শক্তিশালী কাজ। কিন্তু এর কোনোটিও আর করা হয়ে ওঠেনি।" তাইতো জীবনের শেষ পর্বে এসে দুঃখ ভারাক্রান্ত রামকিঙ্কর বলেছেন, "দুঃখ হয় হাসিও পায়। হাসি দুঃখের ব্যাপার। জীবনটাই এইরকম।" তিনি তাঁর চারপাশে দেখেছিলেন —অধিকাংশই "মুখোশ পরা মানুষ। মুখে সোহাগ। দুনিয়ার ভালো চায়। কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। আর ভোগে ভাগ পড়লেই রাক্ষুসে মূর্তি। তখন রঙচঙ বার্নিস ফার্নিস উঠে গিয়ে বেরিয়ে পড়ে খড়ের ঠাট। বর্ণচোরা জীব।" এইসব দেখে দেখে ভিতরে দগ্ধ হতেন তিনি। কখনো বা অট্টহাসিতে ঢেকে ফেলতেন তথাপি প্রতিবাদ করেননি। তো এহেন মানসিকতা কি তাঁর অধিকাংশ মানুষ বিষয়ে ক্রমবর্ধমান



এক বিরাট বিতস্পৃহা ? ক্রমশঃ ঘৃণার পাহাড় উঁচু হতে হতে উদাসীন হয়ে যাওয়া নাকি দুরারোগ্য ক্যান্সার ভেবে হাত গুটিয়ে নেওয়া ? শিল্প ভাবনার আরও গভীরে নিমজ্জিত থেকে ঐ ছোটছোট মানুষদের থেকে মুক্তি কামনা — সরে যাওয়া ? অন্ততঃ এরকমই ধারণা করা যায় তাঁর সম্পর্কে। কিন্তু মুক্তি কি পেয়েছিলেন রামকিঙ্কর ? তাই বা কি করে বলা যায়। ক্রমশ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি বলেছেন, "আমার সঙ্গে কার আত্মীয়তা ? ঐ পলাশের। পাতা নেই, নেড়া ডাল, সর্বাঙ্গে আগুন।" হ্যাঁ, সর্বাঙ্গে আগুন নিয়ে তিনি যাপন করেছিলেন রতনপল্লীল মাটির ঘরে ডালপালা বিহীন একা। আর এই একাকিত্বে কিভাবেই বা তিনি লড়েন। শুধু নিজেই অন্তরে দাউদাউ করে জ্বলে ছাঁরখার হয়েছেন — পরিশুদ্ধ হয়েছেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — "আমরা এ দীপ না জ্বালালে দেয়না কিছুই আলো।" হ্যাঁ, তাইতো তিনি এত আলোও ছড়িয়েছেন। ভিতরের আজন্ম সঙ্গী যে শিল্প ভাবনার আগুন — তার সাথে বাইরের সংঘাত প্রসূত আগুনের মোলাকাতে তিনি একটু একটু করে পূর্ণতা পাচ্ছিলেন — দিব্য চেতনার সে পূর্ণতা। যে পূর্ণতা স্থূল দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। যা অর্জন করতে লাগে জন্মগত প্রতিভা ও তপস্যা। তথাপি এই পৃথিবীতে সম্ভবতঃ শিল্পীরাই এমন এক নিরাপদ জীব যাঁর কাজ বিষয়ে যে কেউ যা হোক একটা মন্তব্য করেই দিতে পারে লঘুমস্তিষ্কে। যার জন্য কোনো সহজাত ক্ষমতা, হাতে কলমে শিক্ষা ও অধ্যাবসায় দরকার হয় না। রবীন্দ্রনাথের যে অ্যাবস্ট্রাক্ট মূর্তি গড়েছিলেন একটা —যা সিটিং না নিয়ে মূলতঃ মন থেকে গড়া। অমনি চারপাশ থেকে সমালোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিলো তার। 'ওটা যে কী করেছে, চোখে বল দেওয়া, চেনা যায় না।' রসিক লোক তো, বলেছিলেন 'ঐটেই ঠিক করেছে।" বলেছেন — রামকিঙ্কর। রসিক লোকটি হলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তিনি রবীন্দ্রনাথের আরও দুটি পোর্টেট গড়েছিলেন সিটিং নিয়ে। তার একটি নিজের অপছন্দের কারণে ভেঙে দেন অন্যটির একটি কপি হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেস্টের কাছে বালাতান হ্রদের তীরে ভারত সরকার কতৃক স্থাপন করা হয়। কেউ বললেন, "ঐ মূর্তি রবীন্দ্রনাথের অবমাননা ছাড়া কিছু নয়।" তিনি বলেছিলেন, "পছন্দ না হলে তুলে ফেলে দিক।" পরে অন্য সময় বলেছিলেন, "রবীন্দ্রপুতুল গড়িনি মনে রেখো। খাঁটি হলে টিকে থাকবে আর না হলে আস্তাকুড়ে ঠাঁই পাবে।" তো এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা পরে আছে। আপাতত রামকিঙ্করের করা বিখ্যাত যে ভাস্কর্য 'সাঁওতাল পরিবার' — এটির নির্মাণ কালে তিনি কতিপয় কেতাবি সমালোচকের যে সমালোচনার মুখে পড়েন তার আলোচনায় আসি। "প্রথমতঃ রামকিঙ্কর এমন একটি শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন যেখানে তথাকথিত কেতাবি প্রথায় অঙ্কনরীতি শেখানো তো হতোই না আর ভাস্কর্য শিক্ষা বহু দূরের স্বপ্ন ছিল। দ্বিতীয়তঃ অবনীন্দ্র-নন্দলাল প্রবর্তিত নব্য শিল্পরীতিতে শিক্ষিত রামকিঙ্করের ভাস্কর্য সম্পর্কে কোনো ধারণায় ভিত্তি নেই। তৃতীয়তঃ ভাস্কর্যের অস্থিসংস্থান বিষয়ে তৎকালীন সাধারণ জনের প্রচলিত ধারণায় "শান্তিনিকেতনী শৈলীর" লবঙ্গ লতিকা ভাবের (শ্লেষ সূচক সমালোচনার ভাষায়) প্রভাব অতিমাত্রায় এই ভাস্কর্যের উপর প্রতিফলিত। চতুর্থতঃ ভাস্কর্য তৈরীর করণ কৌশল সম্বন্ধে



রামকিঙ্করের সম্যক জ্ঞানের অভাব। পঞ্চমতঃ সমগ্র ভাস্কর্যটির মধ্যে রামকিঙ্করের শিক্ষানবিশীর উৎকট গন্ধ বর্তমান।" 'সাঁওতাল পরিবার' বিষয়ে এই অতিশয় জ্ঞানগর্ভ সমলোচনা রামকিঙ্করকে কিছুমাত্র বিচলিত করতে পারে নাই। বরং হয়ত তার স্বভাবজাত অট্টহাসি হেসে নিয়েছিলেন। যাইহোক এই বিষয়টি রামকিঙ্কর ছাত্র শ্রী রবি পালের 'অনন্য রামকিঙ্করের' গ্রন্থ থেকে তুলে ধরা। এখানে প্রসঙ্গক্রমে স্মরণে এসে যায় তাঁর অন্য ছাত্র শ্রী মদন ভাটনগর বর্ণিত একটি ঘটনার কথা। তখন 'কলের বাঁশি' ভাস্কর্যটির কাজ চলছিল। নির্মাণ কার্যে তাঁর সহকারী বাগাল রায় ছাড়া মদন ভাটনগরও ছিলেন। ঐ সময় কলকাতা থেকে কয়েকজন সাংবাদিক এসেছিলেন রামকিঙ্করের নির্মিয়মান ভাস্কর্যটির সম্বন্ধে জানার আগ্রহ নিয়ে। কিন্তু ইতিমধ্যে শিল্পী সাংবাদিক দেখে কোথায় সরে পড়েছেন। যখন তাঁরা তাঁর সাক্ষাত না পেয়ে চলে যান তিনি প্রকাশ্যে আসেন। শ্রী ভাটনগর বলেছেন, "ওরা চলে যেতেই দেখি কিঙ্করদা 'যমুনাদির স্টুডিও'-র দিক থেকে বেরিয়ে আসছেন। আমার কিছু বলার আগেই তিনি বললেন — চলে গেছে। আমি বললাম — ওরা সাংবাদিক। ঐ মূর্তিটির সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইছিলেন। শুনে বললেন — 'সাংবাদিকদের থেকে দূরে থাকাই ভাল। তাদের প্রশ্নের উত্তর কে দেবে ?" এখানে একটা দুঃখের কথা যে চিত্রশিল্পী ও ভাস্করদেরই দেখতে পাই — তাঁরা বরাবর বির্তক ও সমালোচনায় আক্রান্ত হন। আবার যাঁরা করেন তাঁদের সে বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা নেই বললেই চলে। অথচ ঐ সমালোচনার ফলস্বরূপ প্রকৃত শিল্পী হয়ত তাতেও মরেন। এপস্টানের সম্পর্কে ইংলন্ডের সমালোচকদের কেউ বলেছিলেন যে, "ওঁর ব্রঞ্জের কাজ মন্দ নয়, কিন্তু পাথর খোদাইয়ে যেই হাত দেন অমনি সব বিদঘুটে কাজ বেরোতে থাকে।" এ প্রসঙ্গে রামকিঙ্কর বলেছেন — "চোখ কোথায় ? আর চোখ যাঁদের আছে তাঁরা তো পাত্তাই পায়না। ত্রি সীমানায় নেই তাঁরা। ভাবছো আমাদের দেশেই এমনটি হয় ? এখানে একটু বেশিই হয় ঠিক, তবে দুনিয়া জুড়ে এই ব্যাপার।" আরও বলেছেন, "মাতব্বরি দেখেছো ? দিগগজ সব। যে কিছুই বোঝে না সেও বিনা মূলধনেই বিচারক বনে যায়। আর হতভাগা আর্টিস্ট পড়ে পড়ে মার খায় বেদম।" রামকিঙ্করও মার খেয়েছেন — বেদম।

তাঁর একটা ইচ্ছা ছিল ভারতবর্ষের যে রাজ্যে তিনি জন্মেছেন তার রাজধানী মহানগরী কলকাতায় একটি মূর্তি গড়েন। তিনি বলেছিলেন, "খানিকটা খোলা জায়গা দাও। পয়সা না থাকে চুন সুরকি সিমেন্ট তো দিতে পারবে। তাতেই হয়ে যাবে করবো একটা কাজ।" কিন্তু না, খুব দুঃখের কথা হতাশার কথা যে ভারতবর্ষের একজন পথিকৃত ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজকে কলকাতা তাও দেয়নি। তাঁর পাঠানো নেতাজীর ম্যাকেট ফিরে এসেছিল কলকাতা থেকে উদ্যোক্তাদের পছন্দ হয়নি বলে। তিনি বিষন্ন চিত্তে বলেছিলেন, "জানো, এমনি পছন্দ হয়নি আমার একটা কাজ কলকাতার কর্তাদের। শ্যামবাজরে পাঁচমাথার মোড়ের জন্য চেয়েছিলেন নেতাজীর মূর্তি। করে পাঠিয়ে ছিলাম প্লাস্টারে। নেতাজী মানুষটা কী তেজীয়মান বলো দেখি ঠিক বিবেকান্দের মতো। চেয়েছিল ঘোড়ায় চাপা নেতাজী। আমি ঘোড়া আর



মানুষটাকে একাকার করে দিয়েছিলাম। ঘোড়াও তো তেজেরই মূর্তি। উর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে। বাতিল। ঘোড়া ফিরে এলো ঘরে। নেতাজীকে পিঠে নিয়ে। কর্তাদের মনে ধরলো না।" আসলে মূর্তির চাইতে মূর্তিকারকেই আগে পছন্দ হওয়া চাই যে। তা সে মহাকাল তাকে ফেলে দিক কি রাখুক সে গৌণ ব্যাপার। এমনিই চলছে। রবীন্দ্রনাথ বলতেন — "পরোয়া করিনা। আমি পরোয়া করিনা। আমার যেমন মনে হয়েছে, আমি তেমনই এঁকেছি। আমি চাইনা যে আপনি তা বুঝুন। আপনার যা মনে হয় তাই ভাবুন। রবীন্দ্রনাথের এই কথা যিনি প্রাণে প্রাণে মনে রেখেছিলেন সেই রামকিঙ্কর আর অন্য কি ভাববেন — কারো মনোমত কাজ করতে তিনি তাই নারাজ। তিনি বলেছেন, "কেউ অর্ডার দেয়নি, তবু গাছ হচ্ছে। আপনা থেকেই হচ্ছে। তো গাছের মতোও তো কিছু একটা গড়া যেতে পারে।" বলেছেন, "শিল্পী কোনোদিন দর্শকের মুখ চেয়ে ছবি করেননা। কেন করবে ? সেতো ভগবানের পুত্র।" আরও বলেছেন, "শিল্পীকে স্বাধীনতা দিতে হবে। সে নিজেই ঠিক করবে। আগে থেকে সরকার বা কেউ মাপ-জোক বলে দিলে হবেনা। এ প্রসঙ্গে শিল্পী বিনোদবিহারীর একটি কথা স্মরণে এসে যায়। তিনি চিত্রকর প্রবন্ধে বলেছেন, "সৃষ্টির উৎস মানুষের অন্তরের বস্তু।" বস্তুত শিল্প প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এইসব কথা যেখানে তবুতো বিচারক থাকেন তারাই হয়তো উদ্যোক্তাও থাকেন তাঁরাই — যাঁরা সে পথ মাড়ান নি জীবনে। বিখ্যাত শিল্পী রোদ্যা ও এপস্টাইনের প্রসঙ্গে রামকিঙ্কর বলেছেন — "হুঁ। দেখো এঁদের মতো আর্টিস্ট — কমিটির বাবুরা, কাগজের ক্রিটিকরা লেগে গেলো পিছনে আর তাঁদের কথা শুনে সাধারণ মানুষও ছি ছি করতে লাগলো।" 'বিমূর্ত রবীন্দ্রনাথ', 'সিরিয়াস রবীন্দ্রনাথ', 'ধানঝাড়া', 'সাঁওতাল দম্পতি' যেমন তেমনি অয়েল, ন্যুড স্টাডি ইত্যাদির ক্ষেত্রে রামকিঙ্করকে ছি ছি-ই শুনতে হয়েছে সেসময়। একমাত্র নিজের প্রতি যে প্রচণ্ড আস্থা ও ঐ জ্যোতির্ময় পুরুষের মত 'পরোয়া করি না। পরোয়া করি না আমি।' মানসিকতা থাকায় তিনি সেইসব প্রতিরোধের প্রাচীর ভেঙ্গে যেভাবে এগিয়ে গেছেন — ভাবতে খুব রোমাঞ্চই লাগে। ঐ প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই তিনি রামের কিঙ্করের মতই কাজ করে গেছেন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দাবদাহে শোলার টুপি মাথায় রেখে, ভারার উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে। তাঁর পরিচালিত 'পোয়েটোস্টার্স অফ ইস্পাহান' নাটকটি মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে যখন বিশ্বভারতী তাঁকে কোন রকম সাহায্যই করতে চাইলনা — তিনি বলেছিলেন, "আমি রামকিঙ্কর, রামের বাহন হনুমান, আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না।" বলতে গেলে ধারাবাহিকভাবে এ সমস্ত অসহযোগিতা, আক্রমণ, সমালোচনা ইত্যাদি রামকিঙ্করের একরকম গা সহা হয়ে গিয়েছিল। তবু মানসিক কষ্ট তো তাকে ছেড়ে কথা বলেনি। যেমন একজায়গায় তিনি বলেছেন — "করতে চাই কাজ। চারদিকে উৎসাহ কই ? ফেলে রেখে দিলে কি কাজ হয় ? আসলে তখন তখন না করলে আর মন থাকেনা। কাজ করতে গেলে সাহায্য দরকার। উজানে আর বাইবে কত ?" না করতে পারা তাঁর একটি কাজ — মাঠে যাচ্ছে বাপ আর ছেলে। জোয়ান ছেলের কাঁধে লাঙ্গল, মাথা উঁচু করে হাঁটছে। বুড়ো বাপ চলেছে পাশে পাশে। মাথা ঝুঁকে আছে মাটির দিকে। এর স্মরণে বলেছেন, "খুব ইচ্ছে ছিল বড় করে করি আমার একটা কাজ। কাজটা ছোট আকারে করা আছে দেখেছো কি ?



বাপ বেটা চলেছে মাঠে।" কিন্তু তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে রবীন্দ্র-নন্দলাল পরবর্তী সময়ে কজনই বা গুরুত্ব দিয়েছে। তাই জীবনের অনেকটা সময় দুঃখকে হজম করেই গেছেন তিনি। কাজ করতে না পারার দুঃখ। তাঁর চির সঙ্গিনী রাধারাণী বলেছেন — "দুঃখের দিন মনে আছে। চানও করতেন না, খেতেনও না, ঐ যা ধুলোমাটি মেখে থাকতেন। দুঃখের দিনটাই আমি দেখলাম বেশি।" হয়ত এই নাছোড় দুঃখের কারণেও তিনি হয়ে উঠেছিলেন আরোতর অন্তর্মুখী ও পরিপার্শ্বের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এক মানুষ। তাঁর অন্তর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যাওয়া বাঘ মানুষ, শেয়াল মানুষ, নেকড়ে মানুষ, সাপ মানুষদের সম্পর্কে বলেছেন — "অনেকে আলাপ করতে আসে। ঢং ঢাং দেখি। বেসুর ধরা পড়ে। তারপর আবার কী থাকে জানো ? ভড়ং — যা নয় তাই সাজতে চায়। কেউ পণ্ডিত সাজে। কেউ কবি আর্টিস্ট। কেউ ভালো মানুষ। কেউ দাতা কর্ণ। যাত্রা দলের সঙ সব। মনে মনে হেসে মরি। মুখে চুপ করে থাকি। তারপর আবার ধাক্কা থাকলে তো কথাই নাই। চলে গেলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। যেন বন্ধ ঘরের দরজা জানালা সব খুলে গেলো — খোলা হাওয়া ঢুকলো — প্রাণটা জুড়লো হে।" কিন্তু কতক্ষণ আর জুড়োয় ঐ শান্তিকামী সৃষ্টিশীল মনের মানুষগুলোর প্রাণ। চারপাশের ধ্বংসাত্মক মানসিকতার সদম্ভ আস্ফালনের নীচেই যে অধিকাংশ পৃথিবী আবহমান কাল ধরে মূহ্যমান ও সংকুচিত। তবু দিগ্বীদিক আলো ছড়িয়ে শাশ্বত হঠাৎই বেরিয়ে পড়ে আকাশে একদিন বলে — আমার মৃত্যু নেই। রামকিঙ্করও তাই মরেননি। মরতে পারেন না তিনি। তাই ক্রমশঃ প্রকটিত হচ্ছেন সর্বত্র আপন মহিমায়। এখন আমরা একটু পিছন ফিরে আরেকবার দেখি। না ফিরে দেখা রামকিঙ্করের জীবনের সবচেয়ে মর্মান্তিক একটি ঘটনার চারপাশ — যা তাঁকে চরম বিপর্যস্ত করেছিল। জীবনের অন্তিম সময়ে এসে যেখানে তাঁর অধিকাংশ স্মৃতিই বিস্মৃতির গহ্বরে — সেখানে ভোলেন নি তিনি সেই ঘটনা। সৌম্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর দু-একটা নাটক মঞ্চস্থ করানোর কাহিনী শোনাতে গিয়ে 'ট্রাজেডি' বলে থেমে গেছেন তিনি। শ্রদ্ধেয় শ্রোতা তাঁর 'শিল্পী রামকিঙ্কর ঃ আলাপচারিতায়' গ্রন্থে লিখেছেন কিঙ্করদার কথা আর এগোয়না। কী ভাবতে থাকেন নিজের মনে। বারকয়েক উচ্চারণ করেন ঐ বিদেশী শব্দটা খুব নীচু গলায়। আর লক্ষ্য করি মুখের চেহারা বদলাচ্ছে। সেই রহস্যময় অভিব্যক্তি, তাকে সুখের বা দুঃখের বলে চিহ্নিত করা যাবে না। কারণে কৌতুকে বেদনায় ব্যঙ্গে মেশামেশি এক অদ্ভুত মূর্তি, দর্শককে যা বিমূঢ় করে দেয়।" কিন্তু কি সেই ট্রাজেডি ? এই ঘটনার উল্লেখ 'অপাঙ্‌ক্তেয় রামকিঙ্কর' পরিচ্ছদে করা হয়েছে। তো বলাই বাহুল্য প্রকৃত পক্ষে এইসব দুঃখ ছাড়া পরিস্থিতির চাপে তিনি হয়ত একটু করে সরেই যাচ্ছিলেন জাগতিক কামনা-বাসনা থেকে মুক্তির দিকে।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে তিনি কি পুরোপুরি উদাসীন হতে পেরেছিলেন? না, পারেন নি তিনি তাঁর সন্তানতুল্য নির্মাণগুলির দিকে তাকিয়ে। সেগুলি যে রোদ-বৃষ্টি ঝড়ে ক্রমশ নষ্ট হচ্ছে। কিংবা কোনো কালবোশেখের তাণ্ডবে হয়ত একদিনেই ধুলিস্যাৎ হবে। জীবনের উপান্তে এসে তাঁকে এই দুর্ভাবনায় একেবারে পাগল করেছিল। মনের আকাশে বেদনার ঘন কালো মেঘ। আর মুখে তারই প্রগাঢ় ছায়া। এ দৃশ্য দেখেছেন — সৌম্যেন্দ্রনাথ কাকু। তিনি



লিখেছেন — 'ভুলবো না, কোনোদিন ভুলবো না কিঙ্করদার পাংশু মুখে সেই বেদনার গাঢ় ছায়া। এই সৃষ্টিগুলি ওঁর সন্তান। বহু সাধনার ধন। নিজেকে তিলেতিলে দিয়েছেন এদের জন্য। গ্রীষ্ম, শীত গ্রাহ্য করেননি। খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই, ঘুম নেই। নিজের সুখ-দুঃখ শান্তি স্বস্তি ভালোমন্দ জলাঞ্জলি দিয়ে দেহ-মন-প্রাণ সব দিয়েছেন উজাড় করে। আজ জীবনের উপান্তে ওঁর সম্বল শুধু ঐ রচনা। ভুলবো না। কোনোদিন কিঙ্করদার ঐ দৃষ্টি। কী ভাষায় বর্ণনা করা যায় তাঁকে — অসহায় ? আর্ত ? বিপন্ন ? কোনো শব্দেরই সাধ্য নেই একে ভাষা দিতে পারে।" খুব সত্যি একথা। কারণ রামকিঙ্করের ভাষা যে বড়ই গভীর। তার উপর তিনি অসহায় আর্ত ও বিপন্ন যেখানে সেখানে তো কথাই নাই। তো সে ভাষা পড়ে শিল্পপ্রেমী অসহায় হৃদয়গুলোও যন্ত্রণায় বারবার কঁকিয়ে ওঠে। বিপরীতে পারগ যাঁরা, তাঁরা কিভাবে নিশ্চুপ দেখে যায় সেই সব কালজয়ী ভাস্কর্যের তিলতিল মৃত্যু — এই হাইটেক প্রযুক্তির যুগেও। সত্যি! কী নিদারুণ পরিহাস। যদি কোনো তুমুল ঝঞ্ঝায় টুকরো হয় ভাস্কর্যগুলি যা আমরা কোনারকের পর দীর্ঘ সাতশো বছর পেরিয়ে আকণ্ঠ পিপাসা মেটানোর মত পেয়েছি, তবে আগামী প্রজন্মের কাছে কোনো জবাব দেওয়ার থাকবে না আমাদের। তারা সব ধিক্কার দেবে আমাদের অপারগতাকে ছোট মানসিকতাকে। দেখতে পাই রামকিঙ্কর তাঁর সন্তানবৎ সৃষ্টিগুলির টিকিয়ে রাখার কথা ভেবেছেন আর হতাশ হয়েছেন — যা লিখতে গিয়েও অন্তরটা মোচড় দিয়ে ওঠে — হায়রে! কী বিচিত্র এই পৃথিবী! একদিকে বিশাল জলরাশি তো অন্যদিকে ধুধু মরু। আবার ঐ মরুই আজ শক্তিধর হয়ে যেন একটু করে চারপাশে তার পরিধি বিস্তার করতে চাইছে। রামকিঙ্কর বলেছেন, "কিন্তু কংক্রিটও কি টেকে ? ওরও ক্ষয় আছে হে। ঝড়ে জলে রোদে। ওকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা দরকার, উদ্‌যোগ দরকার। কোটিং আছে একটা বিদেশে পাওয়া যায়। দিলে আটকানো যায় ক্ষয়। কোথায় পাই ? কে করে উদ্‌যোগ? যদি ব্রঞ্জে করার সুযোগ পেতাম। তবে এখানে থেকে যেত দু-একটা কাজ। না না — অন্য কিছু দরকার। অন্য কোনো উপায় হতে পারে। কিছু করা দরকার। নৈলে নষ্ট হয়ে যাবে সব। এতো করলাম থাকুক দু-একটা কাজ। কিছু থাকুক।" হ্যাঁ, থাকবে অবশ্য তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা কাজ। কিন্তু অন্যান্যরা এখনও বিপর্যয়ের সঙ্গে যুঝে চলেছে। "কে দেবে তাদের পরিত্রাণ — ব্রঞ্জের সেই ব্রজকঠিন স্থায়ীরূপ ?" হয়তো কেউ-ই পড়ে থাকবে না তবু ভয় ঐ কালবোশেখের তীব্র ভ্রুকুটিকে। এবং দুঃখের কথা যে, এই হাইটেক প্রযুক্তির যুগে এখনও মূল ভাস্কর্যগুলির রক্ষা করার তেমন তোড়জোড় শুরু হলনা। তবু আশা এই — কিছু শিল্প পাগল মানুষ চিন্তা ভাবনা করছেন, চেষ্টায় আছেন।

অতঃপর এখন আসা যাক ব্যথিত রামকিঙ্করের জীবনের সবচেয়ে বেদনা ভরা বিষয়ের আলোচনায়। প্রখ্যাত শিল্পী শ্রী সোমনাথ হোড় যিনি সে সময় বিশ্বভারতী কলাভবনের অধ্যক্ষ পদে ছিলেন, তিনি কলকাতায় বামফ্রন্টের 'কলাকুশলী' বলে যে আর্টগ্রুপ ছিলো তাঁদের বলেছিলেন — 'কিঙ্করদাকে আপনারা নিয়ে যাবেন না। আপনারা যেটা ভাবছেন, কিঙ্করদার ব্রেন সার্জারি তা এই বয়সে কিঙ্করদার পক্ষে ভালো হবে না।" কিন্তু তাঁরা কি বুঝলেন — কি ভেবেছিলেন, শুনলেন না সেকথা। তাঁকে চিকিৎসার জন্য কলকাতার শেঠ সুখলাল কারনানি



হাসপাতালের উর্ডবার্ন ওয়ার্ডে নিয়ে গেলেন। রামকিঙ্করের ছাত্র দিনকর কৌশিক লিখেছেন, "কিন্তু সোমনাথদার কথা না শুনে ওঁরা তাঁকে কলকাতায় নিয়ে গেলেন। এস এস কে এম হাসপাতালে রাখলেন। কিন্তু তারপর কোনো খোঁজ খবর নিচ্ছেলেন না। ডাক্তাররা কী সার্জারি করেছে সে খবরও কেউ নেয়নি। কিঙ্করদা অবস্থা ভালো হওয়ার বদলে উল্টো হল।" তিনি চলে গেলেন। শান্তিনিকেতনে আর ফিরলেননা। কলকাতায় যাওয়ার ইচ্ছা তাঁর আদৌ ছিল না। সুহৃদ হৃষিকেশ চন্দ মহাশয়কে সামনে পেয়ে কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করেছিলেন — সে যাত্রা রোধ করতে। বলেছিলেন, "হৃষিকেশবাবু আমাকে আপনারা পাঠাবেন না। আমাকে শান্তিনিকেতনেই মরতে দিন।" ভাইপো দিবাকর বেইজ স্বল্প শিক্ষিত মানুষ। তাঁকে যা বুঝিয়েছিল ওঁরা — বুঝে সই দিয়ে দেন। অপারেশনের সম্মতি। তো পরে অবশ্য অনেক আফসোস করতে দেখেছি তাঁকে। রামকিঙ্কর আর বাঁচলেন না। কিন্তু তিনি যে আজ মরেও অমর। তিনি কালজয়ী। তিনি বেঁচে থাকবেন যথার্থ শিল্প রসিকদের অন্তরে অন্তরে চিরকাল মাথা উঁচু করে। □

প্রভাস সেনের সংযোজন



পরলোকে রামকিংকর

১৭ই শ্রাবণ, ১৩৮৭, আনন্দবাজার পত্রিকার একটি প্রতিবেদন।

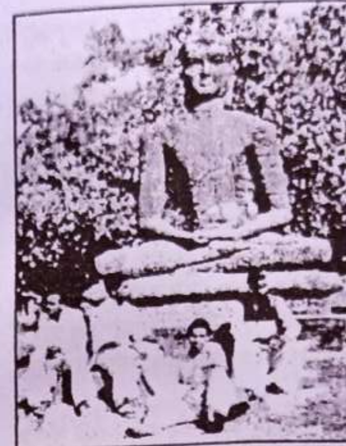
অপাঙ্‌ক্তেয় রামকিঙ্কর

"সুরেনের সঙ্গে গিয়েছিলুম তোমাদের কলকাতায় একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে। সে উপলক্ষে একটা পুস্তিকায় আমার বিষয়ে লিখতে গিয়ে একজন লেখক আমাকে সাঁওতাল বলে পরিচয় দিয়েছেন। অনেকেরই এরকম ধারণা আছে যে আমি সাঁওতাল। ধারণাটা ঠিক নয়। যাঁরা লেখেন তাঁরা কি একটু খোঁজ খবর নেওয়ারও দরকার মনে করেন না ?" এই কথাটি আর কারও না। স্বয়ং রামকিঙ্কর বেইজের। আসলে রামকিঙ্করের ব্যাপারে কলকাতা এরকমই। কথায় আছে না, "শক্তের ভক্ত আমি দুর্বলের যম।" তো রামকিঙ্করের ব্যাপারে যা খুশিই লেখা যায়। কারণ এটা একেবারে বেওয়ারিশ মাল যে। সম্পূর্ণ নিরাপদ একটি জীব। আজ তাই তাঁকে নিয়ে যেন মেতে উঠেছে তাঁর চরিত্র হননের অবিশ্বাস্য সব উৎসবের হুল্লোড়ে। কী তাঁর অপরাধ ? না, তিনি ব্রাত্য হয়ে কোকিলের দলে ভিড়ে গিয়েছিলেন। কোকিলের দল এমন অনুপ্রবেশ মেনে নেয় কী করে ? যুগ যুগ ধরে লালিত যে সংস্কার তা যাবে কোথায়। সবাই তো আর রামানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল কিম্বা বিনোদবিহারী নন। সেতো মুষ্টিমেয়। তাই চঞ্চুর আঘাতে জর্জরিত রামকিঙ্কররূপী কাককে একসময় সরেই যেতে হয়েছিল প্রায় স্বেচ্ছানির্বাসিত হয়ে শ্মশান প্রান্তরের খড়ে ছাওয়া মাটির বাড়িতে। একে কেউ কেউ সমাজ প্রত্যাবর্তনতা (Social regression) বলেছেন। আবার তাঁর সুযোগ্য ছাত্র শ্রী দিনকর কৌশিকের ভাষায় — 'তিনি এই নতুন অবস্থা বা প্রজন্মের মধ্যে সারহীন শূন্যতাকে দেখেছিলেন অথবা হয়তো তাঁর মূল অবস্থার মধ্যে অনেক বেশী পার্থিব রমণীয়তার গন্ধ পেয়েছিলেন।" হ্যাঁ, মূল অবস্থার মধ্যে রমণীয়তার সন্ধান তিনি পেয়ে থাকতে পারেন, তবুও তাঁর অপাঙ্‌ক্তেয় পরিচিতিই যে মূল কারণ ছিল তা 'কভু আশীবিষে দংশন যারে' তার পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব বলে মনে হয় না।



বহু বিতর্কিত 'ধানঝাড়া' মূর্তির সামনে লালমোহন পাল, রামপ্রসাদ সূত্রধর শ্রীহরি সূত্রধর

সেটা ছিল ১৯৫৭সাল। সত্যেন বসু বিশ্বভারতীর উপাচার্য থাকাকালীন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত যুব উৎসবে বিশ্বভারতীর যোগদানের উদ্দেশ্যে সঙ্গীতভবন মঞ্চে 'আন্তিগোনে' গ্রীক নাটকের ইংরেজি অনুবাদের মহড়া শুরু করেন বিদেশ প্রত্যাগত বিশ্বভারতীর তৎকালীন ইংরেজির অধ্যাপক ও সাহিত্যিক ডঃ সুধীন ঘোষ। ঐ নাটক পরিচালনায় সাহায্য করবার জন্য ডঃ ঘোষের লিখিত আমন্ত্রণে স্বাভাবিক সহৃদয়তায় এগিয়ে আসেন রামকিঙ্কর। এবং ঐ নাটকের দু-একটি দৃশ্য পরিচালনা বিষয়ে ডঃ ঘোষকে পরামর্শ দেন। কিন্তু রামকিঙ্করের থেকে নিজেকে অনেক উঁচু পরিচালক ভাবায় ঐ পরামর্শ ডঃ ঘোষকে খুশি করতে পারেনি। এখানে উল্লেখ্য যে নাটক ও মঞ্চ সজ্জার ব্যাপারে রামকিঙ্করের কী অসাধারণ দক্ষতা ছিল তা সে সময়ের বহু বিশিষ্ট গুণীজনের লেখা থেকে জানা যায়। ডঃ ঘোষ তো ক্রোধোন্মত্ত হয়ে ওঠেন। এই ঘটনার দর্শক হিসেবে তৎকালীন বিশ্বভারতীর শিক্ষক শ্রী বিশ্বজিৎ রায় লিখেছেন, "উক্ত পরিচালক মহোদয় যিনি তখন শান্তিনিকেতনে অন্তত আরও একজন কর্মীকে প্রহার করেছিলেন এবং বর্বরতার অন্যান্য নানা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি লাঠি দিয়ে মারতে শুরু করলেন কিঙ্করদাকে। বিশ্বভারতীর শিক্ষকদের মধ্যে একমাত্র আমিই এই শোচনীয় ঘটনার দর্শক ছিলাম। পরিচালকটির হাত থেকে কিঙ্করদাকে উদ্ধার করি আমিই।" তারপর বিভিন্ন কাগজে একের পর এক শুরু হল বিকৃত সংবাদ প্রচার। শ্রী বিশ্বজিৎ রায় লিখেছেন — "তারপর ঐ পরিচালকের পক্ষ নিয়ে হাস্যকর উকিলের ভূমিকায় অবতীর্ন হলেন এক সাহিত্যিক। এছাড়াও ঐ পরিচালকের সম্মান রাখতে অন্য এক সাহিত্যিক লিখলেন উপন্যাস।" তিনি আরো লিখেছেন। — 'শারীরিক আঘাত থেকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠলেও মনে মনে অত্যন্ত আহত হয়েছিলেন কিঙ্করদা। তিনি ভাবতেই পারেননি যে ঐ ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবার সময়ও বিশ্বভারতীর তৎকালীন উপাচার্য তাঁর আঘাত সম্পর্কে সামান্য কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করবার শিষ্টতাও ভুলে যাবেন। সে যাই হোক, বাইরের প্রপাগাণ্ডাকারীরা যাই করুক, সমস্ত শিক্ষকদের সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ দাবীতে উক্ত পরিচালককে ছ-মাসের বেতন দিয়ে বিশ্বভারতীর অধ্যাপনার কাজ থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়।"



অনাদরের একটি নিদর্শন। বুদ্ধমূর্তি। লালমোহন পাল, শ্রীহরি সূত্রধর, রামপসাদ সূত্রধর, দিবাকর বেইজ

ঘটনা এখানেই থেমে থাকেনি। দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় ১৯৫৭ সালের ৩০অক্টোবর তারিখে ঐ ঘটনার একটি বিকৃত সংবাদ প্রকাশিত হল। ঐ সংবাদের আপত্তিজনক কিছু অংশের প্রতিবাদ করে স্বয়ং রামকিঙ্কর ঐ পত্রিকায় লিখলেন। ১৯৫৭ সালের ৪ঠা নভেম্বর ঐ চিঠিটি প্রকাশিত হয়। যার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হল। ..... "The same evening, at the rehearsal, Dr. Ghosh offended me and wanted to leave the place at once. I placed the script on the floor in front of him. I did not throw it at his face. While I was going away Dr. Ghosh gave some blows and beat me - with a stick several times and injured me. I did not retaliate. There were



many eye-witnesses to the assault from different.
Department of Visva-Bharati — yours, etc.
Santiniketan, October 31 Ramkinkar

১৯৫৭ সালের ৪ঠা নভেম্বরেই আনন্দবাজার পত্রিকায় ঐ ঘটনার বিস্তৃত সংবাদ ছাপা হয়। ঐ সংবাদের সঙ্গে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী এবং ছাত্র প্রতিনিধি দলের বক্তব্য ছাপা হয়। সেই বক্তব্যে তাঁরা প্রত্যেকেই ওই ঘটনার নায়ক অধ্যাপক ডঃ সুধীন ঘোষকে দোষারোপ করেন এবং সত্য ঘটনার বিবরণ দেন। প্রসঙ্গত আরো একটি বড়ো খবর হল, পরিচালক অধ্যাপক ডঃ সুধীন ঘোষের পক্ষ নিয়ে সেই সময়ে প্রবলভাবে সোচ্চার হয়েছিলেন আরেকজন। তিনি ডঃ ঘোষের গুণগ্রাহী, সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়। দুঃখের বিষয় এ ব্যাপারে অনেক কাহিনী আছে যা এক দীর্ঘ কলেবরের জলঘোলা বা চাপান উতোর।

আর একটি নাটকের ঘটনা। 'পোয়েটেস্টার্স অফ ইস্পাহান' নাটকের নাম। এটি মঞ্চস্থ করার সময় বিশ্বভারতী থেকে রামকিঙ্করকে কোনোরকম সহযোগিতা করা হয়নি। "নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল কলাভবনের গাছতলায়। সাধারণ মঞ্চের পেছনে নীলরঙের একটি পর্দা টাঙানো হয়েছিল কেবল। বিজলী বাতির পরিবর্তে ব্যবহার হয়েছিল হ্যাজাক। ছাত্র-ছাত্রীদের পোশাক-আশাক চেয়েচিন্তে তৈরী হয়েছিল নাটকের পাত্র-পাত্রীদের রূপসজ্জার সাজ-সরঞ্জাম।" লিখেছেন — রামকিঙ্করের ছাত্র কুণাল কান্তি সাহা।



নেতাজীর যে ম্যাকেটটি বাতিল হয়েছিল
সৌজন্যে - আনন্দবাজার পত্রিকা

রামকিঙ্করের ভাস্কর্যের মশলা তৈরীর কাজে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে বাগাল রায়ই প্রধান। সমগ্র জীবনটাই একরকম তাঁর কেটেছে রামকিঙ্করের মশলার যোগানদার হিসাবে। রামকিঙ্করের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি করার সময় খুব ঝামেলা হয়েছিল। মডেলিং (ন্যুড) ক্লাসের মধ্যেই। বাগাল রায় এক প্রশ্নোত্তরে বলেছেন, অনেকেই আপত্তি করেছিলেন — "ঐ ক্লাসের মধ্যেই হল যে ক্যানে এসব কাজ? আমাদের চলে না এ জিনিসটা। তারপর কিঙ্করবাবু বললেন, 'দেখুন শেষ পর্যন্ত আবার ঐ অভিজ্ঞতাই ঘুরে আসবে।' ...আবার বললে অনেকে 'না আমাদের — এখানে এসব চলবে না।' শেষ বেলাতে দেখুন, যে কথাবার্তা আলোচনা করেছিল



পিতাপুরুষরা, সেটাতো থাকল না। বেশির ভাগই যারা কথাটাকে রটাইছিল, তারাই আবার সেই লাইনে দাঁড়াল। তারাই করছে। আমি একদিন গেইছি 'হ্যাভেল হলে', তখন দেখছি টুকটুক আঁকছে। বলি হ্যাঁ, এবার ছেলে দাঁড়াইছো। সেদিনে যে বড় বলেছিলে মুখ নেড়ে, আজকে দেখি টুকটুক পঁদটা নাড়াইয়ে আঁকছো।"

'ধানঝাড়া' মূর্তিটার সময়ও প্রবল আলোড়ন হয়েছিল। বাগাল রায় বলেছেন — "ওটা করবার সময় ওর উপরটা চারিধার ঘিরে দেওয়া হইছিল। অনেকে আপত্তি করেছিল। মেয়ে মূর্তিতো, কাপড় চোপড় নাই। ঢাকা দিয়ে দিতামগো সব সময়, ঢাকা দেওয়া থাকত।"

তাঁর কাজ নিয়ে এত যে বিতণ্ডা সেখানে মানুষ রামকিঙ্কর কেমন ? "ভালোই, সবদিক থেকেই ভালো।" দীর্ঘ দিনের কাজের যোগানদার বাগাল রায় বলেছেন। বলেছেন, "উনি যে কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে গেইছেন তাও তো করেন নাই। কারো সঙ্গে ঝগড়া করতেন না। ..... কারো মুখ পানে চেয়ে কথাটা বলতেন না কোনদিন। মন মেজাজ সবসময় একরকম। বিনোদবাবুও যা কিঙ্করবাবুও তা।"



বাতিল হওয়া ও চুরি ও উদ্ধার হওয়া 'কংকালি তলার পথে' সৌজন্যে- আনন্দবাজার পত্রিকা।

রামকিঙ্করের সারা জীবনের সঙ্গিনী রাধারাণী। তাঁর মডেল। কিন্তু দুজনের জীবন কেটেছে পরস্পরের জীবন সাথীর মতোই। রাধারাণীর ভাষায় 'জড়াজড়িতে'। রামকিঙ্কর সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, 'মানুষটা ভালই ছিলেন। মানুষ হিসাবে খারাপ ছিলেন না, আমি পেথম পেথম ভয় পেতাম। একদিন দুদিন বকতেন। বকলে পরে মনে করতাম। ব্যস্! ভারী তেজিয়ান তো তিনি। তারপরে আবার খুব ভালো হয়ে গেলেন। শান্ত সুস্থ যেমন স্বাভাবিক মানুষ ঘরে থাকে, কথাবার্তা কয়, খাবার দাবার খায়। ....সঙ্গে থাকলেই একটা মানুষ বুঝা যায়।'

এই মানুষটি সম্পর্কে তিনি অন্য কথায় বলেছেন — ঐ দুঃখের দিনটাই আমি দেখলাম বেশি। না, দুঃখ দেওয়া দেখি নাই, দুঃখ পেত এটাই দেখেছি। মনের দুঃখ। কেউ ভালো দেখতে পারত না, সব পাশাপাশি বাবুরা।" তাঁর মদ খাওয়া একটি বিশেষ — আলোচিত বিষয়। এই বিষয়ে রাধারাণী কী বলেছেন ? "বারণ করতাম, তা শুনতেন না। কত ইয়ে হয়ে গেইছে, ... কথান্তর হয়ে গেইছে। ঐ কথা বলতেন, 'মদটা না খেলে ছবি হবে কি করে ? ছবিটা দাঁড়াবে কি করে ? মদটাতেই আমার চোখটা ঐ দিকে থাকবে। ধীর হয়ে থাকবে,



কোনদিকে যাবে না।' ঐ জন্যই খেতেন। খেয়ে যে মাতলামো করা, কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করা, গালাগাল দেওয়া এসব করতেন না কখনো।"

রামকিঙ্করকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন প্রায় ১৫/২০ বছর শিল্পী সোমনাথ হোড়। তিনি বলেছেন, 'আমি তাঁকে ভয় পেতাম। তাঁর সরল হাসি কিংবা দু-চারটি অসংলগ্ন মন্তব্যে আমার ভেতরটা যেন বাইরে বেরিয়ে পড়ত। কঠোর কিছু কোনো দিন বলেননি, বরং অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। তবু মনে হত — মনের দুর্বলতাগুলি দেখতে পাচ্ছেন, অথচ প্রকাশ করে বিব্রত করতে চান না। ....কিঙ্করদা পানাসক্ত ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য প্রায় ১৫/২০ বছরের ঘন পরিচিতি কালেও তাঁকে কোনদিন বেসামাল হতে দেখিনি। এমন ভদ্র শান্ত সমাহিত চরিত্র দুর্লভ।" ৪১ ফুট লম্বা ৭ ফুট চওড়া 'আগুনের জন্ম' বা 'Birth of Fire' নামে একটি মূর্তির কাজে হাত দেন রামঙ্কির ১৯৬৬ সাল নাগাদ। তাঁর ছাত্র শিল্পী কুণালকান্তি ছাড়াও আরও দুজন সহযোগী ছিলেন তাঁর সেকাজে। তাঁরা হরিদাস শর্মা ও অসিত দাসগুপ্ত। কুণালকান্তি সাহা বলেছেন, "কাজটা বেশ কিছু দূর এগোল কিন্তু শেষ হবার আগেই নগ্ন মূর্তির জন্য নানারকম মন্তব্য করতে লাগলেন কিছু লোক। কিঙ্করদা তখন আমাদের বলেছিলেন, 'যাঁরা বলছেন নগ্নমূর্তি তাঁরা কি জন্মবার সময় কাপড় পরে জন্মে ছিলেন ? আমিও পরে কাপড় পরাব।' কিন্তু মন্তব্য এমনি দানা বেঁধে ওঠে যে কাজটা আর শেষ করা গেল না।" এই ছিল শান্তিনিকেতনে রামকিঙ্করের কাজের পরিবেশ। সেখানে তিনি কতটা স্বস্তিতে কাজ করতে পেরেছেন সেটাই আজ ভাববার বিষয়। কেন পেলেন না বা কতটা সুষ্ঠভাবে পেরেছিলেন ? ভারতবর্ষের ইতিহাসে তিনি তো নূতন নন। রামকিঙ্কর বলতেন, — "সব কিছুর মধ্যেই সেক্স আছে, সেক্স ছাড়া সবকিছুই অসাড় প্রাণহীন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের মহান শিল্পীরা মনে রাখার মতো বিখ্যাত কাজ করে গেছেন। তাঁরা কোনরকম যৌন বিধিনিষেধ এবং মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন না। আমি শিল্পীর স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি।"

কলকাতার আধুনিক ভাস্কর্যের চেহারাটা কীরকম — একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ভাস্করকে দিয়ে দেখলে কেমন হয় — এই ভাবনায় একবার আনন্দবাজর পত্রিকা রামকিঙ্করকে সবিনয় নিবেদন রাখলেন। কিন্তু তিনি অরাজি। বললেন, "আমি কাউকে ছোট করতে চাই না।" তাঁরা বললেন, "আমরা শুধু আপনার অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে বুঝে নিতে চাই ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে কলকাতা ছোট হয়ে আছে কিনা। এরপরের ঘটনা। শহরের ছড়ানো মোট ২১টি মূর্তি তার পর্যবেক্ষণ। প্রথমেই দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর তৈরী গান্ধীজী মূর্তি। বললেন, 'হাটছেন না তো। মনে হচ্ছে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। স্টেপিং আছে। তবু হাঁটছেন না। ..... হয়নি। কী যেন হয়নি। এরপর রবীন্দ্রসদনে কার্তিক পালের করা রবীন্দ্র প্রতি মূর্তির কাছে। বলে উঠলেন, 'ভল্যুম বাড়িয়েছে খুব। শীতের দিনে কাজটা করা নাকি ? জোব্বাটা কম্বল হয়ে গেছে, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। ...না, মাথাটা, চুলের ট্রিটমেন্টটাও ঠিক হয়নি।' নাকের ক্ষেত্রে বললেন, 'ইকুলিয়ান নাক। ভাঁজটাও নেই। ডানহাতের কাপড়ের ফোল্ডগুলোও হয়নি। হাত। হ্যাঁ, আজানুলম্বিত বাহু। ভুল হয়েছে। সোজা করলে হাঁটু পেরিয়ে



যাবে। তাই না ? বেঁটে হয়েছে মূর্তিটা। এরপর একাডেমি অব ফাইন আর্টসের প্রাঙ্গণে। — সেখানে সেলিম মুন্সির রবীন্দ্রনাথের মূর্তি। মূর্তি দেখে মনে হচ্ছে যাত্রা দলের এ্যাকটর। হাঃ হাঃ হাঃ এর চেয়ে রবীন্দ্রসদনের কার্ত্তিক পালের একটু জ্ঞান আছে। চলো, চলো' — বললেন রামকিঙ্কর। এরপর রেড রোড। সুভাষচন্দ্রের কাছে। প্রদোষ দাশগুপ্তের কাজ। বললেন — "তবে দেবীদার ঐ গান্ধীজীর চেয়ে এটা ভাল। একসেপ্ট পিছনের ঐ রেনকোটটি, আদার ওয়াইজ অলরাইট।" তিলক, দেশবন্ধু ও ক্ষুদিরাম মন্দ লাগেনি এগুলি তাঁর চোখে। তবে তাপস দত্তের ক্ষুদিরামের হাতে বোমা দিলেই তিনি খুশি হতেন জানালেন। কারণ তাঁর মতে, "ক্ষুদিরাম মানেই তো বোমা। হাঃ হাঃ হাঃ।" এরপরে অশ্বারোহী মূর্তি নেতাজীর পাঁচমাথার মোড়ে। "এটা কি ? ঘোড়ার লেজ ? নেতাজীর নাম শুনেই ঘোড়ার লেজটা এমন খাড়া হয়ে গেছে নাকি ? ..... ঘোড়া যদি প্রবল জোরে ছোটে তাতে কি সুভাষবাবুর পক্ষে ঐ রকম রিলাক্সিং ভঙ্গীতে বসে থাকা-সম্ভব ? না কাজটা ভাল হয়নি হে। ক্যারিকেচার হয়েছে একটা।"

নেতাজীর পর আজাদ হিন্দ ও কলেজ স্কোয়ারে স্বামীজী, বাঘাযতীন, সূর্য সেন, পি. সি. রায়, বিদ্যাসাগর দেখে কোনো মন্তব্য করলেন না। বিবেকানন্দের বিষয়ে শুধু বললেন 'ভাল ভাল'। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের কাছে এসে তিনি খানিকটা খুশী হলেন। গোলপার্কের বিবেকানন্দের মূর্তির কাছে এসে অনেকক্ষণ তাঁর মুখে কথা নেই। বললেন, দাঁড়ানোর ভঙ্গীটার মধ্যে গোলমাল আছে। সামনের দিকে মাথার ঝোঁকটা বেশি। যেভাবে বুকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছেন সিংহের মত ভঙ্গী হবে কই সেটা। পিছনের সাপোর্টটার বিষয়ে বললেন, 'ভয় পেয়ে গিয়েছে, মূর্তিটা পড়ে যাবার ভয়। উইকনেস আরকি।" এরপর গোলপার্ক থেকে দেশপ্রিয় ও হাজরা লেন। উমা সিদ্ধান্তের যতীন দাস ভালো লাগল। হাজরা থেকে কার্জন পার্ক। দেবীপ্রসাদের সুরেন্দ্রনাথ ভালো লাগল। ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন — "খুব ভাল।" তারপর লেনিন। রাশিয়া থেকে পাঠানো মূর্তিটি। "এই তো কোনো সার্পোট নেই। চমৎকার দাঁড়িয়ে আছেন। ওভারকোটটা রাফ কাটে করা। কত সহজ হয়ে উড়ছে। পার্সোনালিটিও ফুটেছে বেশ।" লেনিনের পর স্যার আশুতোষ। দূর থেকে দেখলেন, শুধু একটি প্রশ্ন করলেন "অতবড় এডুকেশনিস্ট, তাঁর পায়ের তলায় বই ?" এরপর চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে রবীন্দ্রভারতীর দিকে। আবার রবীন্দ্রনাথ। "ভুরুটা দেখেছো ? বুশী। — রবীন্দ্রনাথের ও রকম বুশী ব্রাউ ছিলনা।" "পার্সোনালিটি ? আছে। চোখটার মধ্যে, তাকানোয় একটা ডেপথ আছে। খুব ভাল কাজ নয়। তবে ভাল।"

এর ঠিক কয়েকবছর পর তিনি একজনকে কথাপ্রসঙ্গে কলকাতার মূর্তি বিষয়ে বলেছেন, "প্রায় সব কটা মূর্তিই খুব হাস্যকর। তবু এইসব মূর্তি শহরে থাকবে। প্রচুর অর্থব্যয়ে তৈরী হয়েছে তো।' কলকাতায় রামকিঙ্করের গড়া কোনো মূর্তি নেই। (সম্প্রতি তাঁর একটি মূর্তি 'কলের বাঁশি'-র ব্রোঞ্জ কাস্টিং বসানো হয়েছে সল্টলেকে।) তাতে কলকাতার কিছু এসে যায় না। সেখানে কজন আর পাত্তা দেয় এই শিল্পীকে। বরাবরই প্রচণ্ড রকমের ব্রাত্য সেখানে।



তাঁর চিত্র ভাস্কর্য বিশ্লেষণের চাইতে চরিত্র হনন বা দূষণের দিকেই সেখানকার মনোযোগ বেশি। সুপরিকল্পিত ভাবে ঢাকঢোল পিটিয়ে তাই করা হচ্ছে। এসবই কি পূর্ববর্নিত ডঃ সুধীন ঘোষ ট্রাজেডি ও রামকিঙ্করের কলকাতার ভাস্কর্য বিষয়ক মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া?

বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর রামকিঙ্করের হাতে গড়া কোনো মূর্তি নেই তাঁর রাজ্যের রাজধানী কলকাতায়। কেন ? খুব বড় প্রশ্ন নয় কি ? তিনি কি রাজি ছিলেন না ? নাকি তাঁকে দিয়ে বানানো খুব ব্যয় সাপেক্ষ ছিল? এ ব্যাপারে রামকিঙ্কর কি বলেছেন জানা যাক। তিনি বলেছেন, "কেন করব না। তবে মন্ত্রী সভা-টভা থাকবে না পিছনে। টেণ্ডার ফেণ্ডার মাতব্বরি নয়। তোমরা থাকবে। কাজ করবো। খানিকটা খোলা জায়গা দাও। পয়সা না থাকে চুন সুরকি সিমেন্ট তো দিতে পারবে। তাতেই হয়ে যাবে। করবো একটা কাজ। বড় রকমের।" না দেয়নি কলকাতা। কি করে দেবে। দিলে এক সূর্যের কাছে অনেক তারারা ম্লান হয়ে যাবে বলে ? নাকি আরও বড় কিছু ? দুঃখের কথা যে হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেস্ট-এর কাছে বালাতন হ্রদের তীরে স্থাপন করা তাঁর তৈরী ব্রোঞ্জের রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তিটি বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী শ্রী যতীন চক্রবর্তী মহাশয় মন্তব্য করেছিলেন — ঐ মূর্তি রবীন্দ্রনাথের অবমাননা ছাড়া কিছু নয়। ঐ মূর্তিটি সরিয়ে নাম করা কোন ভাস্করকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত মূর্তি তৈরী করে বুদাপেস্টে-এ পাঠানোর জন্য পূর্তমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করলে তিনিও রাজী হয়ে যান। এ নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয়। তবে মূর্তি সরানো সম্ভব হয়নি।

এখন রামকিঙ্কর তো কলকাতার মূর্তিগুলির উপর মন্তব্য রাখলেন এবং সে সংবাদ সবিস্তারে বেরুল আনন্দবাজার পত্রিকায়। এখানে উল্লেখ্য ঐ মূর্তি পরিদর্শনে রামকিঙ্করের সাথী যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন বিশিষ্ট শিল্পী ও সাহিত্যিক পূর্ণেন্দু পত্রী ও বিশিষ্ট সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী। এই ঘটনাটি হয়েছিল ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে। তো সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর কী হয়েছিল শিল্পী শুভাপ্রসন্নের লেখনী থেকেই জানা যাক্। তিনি লিখেছেন, "এ জাতীয় কাজ রামকিঙ্করের স্বভাব বিরুদ্ধ। তাঁর সরল-দিলখোলা বাউল মনে, কোন ঝোঁকে মূর্তিগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করিয়ে নেওয়া হয়। লোকপ্রিয় পরিবেশনার জন্য সেগুলো ধরে রাখে চতুর সাংবাদিক। সেগুলি ঐ দৈনিক পত্রে বিবৃত হওয়ায় ক্ষুব্ধ হন অনেকেই। বিশেষভাবে মনে আছে প্রবীণ ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কথা। ঐ মন্তব্যে — তাঁর ক্ষোভ ও অভিমান জানিয়েছিলেন আমায় এবং যা তাঁকে আঘাত দিয়েছিল। এ ভূমিকায় শিল্পী রামকিঙ্করকে ব্যবহার করার প্রতিবাদে ঐ পত্রিকায় আমি দীর্ঘ প্রতিবাদ পত্র লিখি। তার প্রতিক্রিয়া সুদূর প্রসারী হয়।" এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। রামকিঙ্করের সেই সমালোচনা এতটাই ভুল ছিল বা 'কোন ঝোঁকে' বলে ফেলেছেন — তার বিচার হবে দূর ভবিষ্যতে। এখনই তাঁর মন্তব্যের বিষয়ে কারো কিছু বলা কতটা সঙ্গত সেটাও ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে বলে সহজেই মনে করা যায়। যাই হোক, সেই ঘটনার পর সারা কলকাতায় বহু বিশিষ্ট মানুষ যেখানে রামকিঙ্করের বিপক্ষে চলে গেলেন, সেখানে তিনি কি আর তথায় স্থান পেতে পারেন? সম্মান তো দূর অস্তই হয়ে গেল তারপর থেকে। শিল্পী শুভাপ্রসন্ন লিখেছেন — "১৯৭৯



সালের নভেম্বর মাসে কলকাতার এক প্রভাতী সংবাদ পত্রের একটি ছোট, সংবাদে বিচলিত হই এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঐ পত্রিকায় একটি ক্ষুদ্ধ পত্রে জনসাধারণে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অনুরোধ জানাই। সংবাদটি ছিল বুদাপেস্ট-এ রক্ষিত রামকিঙ্কর কৃত রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ আবক্ষ মূর্তিটির অপসারণ কল্পে তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রীর দৌত্য, যা আমাদের দেশ শিল্প ও শিল্পীকে জানার এক চূড়ান্ত হাস্যকর উদাহরণ। জীবন সায়াহ্নে, রোগ শয্যায় শায়িত শিল্পী রামকিঙ্করের কানে সে খবর পৌঁছায়। 'পছন্দ না হলে তুলে ফেলে দিক।' এই সব রাজনীতির মানুষের কথা বাদ দিয়ে সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে যখন দেখি সেই সংবাদের পক্ষেও আমার প্রতিবাদ পত্রের বিরুদ্ধে বিশিষ্ট রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ, প্রবীণা সাহিত্যিক থেকে শুরু করে বহু মানুষই রামকিঙ্কর কৃত ঐ মূর্তিটির বিষয়ে মন্ত্রীর দৌত্যকে সাধুবাদ জানায়। আমাদের সৌভাগ্য অবশেষে কিছু দায়িত্ব বোধ সম্পন্ন মানুষের প্রতিবাদে মন্ত্রী মহাশয় সেই কাজ থেকে বিরত হন।"



বিশ্বভারতী কলাভবনে গান্ধীজী ও তাঁর ভেঙে পড়া লাঠি। সৌজন্যে - আনন্দবাজার পত্রিকা।

হায় রামকিঙ্কর! তুমি যে এত দিয়েছ তা স্বীকার করতে আজ অধিকাংশের কাছেই যেন খুব বাধে। চারদিকে শুধু অকৃতজ্ঞতাই নয় কৃতঘ্নতাও আছে। তোমার জীবনী বিকৃত করে রমরমিয়ে নাটক চলছে কলকাতার বুকে। তোমার চরিত্র হনন করে দূষণ করে যা গল্প উপন্যাস লেখা হয়ে গেছে, একদিন দেখব কেউ চলচ্চিত্র ও বানিয়ে ফেলেছে। দেশবাসীর কাছে এটাই তোমার প্রাপ্তি ছিল হয়তো। বড় পুরস্কার! এ সবই কি তোমাকে ঘিরে পূর্ব উল্লিখিত যেসব ঘটনা তার প্রতিশোধ ? নইলে রামকিঙ্করের উপরে যতসব বিকৃত পচা জিনিস চাপিয়ে মানুষের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে কেন ? বিপন্ন রামকিঙ্কর আজ। কোথায় গেল তাঁর ছাত্র, ভক্ত বা অনুরাগীরা ? কোথাও তাঁদের কণ্ঠস্বর শোনা গেলেও বড়ই ক্ষীণ। হয়তো রামকিঙ্করের মতো লাঞ্ছিত হবার আশঙ্কা থেকেই। তবু যতই অরাজক হোক এই বর্তমান অবস্থা, দূর ভবিষ্যতের কাছে পরাভূত হতেই হবে একদিন অন্ধকারকে। আর রামকিঙ্কর উঠে আসবেন স্বমহিমায় বিজয়ীর শিরোপা মাথায় নিয়ে — এই আশা অবশ্যই রাখতে পারি আমরা। □

রামকিঙ্কর ঃ কিছু স্মৃতি

রতনপল্লী ঃ এই ছোট্ট নামটির মধ্যে একই সাথে এক অনির্বচনীয় রঙদার ও গম্ভীর এক আলাদা স্বাদ মেশানো আছে আমার স্মৃতির থলিতে। অর্থাৎ এর একটা দিক যেমন রামায়ণ ও মহাভারতের বর্ণময় রূপকথা পাশাপাশি অন্যদিকে গীতার সেই গাম্ভীর্য ও শুদ্ধতার এক ঝলক হাওয়া, হঠাৎ করে আমাকে কেমন যেন যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব ডিঙিয়ে একেবারে বয়ঃপ্রধান করে তোলে। গাম্ভীর্য ও শুদ্ধতার কথায় গীতাই টানলাম — কেননা রতনপল্লীর সেই খড়মাটির ঘরটিতে অগোছালো নানান বইপত্রের পাশে ছোট্ট গীতাই তো ছিল যা তিনি খেয়াল মাফিক চোখ বোলাতেন। আর তার অদূরেই



বিশ্বনাথ নন্দী, শিবপ্রসাদ বেইজ, রামকিঙ্কর, বাসুদেব চন্দ্র। আলোকচিত্র - রঞ্জিত মিশ্র।

বহু পুরনো নড়বড়ে তক্তপোশে সেই মহামানব বা দেবশিশু যাঁর লক্ষ্যস্থল ছিল অর্থ নয় খ্যাতি নয় আত্মসুখের কোনো নিরুপদ্রব নীড় নয় শুধুমাত্র শিল্প কিংবা তারও কেন্দ্রস্থলের ছোট্ট তারা বা নিউক্লিয়াসের দিকে। সেই অর্জুন চোখের কাছে স্থূল পৃথিবীটা ছিল নেহাৎ-ই উপেক্ষার বা পিছন ফেরানোর জিনিস। তাই বিকট মূর্তিতে বারবার ঝাঁপিয়ে পড়া নেকড়ে বা শেয়ালের দলকেও পঙ্গু করে দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন। ধ্যায়ানে নিবিষ্ট থেকে পৌঁছে গিয়েছিলেন তাঁর অভীষ্ট বিন্দুতে। আমার অশেষ সৌভাগ্য যে শিল্পের জন্যই শিল্প যার মর্মবাণী সেই বিশ্বকর্মার বরপুত্রকে দেখেছি। দেখেছি দিনের পর দিন খুব কাছ থেকে প্রতিটি মুহূর্তের তাঁর অমূল্য জীবন অতিবাহন। আমার তখন কতই বা বয়স। ওই ধরতে গেলে বাঁকুড়া যোগীপাড়া প্রাইমারী স্কুলে পড়ছিলাম বোধহয় ক্লাস 'টু' কিংবা 'থ্রি' তে। সংসারের লাগাতার অনটনের কথা দাদুকে প্রায়ই জানাতো বাবা। আসলে আমাদের জাতটাই তো দরিদ্র। আর এইসব গরীব পরিবারের কেউ একটু খেটেখুটে বড় হলে যা হয় আরকি। আত্মীয়স্বজনরা চারপাশ থেকে দাও দাও হাত পেতে দেয়। দাদুর ক্ষেত্রেও তাই-ই হয়েছিল। আর দাদু বাবাকে অর্থ সাহায্য ছাড়াও নানান উপায়ে অর্থরোজগারের পন্থা-পদ্ধতি বারবার চিঠিতে বাতলে যেতেন। তো একবার বোধহয় বিরক্ত হয়েই বাবাকে দাদু লিখেছিলেন 'তবে চলে আয় আমার আশ্রমে।' আর যেই না চিঠি পাওয়া বাবাও বাক্স-পেটরা গুছিয়ে পুরো ফ্যামিলি নিয়ে সটান রতনপল্লীতে।





দাদু রামকিঙ্কর স্বাক্ষরিত আমাকে দেওয়া আলোকচিত্র।

শান্তিনিকেতনের পিচ রাস্তাটা তখনও রতনপল্লী হয়ে ক্যানেল পর্যন্ত গড়ায়নি। রাস্তাটা যেন বলে দিচ্ছিল এরপরে রামকিঙ্করের এলাকা সুতরাং শহুরে কৃত্রিমতা ফেলে একটু গ্রাম্য হয়ে এসো। কমলবাবুর বাড়ী পর্যন্ত এসে তাই থমকে গিয়েছিল পিচরাস্তাটি। তো রতনপল্লীর সেই লালধুলো পায়ে মেখে যখন দাদুর বাড়িতে পৌঁছলাম তখন ভরদুপুর। চারদিকে ঠাঠা রোদ। প্রিয় ছাত্র শঙ্খ চৌধুরীর থাকতে দেওয়া একটি বিশাল মাপের মাটির বাড়ির একটি ছোট্ট কুঠরীর দরজার সামনের বারান্দায় একটি বহু পুরনো টেবিল, তার ঠিক পাশেই একটি উপর নিচে টায়ারমোড়া শান্তিনিকেতনী বাঁশের মোড়ায় বসে সামনের ফাঁকা জায়গার দিকে আনমনে তাকিয়ে মেরুদণ্ড সোজা দাদু নিঝুম হয়েছিলেন ধ্যানস্থ সন্ন্যাসীর মতো।

আমরা সদলে ঠিক সামনে দিয়ে দাঁড়াতে তিনি সম্বিত ফিরে পেলেন। তারপরে সে কী আকাশ ফাটানো হাসি। চলে এসেছিস হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। তবে এখানেই থেকে যা হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। এইসব বাবাকে লক্ষ্য করে বলছেন আর ওই রকম হাসছেন। আমিতো ব্যাপার দেখে থ। এমন হাসতে যে কোথাও কারোকে দেখিনি। তো বুঝলাম এই হল আমার অসাধারণ খেয়ালী শিল্পী দাদু। আমাদের প্রতি তাঁর সেদিনের সেই আবেগপ্রবণ আপ্যায়ণে আমার মন থেকে যাবতীয় সংকোচ বা ভয়ডর কোথায় গিয়ে যে লুকোল আর তা কোনদিনও দেখতে পাইনি।

'ফিক্‌ফিকে' দাদু নাম রেখেছিলেন আমার। কথায় কথায় খুব হাসতাম যে। আমাদের নিয়ে কী ঠাট্টাই না করতেন। বড়দি হয়ত বলেছে — খাবেক নাই, অমনি দাদুও নাকি সুরে বলতে আরম্ভ করেছেন — খাবেক নাই, খাবেক নাই। তারপর ধমক দিয়ে বলতেন — 'বল খাবে না খাবে না।' লজ্জা পেয়ে বড়দি ঘরে ঢুকে পড়ত। আসলে বাঁকুড়ার কথ্য ভাষাটা অজান্তেই তাঁর সামনে বেরিয়ে পড়ত যে। তো যাইহোক — আমিও প্রায় সমবয়সী মেজদি দাদুর খুব ন্যাওটা হয়ে পড়েছিলাম। দোকান থেকে কিছু আনতে বললে যেন ধন্য হয়ে যাই — এইরকম অবস্থা। রতনপল্লীর ঠিক দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বা শান্তিনিকেতনের 'সমবায় সমিতি' দোকান ঘরটির পিছনের দিকে যে স্টলগুলি ছিল, বর্তমানে সেসবের আমূল পরিবর্তন হয়েছে যে মনে হয় অন্য কোথাও এসে পড়েছি। সেখান থেকে দাদু তাঁর সিগারেট আনতে বলতেন। সিগারেটের নামটা বারবার বলে দিতেন। ঠিক করে উচ্চারণ করতে বলতেন। আমরা ভুলে যেতাম। আবার বলে দিতেন তথাপি কাগজে লিখে দিতেন না। আগে যে মাঠটিতে,



রবিঠাকুরের পৌষমেলা বসত সেখান থেকে গণেশ কিম্বা জগন্নাথকে ডেকে আনতে বলতেন। ওদের মধ্যে গণেশ ছিল দাদুর মাসিক বেতনের রিক্সাওয়ালা। দাদুর পরিচারিকা ছিল রাধারানী গড়াই। এই রাধারানী ছিলেন দাদুর মডেল ও পরে সহধর্মিনীর মতোনই। বাবা-মা আমাদের দিদিমা শিখিয়েছিলেন। আমাদের আগমন যে তাঁর কাছে সুখকর ছিলনা তা আমাদের ঐ কচি বয়সেও বেশ টের পেতাম। তবু তাঁর বাবুর আত্মীয়দের তো একেবারে ফেলেও সে দিতে পারে না। তাই ঐ রাধারাণী দিদিমা আমাদের থাকতে দিয়েছিল ঐ মাটির বাড়ির উত্তর ও দক্ষিণে যে টানা বারান্দাদ্বয় তার মাঝখানে উঁচু হলঘরের মত দুটি রুম ছিল সেখানে। আর দিদিমা থাকত উত্তর দিকে যে পূর্ব-পশ্চিম



মীনা, রামকিঙ্কর ও রাধারানী
সৌজন্যে - আনন্দবাজার পত্রিকা

বরাবর টানা বারান্দা তার পূর্ব দিকের ছোট্ট ঘরটিতে আর দাদু থাকতেন ঠিক বিপরীতে দক্ষিণ দিকে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর যে টানা বারান্দা তার পূর্ব অংশের ছোট্ট ঘরটিতে। দক্ষিণ দিকের বারান্দার পশ্চিম অংশে ছিল বাথরুম ও তার লাগোয়া পায়খানা ঘর। দাদুর জন্য আলাদা কমোড। একটি বড় চৌবাচ্চায় জল থাকত। দেবী নামে একজন পূর্ব দিকের সিমেন্টে বাঁধানো কুঁয়ো থেকে জল তুলে বাঁকে বয়ে ভরে দিয়ে যেত রোজ। বাথরুমের পাশে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর আরেকটি খড়ের চাল বিশিষ্ট মাটির দুই কক্ষের ঘর। এই ঘরটিতে ভাড়াটে বসিয়েছিল রাধারাণী দিদিমা। পশ্চিম দিকের এই ঘরটির পিছনে কয়েকটি বড় বড় আমগাছ ছিল, এছাড়া পেয়ারা গাছ ও সঙ্গে কিছু কুঁচ ফলের গাছও। আমরা কালবৈশাখীর ঝড়ে খুব আম কুড়োতাম। আর ঠিক তার কাছেই দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দাদুর অসমাপ্ত পাথরের দুটি মূর্তি ছিল শায়িত অবস্থায়। মূর্তি দুটোর চারপাশে উঁচু উঁচু ঘাস, লতা ও ঝিরকুণ্ডার জঙ্গল। মাঝে মধ্যে দাদু ছেনি হাতুড়ি নিয়ে অক্ষম হাতে খোদাই করতেন। এছাড়া ঝড় মূর্তিটির সামনেও এসে দাঁড়াতেন। অনেকক্ষণ কী ভাবতেন। তারপর চলে যেতেন। এই কাজটি শেষ করতে পারেন নি বলে তার অত্যন্ত মনোবেদনা ছিল। আমি ও মেজদি দাদুর মুখ্য বাড়িটির সামনে যে অনেকটা ফাঁকা জায়গা সেখানে কয়েকটি পেয়ারা গাছের তলায় খেলাধুলা করতাম। সেখানে একটা খড়ের স্তূপ বা গাদা ছিল। বর্ষাকালে ছাতু হত তার ওপর। ওগুলো নাকি পোয়াল ছাতু। সেসব রান্না হত। সবাই খেতাম। দাদুও খেতেন। ঐ ফাঁকা জায়গায় একসময় দাদু ধান গাছ লাগিয়েছিলেন লোক দিয়ে যেভাবে চাষ করা হয় সেইভাবে। সেসব আমরা দেখিনি। শুনেছি ধান হয়নি সে গাছে। তিনটি বড় সাইজের ধূসর পাথর ছিল। ঐ পাথর তিনি দিল্লী থেকে এনেছিলেন যক্ষ-যক্ষী মূর্তি নির্মাণের পর। এখনও আছে। ঐ পাথর



পেরিয়ে দক্ষিণদিকে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর মেহেদি গাছ ছিল যার পাতা বেটে মেয়েরা হাতে লাগায়, নানারকম নক্সার মত করে। এছাড়া সর গাছও ছিল প্রচুর। ঐ মেহেদি গাছ ও সর গাছগুলো বাউণ্ডারি ওয়ালের মত ছিল। আর ছিল চার-পাঁচটা ছোট মাঝারি সাইজের তালগাছ। কয়েকটা শিশু তালগাছও ছিল। এইসব গাছের মাঝ বরাবর বাইরে থেকে বাড়ির উঠোন অবধি যাওয়ার রাস্তা। পূর্ব দিকের বাঁধানো কুঁয়োটির ওপাশে তারের বেড়া ঘেরা হৃষিকেশ চন্দ মহাশয়ের ছিমছাম মাটির বাড়ি। নানানফুল পাতাবাহারও ফলের গাছে পরিপূর্ণ ও সাজানো বাড়িটি দেখতে বেশ মনোরম লাগত। ওই বাড়িতে বাগানের কাজের জন্য একজন আদিবাসী মেয়েছিল। নাম তার কলিমনি (?) বেশ পরিপাটি চেহারা ছিল তার। ও এপাশের কুঁয়োতে



রতনপল্লীর রামকিঙ্করের বাসগৃহে ভাস্কর্যের জন্য আনা তিনটি পাথরের মধ্যে আজও পড়ে থাকা একটি

জল নিতে আসত তারের বেড়ার মাঝখানের একটি দরজা দিয়ে এসে। হৃষিকেশবাবুর বাড়িতে চুরি করতে আসা এক চোরকে কাটারি ছুঁড়ে এমন মেরেছিল ওই কলিমনি যে পরের দিন দেখা যায় রক্ত বিন্দু ফোঁটা ফোঁটা ঐ উত্তরদিকের ক্যানেল পর্যন্ত মাটিতে পড়ে আছে।

আমার মাকে রাধারাণী দিদিমা বৌমা, বাবাকে দিবাকর আর দাদুকে বাবু সম্বোধন করত। ওঁর খুব সিনেমার নেশা ছিল। আমার বড়দির প্রতি একটু নেকনজর থাকায় ওকেই সঙ্গে নিত। আমি ও মেজদি যাওয়ার বায়না ধরতাম। মনে পড়ে দু'চারটে সিনেমা দেখেছি ঐ 'বিচিত্রা' হলে ওঁর সাথে। তখন বোলপুরে একটাই সিনেমা হল 'বিচিত্রা'। অনেক পরে 'চিত্রা' হলটি হয়েছে। হনুমানের বিকট আকার ধারণ ও বিরাট লাফ এছাড়া বুক চিরে রাম-সীতাকে দেখানোর দৃশ্য এখনও চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাই। আর এক মনে পড়ে কোনো এক শিবভক্ত রমণী আত্মহত্যার জন্য উঁচু পাহাড় থেকে লাফ দিল —আর নিচে শিব এসে তাকে লুফে নিলেন। ভুবনডাঙ্গায় রাধারাণী দিদিমার একটি দোতলা ও তার পাশেই আরেক একতলা বাড়ি বানানো ছাড়াও গোয়াল পাড়া ও দর্পশীলায় মোট চল্লিশ বিঘা মত ধান জমিও কিনেছিল। গোয়াল পাড়ায় রাধারাণীর নামে বিঘা দশেক ধান জমির দলিল এখনও নাকি সাধন পরামানিকের বাড়িতে আছে। আমাদের পাঠানো দাদুর চিটিতেও এই জমি কেনার কথা আছে। তো বাবা মাঝে মধ্যে খুব রাগরাগি করতেন বলতেন — "আমার কাকার টাকা সব লুটে পুটে খেয়ে নিল আর আমি ওর আপন ভাইপো অন্ধকারে পড়ে আছি।" রাধারাণী দিদিমাও তখন রেগে একেবারে লাল হয়ে যেত। আর মুখে বলত — "ডাকার করছে, এখানে বসে বসে ডাকার করছে যাও চলে যাও, তোমরা এখানে থাকতে পারবে না, আমরা খেতে দিতে পারব না।" দাদু তখন দু'পক্ষের মাঝে কি যে বলবেন। শুধু বলতেন



— "তোরা চুপ কর। চুপ কর। আমাকে শান্তিতে থাকতে দে। রাধারাণী দিদিমা জানত যে বাবু ওকে ছাড়া থাকতে পারবে না। তাই দাদুকে বলত — 'ওদেরকে তুমি বিদেয় কর, নইলে আমিই চলে যাব ভুবনডাঙ্গায়।' তারপর একদিন সত্য সত্যই চলে গেল সেখানে। আর আসার নাম নাই। তখন দাদু যেন কেমন উতলা হয়ে উঠতেন। বলতেন — "দিবাকর তুই যা রাধারাণীকে নিআয়, রাধারাণীকে নিআয়। আমার মা বলতেন — "কেন, আমরা তো আছি, আপনি কি সেবাযত্ন পাচ্ছেন না ঠিকমত।" কিন্তু দাদুর সেই এক কথা "রাধারাণীকে নিআয়"। বাবা অগত্যা রাধারাণী দিদিমার বাড়ি গিয়ে হাতে ধরে রতনপল্লীতে আসার জন্য বলে আসতেন। তারপরে ও এলে দাদু অত্যন্ত স্বস্তিলাভ ও উচ্ছসিত হয়ে উঠতেন। রাধারাণীর প্রতি এমনই টানছিল তাঁর। তো রাধারাণী দিদিমা দাদুর এই দুর্বলতা বুঝতে পারে এবং কাজে লাগাতে শুরু করল। ওঁর পরামর্শ দাতাও তো কিছু কম ছিল না। তো সে যাইহোক — এখন একটু আগের কথায় ফিরে আসা যাক। নিমাই নামে ২৫/২৬ বয়সের একটি ছেলে সম্ভবত অনাথ, ফাই ফরমাশ খাটার জন্য ছিল। রধারাণী দিদিমা সম্ভবত দয়া পরবশ হয়ে রেখেছিলেন তাকে। ও আমাদের ক্যানেলে নিয়ে যেত স্নানে। তখন ঐ বড় ক্যানেলটিই ছিল। আর ওপাশে ফাঁকা উঁচু নিচু ডিহি ছাড়িয়ে দূরে সাঁওতাল পল্লীগুলি। সেখান থেকে ক্যানেল পেরিয়ে আদিবাসী মেয়ে পুরুষরা কাজের জন্য দলে দলে রতনপল্লী হয়ে শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ত। বিকেলে ফিরত গান গাইতে গাইতে। দুপুরের স্নান সেরে বাড়ি ফিরে দেখতাম দাদু খেতে বসেছেন। দু-তিনটে বেড়ালও পাতের কাছেই বসে। ওরা দাদুর দেওয়ার অপেক্ষায় প্রায়ই থাকত না। যে যেমন পারত পাত থেকে তুলে নিত। প্রথম প্রথম অবাক হতাম। তাড়াতে গেছি — উনি মানা করতেন। ক্রমশঃ ঐ দৃশ্য আমাদের কাছে স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল। দু-তিনটে কুকুরও আসত ঠিক খাবার সময়েই। দাদুর ছুঁড়ে দেওয়া খাবারে ওদেরও উদর পূর্তি হত। একটি ঘেয়ো কুকুরকে জলের মত একটি ওষুধ শিশি থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতেন ওর গায়ে। বারান্দায় একটি ইজেল খাটানো ছিল। কখনো বা একটি তক্তাকে খাঁড়া দাড় করিয়েও ইজেল হিসেবে ব্যবহার করেছেন তিনি। সেখানে ক্যানভাস ঠুকে ছবি আঁকতেন। মোট তিনটি ছবি আঁকতে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। চাষী দূরে মাঠে লাঙ্গল দিচ্ছে টুপি মাথায়। চাষী বউ খাবার নিয়ে যাচ্ছে ওর জন্য। পথে এক ক্ষুধার্ত মানুষ শায়িত অবস্থায় হাত বাড়িয়েছে তার দিকে। আর অন্য দুটি ছবি ছিল কি রকম ঠিক আজ মনে করতে পারি না।

অনেকদিন ধরে ছবি গুলো তিনি আঁকতেন। কখনো বা রঙের পর রঙ চাপিয়ে আবার চেঁছে ফেলে দিতেন। পরের দুটো ছবি বুঝতে না পারার কারণ বিস্মৃতির দিকে চলে গেলেও প্রথম ছবিটি এখনও চোখের সামনে বেশ স্পষ্টই এসে দাঁড়ায়। যেমন দাঁড়ায় দেবী নামে সেই ভারী (জলবাহক) এবং রিক্সাওয়ালা গণেশ। এই সেদিনও তো দেখলাম, রিক্সা নিয়ে শান্তিনিকেতনের পথে। বুড়ো হয়েছে চোখে তাই চশমা উঠেছে তাঁর। গণেশ ছাড়া আর একজন বিকল্প রিক্সাওয়ালা ছিল দাদুর — সে জগন্নাথ। ওকেও আর ঠিক মনে পড়ে না।



আমরা অর্থাৎ আমি ও মেজদি পুরনো মেলার মাঠের কাছাকাছি গিয়ে হাত নাড়ালেই ওদের একজন চলে আসত। আজও চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে দাদুকে ঘিরে এইসব নানান স্মৃতি। সেই সত্যবাবুর মশলার দোকান। যেখানে দাদুর সারা মাসের কেনাকাটা। রতনপল্লী থেকে শান্তিনিকেতন ছাড়িয়ে ভুবনডাঙ্গায় সত্যবাবুর দোকান। তারপর সেখান থেকে বোলপুরের সবজি বাজার এবং দাদুর জন্য পানীয়। এসবের জন্য দুটো রিক্সাই ছুটতো। একটাতে দাদুও রাধারাণী দিদিমা। আর অন্যটাতে বাবা, আমি ও আমার দিদি। দাদুর তক্তপোশের নিচে একটি বোতল থাকত। রাধারানী দিদিমা একটিকে তিনটি করে রাখত। অনেকক্ষণ পর পর একটু গলা ভিজিয়ে নিতেন দাদু।

খুব সুন্দর সুন্দর সেন্টের ধূপকাটি কেনা হত ভুবনডাঙ্গার সত্যবাবুর দোকান থেকে। সেসব সেন্ট পথে ঘাটে কোথাও নাকে এলে স্মৃতির ক্যানভাসে এখনও রতনপল্লীর সেসব পুরনো ছবি নিখুঁত ভাবে ফুটে ওঠে। খুব রোমাঞ্চ লাগে। আবার মন ভারীও হয়, ভাবি আবার যদি ফিরে পেতাম সেই রাত্তির। যেখানে দাদুকে ঘিরে আমরা — বাবা, মা ও ভাইবোনেরা। একটু দূরে হ্যারিকেন জ্বলা। বাইরে জমাট অন্ধকার। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। রাধারাণী দিদিমা মাঝে মধ্যে এসে এসে জিজ্ঞাসা করছে যে দাদু এখন খাবে কিনা। উনি হাত নেড়ে 'না' বলে আবার আমাদের গল্প বলায় মেতে উঠছেন। ভরপুর আবেগে তিনি একটি পাখিদের চড়ুইভাতির গল্প শোনাচ্ছেন আমাদের। গল্প বলার মাঝেমাঝে তাঁর সেই আকাশ ফাটানো বিখ্যাত হাসি। যা রাতের সে নীরবতা ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছিল। আরও মনে পড়ে বর্ষার সে রাতগুলো, যখন ঘরময় জল পড়ছে। আমরা রাত জেগে শুধু বিছানাগুলো এদিক আর ওদিক করেছি। ওদিকে দাদুর মশারির ওপরে বিছানো দামী ওয়েল পেন্টিংগুলো, যা ফুটো চাল বেয়ে বর্ষার জল আটকানোর জন্য। ঋত্বিক ঘটকের তথ্যচিত্রেও দাদু বলেছেন সেকথা। এ দৃশ্য তো আমারও দেখা। স্বল্প শিক্ষিত বাবা সেদিন দাদুর ওয়েল পেন্টিংগুলোর মর্ম বোঝেন নি। যেমন বোঝেননি সেসময়ের অনেকেই।

একবার দাদুকে একটি পত্রিকার প্রচ্ছদ করতে দেখেছিলাম। একটি নাম 'উদাচি'। নীল রঙে নামটি লিখে টকটকে লাল রঙে ওর চারদিক এমন বেঁধে দিলেন যা দেখে আমার সেই বালক বেলাকার চোখেও বেশ দাগ কেটেছিল মনে পড়ে। পরে জেনেছি ঐ পত্রিকার সম্পাদক আমাদের এই বাঁকুড়ারই মানুষ। 'SPAN' নামে একটি পত্রিকা আসত। দাদু বলতেন যে ওটি বিদেশী পত্রিকা। আমরা ওর ঝা-চকচকে ও মসৃণ পাতাগুলো অবাক চোখে উল্টে যেতাম।

রাধারাণী দিদিমার একটি ভিক্ষে ছেলে ছিল। নাম বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। ওঁর বাড়ি বীরভূমের শেয়ালা গ্রামে। উনি মাঝে মধ্যে আসতেন। পরে দাদুর বাড়িতে পরিবার নিয়ে থেকে গেলেন। রাধারাণী দিদিমা পরে ওদের ভুবনডাঙ্গায় একটি দোতলা বাড়ি করে দেন। এছাড়া আর একজনকেও তিনি একটি বাড়ি করে দেন ঐ বাড়িটির পাশেই। একতলা। তিনি অবনী অধিকারী। এখন তিনিও তাঁর ফ্যামিলি নিয়ে ওখানে বসবাস করছেন (সম্প্রতি বিশ্বনাথ



চক্রবর্তী ও অবনী অধিকারী মারা গেছেন)। আমার বাবা বিশ্বভারতীতে একটা অতিসাধারণ কাজের আশা নিয়েই ওখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরে বাবার চৈতন্যদয় হয় দাদুর ক্ষমতা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে। সে যাই হোক প্রায় দুই বৎসরকাল অতিবাহিত হওয়ার পরে ক্রমশঃ রাধারাণী দিদিমার চোখের বিষ হয়ে উঠছিলাম আমরা। দাদুকে সে বরাবরের জন্য ছেড়ে চলে যাবার ভয় দেখাতে লাগল। দাদুর প্রতি রাধারাণী দিদিমার কি ভালবাসা বা মমত্ব ছিল তা চাক্ষুস দেখা কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে... সে বিচারে আর যাচ্ছি না তবে দাদুর যে ওর প্রতি সীমাহীন টান ছিল তা বহু ঘটনার উল্লেখ করে এখানে খুব সহজেই প্রতিষ্ঠিত করা যায়। যেমন প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাঁর বহু বিষয়েরই সীমাহীনতা। বলাবাহুল্য কি ভাস্কর্য, কি ছবি, কি সুরের সমঝদায়িত্বে। কি মঞ্চ সজ্জায়, নাট্য পরিচালনায়, কি সততায়, চারিত্রিক দৃঢ়তায়, কি পরিশ্রমে, নম্রতায়, সহিষ্ণুতায় এবং সর্বোপরি কি ত্যাগে —এই সব ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন একেবারে সিদ্ধ পুরুষ। শিল্পের জন্য তিনি যে তাঁর যাবতীয় সুখ স্বাচ্ছন্দকে অবলীলায় বিসর্জন দিয়েছিলেন, বলতে গেলে এমন মহান ত্যাগ পৃথিবীতে বিরল। আর তাই তিনি খুব সহজেই তাঁর রক্তের সম্পর্ক আপন ভাইপো দিবাকরকে বলেছিলেন, 'দিবাকর তুই বাড়ি চলে যা। তুই থাকলে রাধারাণী থাকবে না বলছে। তুই চলে যা, তুই চলে যা।' অগত্যা দাদুর এই কাতর সংলাপে আর কালবিলম্ব না করে বাবাও বাক্স পেটরা গুছিয়ে আবার বাঁকুড়ায়। বাঁকুড়াতে প্রায়ই আসতেন দাদু। আমি অবাক বিস্ময়ে তালপাতার টুপি মাথায় সেই দীপ্তিমান অনন্য সাধারণ মানুষটার বলিষ্ঠ পদক্ষেপে চুরুট টানতে টানতে আমাদের বাড়ীর সামনেই যে বিরাট পুকুর লাটবাঁধ — তাঁর উত্তর পাড় ধরে হেঁটে আসা দেখতাম। রবি পালের 'অনন্য রামকিঙ্কর' বইটিতে এমনই এক দীপ্ত চলার ভঙ্গি ধরা আছে দেখতে পাই। দাদু যখনই আসতেন খবর পেয়ে দোলতলার বাসুদেব চন্দ্রও আসত। বাসুদার বাড়িটা লাটবাঁধের পূর্ব পাড়ে। আর আমরা পশ্চিম। খবর দিতেন বাবা আরও দু'জনকে — তাঁরা দাদুর ঘনিষ্ট বন্ধু অতুল চন্দ্র কুচলান ও বিশ্বনাথ নন্দী। ওঁরা বাবার আর্থিক দূরাবস্থার কথা দাদুকে শোনাতেন, কিছু সুরাহার জন্য বলতেন। দাদু বলতেন — "দিবাকর ঠিক আছে, দিবাকর ঠিক আছে।" "না ঠিক নাই, তুমি একটু দেখ" একথার উত্তরে তিনি আবারও বলতেন — "ঠিক আছে, ঠিক আছে, দিবাকর ঠিক আছে।" বাসুদা ক্যামেরা আনতেন আর পটাপট ছবি তুলতেন। একবার আমি ও মেজদি পুকুরের দিকে যাচ্ছি দাদু ডাকলেন। দাঁড়াতে বললেন ওঁর পাশে। ওই অবস্থায় ক্যামেরার ক্লিক হল বাসুদার। সে ফটো আছে বাসুদার কাছে। এছাড়া আরও একটি ফটো — যেখানে দাদুর পাশে আমাদের পরিবারের সবাই। মনে পড়ে বাসুদার ক্যামেরার আলোর ঝলকে চোখ বন্ধ করেছিলাম আমি। সে ফটোও সযত্নে রাখা বাসুদেবদার কাছে। আমাদের বর্ত্তমান একতলা দালানবাড়ী ও কয়লা ডিপোর মাঝখানে যে অঞ্চলটি —সেখানেই ছিল প্রায় পনের ফুট উঁচু টালি দিয়ে ছাওয়া মাটির বাড়ি। তারই বারান্দায় বসে দাদুর ছবি আঁকা, গল্পগুজন ইত্যাদি চলত। ঐ বারান্দায় উত্তর দিকে ছিল একটি তালগাছ। ঐ তালগাছ কেটেই বারান্দার জন্য টালি বসানোর কাঠের পাটাতনগুলি করা হয়েছিল। বাসুদেব-দার



তোলা ফটোতে ওর গুঁড়ির চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। দাদু এলেই শহর ভেঙে বহু কৌতুহলী মানুষের ভিড় জমে যেত। একবার সাহিত্যিক সমরেশ বসু এসেছিলেন দাদুর সাথে তাঁর 'দেখি নাই ফিরে' লেখাটির প্রয়োজনে। তিনি রাত্রি যাপন করেছিলেন পাড়ার এক প্রতিবেশীর বাড়িতে। সে কী অটোগ্রাফ নেওয়ার হুড়োহুড়ি তাঁর কাছ থেকে। আর পাশেই বসা দাদু দিচ্ছেন ছবি এঁকে। কারোকে সূর্যমুখী, কারোকে বেড়াল, আবার কারোকে বা হাঁস। তবে সূর্যমুখীই বেশী। একজন আমারই বয়সী কিশোরী তাঁর খাতা এগিয়ে দিয়েছিলো তাঁর দিকে। তিনি তাকেই আঁকলেন। সে ছবি ঐ কিশোরী আমাকেই দিয়ে দেয়। এখনও আছে। সমরেশ বসুর একটি অটোগ্রাফ আমিও নিয়েছিলাম। তা কোথায় হারিয়ে গেছে। তবে তাঁর দেওয়া তিনটি ইনল্যাণ্ড লেটার এখনও আছে। এ চিঠিতে বাবা দিবাকর বেইজকে তাঁর অনেক প্রশ্ন — রামকিঙ্কর বেইজের সম্বন্ধে। তো এইরকম অনেক ঘটনাই যে উঁকি ঝুঁকি মারে যখন কিছু লিখতে চেষ্টা করি তাঁর সম্পর্কে। তার মধ্যে আর এক বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা হল, ঐ মাটির বারান্দায় বসে তাঁর এক মূর্তি গড়া। একবার তিনি এসেছিলেন সরস্বতী পুজোর ঠিক আগের সময়টিতে। তখন আমাদের ছুতোর অধ্যুষিত যোগী পাড়াতে সরস্বতী প্রতিমা গড়ার কাজ পুরো দমে চলছে। নির্মাণের প্রায় শেষ পর্ব তখন। দাদু সেসব প্রতিমা আসার পথেই দেখে এসেছেন। এসেই বল্লেন — "ওগুলো সরস্বতীই হয়নি।' একথা তিনি দেখলাম অনেককেই বললেন। আমি তখন বোধহয় ক্লাস ফাইভ কিম্বা সিক্সে পড়ি। দাদুর ঐ কথা আমাকে খুব নাড়া দিল। এত সুন্দর সুন্দর প্রতিমা, অথচ দাদু বলে দিলেন হয়নি। ঠিক আছে তবে বলেই দেখিনা, তিনি যদি এখানে একটা সরস্বতী গড়েন। যেই ভাবা অমনি বলেও ফেললাম। দাদুও রাজি। বললেন — নিআয় মাটি, করব একটা সরস্বতী। আমি একটা বড় থলি নিয়ে তখনই ছুটলাম গন্ধেশ্বরী নদীতে। নিয়ে এলাম মাটি যেখানে প্রতিমা নির্মাতারা মাটি নেয় সেখান থেকে। তারপর দাদুর নির্দেশমত শনের কুচি মিশিয়ে দমাদ্দম কাঠের হাতুড়ির ঘা মেরে তৈরী করলাম মাটি। এবার সরস্বতী নির্মাণে হাত লাগালেন দাদু। সম্ভবতঃ পরের দিনেই তিনি মূর্তি গড়ায় বসেন মনে পড়ে। তো তাঁর দু'হাত দিয়ে প্রথমে অনেকটা মাটিকে



দাদুর তৈরী সরস্বতী যা আমাকে দিয়েছিলেন। আজও রয়েছে।

চেপ্টে-চুপ্টে একটা মূল অবয়বে দাঁড় করানো, পরে দু'হাত দিয়ে অন্য মাটি নিয়ে আঙ্গুলের মত রোল করে হাত ও পা করা এবং বীণা। পরে ছোট ছোট গোল বল করে চোখ ও স্তন। এরপর বেদীর গায়ে একটা হাঁস। শেষে বেদীর অন্য পাশে সরু কাঠি দিয়ে নিজের নামটা লিখে শেষ করলেন তাঁর নির্মাণ কার্য ঐ মোটামুটি আধঘন্টার মধ্যেই। আমার চোখতো তখন ছানাবড়া। এ আবার কিরকম সরস্বতী। এতদিনের দেখা সরস্বতীর সাথে যে মেলেই



না। তবে মনে হয়েছিল মূর্তিটার মধ্যে কেমন এক গভীরতর ভাব। আর কিছু ভাবিনি সেদিন। পরে অনেক লোকজন খবর পেয়ে এসেছিলেন দেখতে। দেখলাম সবাই নির্বাক — কেউ বিস্ময়ে, কেউ উপলব্ধিতে। মূর্তিটি এখনও রয়ে গেছে আমার কাছে। তো যাক বাঁকুড়ার কথা আবার রতনপল্লীর দাদুর কথায় ফিরে আসা যাক। রতনপল্লী থেকে বাঁকুড়ায় পরিবার নিয়ে বাবার চলে আসার পরে, বাবার সাথে ও একা কতোবার রতনপল্লীতে গেছি। রতনপল্লীর পর দাদুর এণ্ড্রুজপল্লীতে বসবাসকালীন সেখানেও কতোবার। মনে পড়ে দাদুর নিজের হাতে দেওয়া কয়েকটি ফটো। একটি বাতিদান। একটি সুজাতা এবং আরেকটি তাঁর নিজের ফটো। তাঁর ফটোতে তিনি দুপাশে কালো পেন দিয়ে আড়াআড়ি দাগ টানলেন তারপর নিচে নাম সই করে আমার হাতে দিলেন। দাদুর অনুগত এক ছাত্র রবিপাল আসতেন। তারপর থেকে বাবার সাথে ও একা কতোবার রতনপল্লীতে গেছি। রতনপল্লীর পর এণ্ড্রুজপল্লীর কুড়ি নাম্বার কোয়ার্টারেও কতো কতো বার।

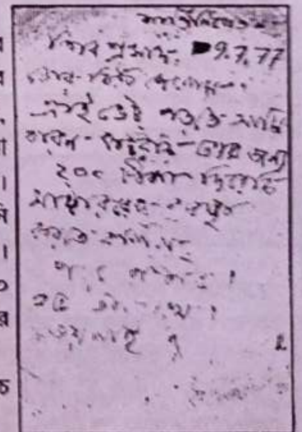
রবি পাল আমাদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আমাকে ও মেজদিকে পাঠভবনে ভর্তির ব্যাপারে দাদুর সাথে আলোচনা করতেও দেখেছি। একবার সঙ্গীত ভবনের এক ছাত্রী দাদুকে গান শুনিয়েছিলেন। কী অপূর্ব সে গলা। গানটি ছিল, 'যদি বারণ কর তবে গাহিব না। যদি শরম লাগে মুখে চাহিব না'। তিনি কি মোহর? আমরা দু-ভাইবোন তার কয়েকটা লাইন নিজের মনে গাইতাম। অবশ্য 'বিরলের মালা গাঁথা'র জায়গায় বিড়ালের মালা গাঁথা শুনেছিলাম সেদিন। আর দাদুর দেখাদেখি ছবিও আঁকতাম, মেঝেতে, দেয়ালে, খাতার পাতায়। দাদু খুশি হতেন। বলতেন 'ভূত হোক কি প্রেত হোক — এঁকে যা।' এখনও আঁকি — তবে আঁকাটা আমার আর হোল না। কলাভবনে পরীক্ষা দিয়েছিলাম। আঁকায় উত্তীর্ণ হলেও ভাইবাতে আটকে গেলাম। তো ভেবেচিন্তে আর নেক্সট বসিনি। তবে অবস্থার বিপাকে পড়ে ঐ কলাভবনেই ছাত্রদের জন্য মাটি মাখার কাজ করেছি। টানা চারঘণ্টা ডেলি লেবারের। এছাড়া ঠায় দীর্ঘক্ষণ বসে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের জন্য মডেলের কাজ করতে হয়েছে। কি অবস্থায় পরে মানুষ এসব করে তা ভুক্তভোগী অবশ্যই জানেন। রামকিঙ্করের নাতি হিসেবে এটাই ছিল আমার প্রাপ্য। আর একটা কথা না বলে পারছি না — কলাভবনের এক অধ্যক্ষ আমাকে বলেছিলেন শান্তিনিকেতনে কেন কলকাতায় যাও। আমার ফাইন আর্টস পড়ার ব্যাপারে। এর অনেক পর বিশ্বভারতীতে আমি যেকোনো একটি চাকরীর আবেদন করেছিলাম। তাতে কোনো ফল হয়নি। উত্তর এসেছিল সেই 'না'। 'না' শব্দটি আমার জীবনে এখনও বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। তা যাক এখন দাদুর পছন্দের খাবারের ব্যাপারে আসি। তিনি সকালে খেতেন চা পাউরুটি। কখনো বা মুড়ি গুঁড়ো করে অল্প জলে ভিজিয়ে দেওয়া হত। মাঝে মধ্যে আঙুর বেদানা বা কয়েক কোয়া লেবু খেতেন। আর দুপুরে খাঁটি বাঙালি খাবার ভাত, ডাল, মাছ এবং কখনো মাংসের জুস। বিকেলে কোনো কোনো দিন ছানা দিলে খেতেন। আর রাত্রে রুটি তরকারি কিম্বা গরম ভাত। খাওয়ার জন্য দাদুর দু-পাটি বাঁধানো দাঁত ছিলো। রাত্রে নিয়ম মতো সেগুলো জলে ফেলে রাখতেন। রাধারাণী দিদিমার একজন ধর্ম মা ছিল। বাড়ি বীরভূমেরই মজুরহাটিতে। ওকে সবাই লালদিদি ডাকত। সম্ভবতঃ ওর গায়ের রঙটির কারণে।



সেও এসে থেকে গেল। ফলে আমরা ক্রমশঃ কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলাম। তবুও বাবা শেষ বয়সের দাদুকে ফেলে চলে আসার কথা কখনো ভাবতেন না যদি না দাদু তাঁর অসুবিধার কথা বারবার জানাতেন। আমরা চলে এলাম বাঁকুড়ায়। আর সেই দুবছরের স্মৃতিও চলে এল আমাদের পিছে পিছে। এখনও দেখতে পাই মোড়ার উপর ঝিমিয়ে থাকা, বুঁদ হয়ে থাকা দাদু রাত্তিরে কেমন যেন একটা তেজ পেয়ে যেতেন। তখন উদাত্ত স্বরে রতনপল্লীর আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে গান ধরতেন। এখনও হয়ত খুঁজলে এর বহু সাক্ষী পাওয়া যেতেও পারে। গান ধরতেন ঝরঝর বরিষণে বহুযুগের ওপার... এছাড়া ঘর করিলাম বাহির সহিরে। বাহির করিলাম ঘর। পর করিলাম আপন বন্ধু। আপন করিলাম পর। আবার কখনও অর্দ্র গলায় খাদের সুরে গাইতেন — ও নিদারুণ অকরুণায় সাথেরে। পিরিতি করিলাম না বুঝিয়া।

তখন হ্যারিকেনের টিমটিমে আলোয় চারপাশের পরিবেশটা যেন আরো থমথমে ও অশ্রুপ্লাবিত বলে মনে হত। মনে হত মূর্তিমান রাত যেন সমব্যথী হয়ে রামকিঙ্করের ঠিক পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। কে যে কার চেয়ে গভীর দুঃখে দুখী বোঝাই যেত না।

রাত্তিরে দাদু শুয়ে পড়ার পর বাবা তাঁর গল্পের ঝুলি নিয়ে বসতেন। এসব হোত বিশেষ করে যখন দাদুর ভাগ্নের ছেলে ও তাঁর স্ত্রী পুত্র-কন্যারা আসত। এ আসরে মনোমালিন্য ভুলে যোগ দিত রাধারাণী দিদিমা সহ তাঁর ধর্মমা, ধর্ম ছেলে, ছেলের বউ সবাই। কারন গল্পগুলি ছিল খুবই চিত্তাকর্ষক। যেহেতু রোমাঞ্চ রহস্য ও রোমান্টিকতায় ভরপুর ছিল সেগুলি। আর বাবাও এত জীবন্তভাবে উপস্থাপিত করতে পারত যে মনে হত সেসব চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আসলে বাবাও বাঁকুড়ায় বহু নাটক ও থিয়েটারে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। সে সব গল্পতো ছিলই এছাড়া বিখ্যাত বহু লেখকের গল্প-উপন্যাসই ছিল বাবার পড়া। এমনকি কালী প্রসন্নের মহাভারত ও আরব্য উপন্যাসও বাদ যায়নি। মাটির মূর্তি গড়ে বিক্রি করা ও ছবি আঁকা, কাঠ খোদাই — ইত্যাদিতে বাবা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সেসবের প্রমাণ এখনও বাড়িতে রয়ে গেছে কিছু।



এখন আসা যাক আমাকে ও বাবাকে লেখা দাদুর কিছু চিঠির কথায় — যেখানে তিনি আমার পড়াশোনার ব্যাপারে খোঁজ খবর নিচ্ছেন, বাবাকে উৎসাহ দিচ্ছেন, টাকা পাঠাবার প্রতিশ্রুতি ও অভয় দিচ্ছেন ইত্যাদি। কখনো বা হাতের কাজ শেখাবারও নির্দেশ দিতে তিনি ভোলেননি। ৯/৭/৭৭ তারিখের একটি চিঠিতে রতনপল্লীতে তিনি থাকাকালীন লিখেছেন, 'শিবপ্রসাদ, তোর চিঠি পেলেম। প্রাইভেট পড়তে আমি বারণ করেছি — তার জন্য ২০০ টাকা দিয়েচি। মাস্টারের ব্যবস্থা করতে বলিস। পরে পাঠাব। ২৫ তারিখে। ভয় নাই। ইতি 'রা'।

আগেই লিখেছি যে, দাদু আমার স্কুলের যাবতীয় খরচ



পাঠাতেন। অন্তত একটা ছেলেকে পড়ানোর ব্যাপারে বাবাকে বারবার চিঠিতে উৎসাহ দিতেন। তার সাথে বিভিন্ন হাতের কাজ শেখানো —ইত্যাদিরও উপদেশ নির্দেশ করতেন।

একবার তিনি কাঠের প্যাঁচা করার কথা লিখলেন। তো বাবাও দাদুর উপদেশ শিরোধার্য করে বেশ কিছু প্যাঁচা করেছিলেন। বিক্রি হয়েছিল সামান্যই দাদুকে সেকথা জানানো হলে তিনি বেজায় খুশি।

তিনি ২৫/৫/৭৫ তারিখে পোষ্টকার্ডে বাবাকে লিখলেন 'তোমার চিঠি পেলাম। পেঁচা করেছিলে জেনে ভালো লাগল। এই সময় শিবুর হাতটায় খড়ি দিবে। বাটালি হাতুড়ির হাতেখড়ি। আর নিজের রোজগারের ঝোঁক শিখবে। ভার্নিস করেছিলে ত? ভার্নিস করলে লোকে পছন্দ করবে। প্রতিমাতে যেমন সাগুর পর কোপাল ভার্নিস।' এরপর তিনি অন্য কথা লিখেছেন যে 'কবছরের জন্য বন্ধক দেওয়া হয়েছে জমীটা। টাকা জমাতে হবে। ভুলে যাই দোলতলার কর্মকারের কাছ হতে বাতের তেলটা পাঠাতে হবে। আমার কোমরে ব্যথা হয়েচে। একটু তাড়াতাড়ি পাঠালে ভাল হয়। কাঠের বাক্সে প্যাক করতে হবে। তুলোর পেড দিয়ে।' 'রা'



তুলোর প্যাড দিয়ে কাঠের বাক্সে প্যাক করে বাতের তেল বাবা প্রায়ই পাঠাতেন। কিম্বা যাবার সময় নিয়ে যেতেন। যাইহোক্ ২৫/১২/৭৫ তারিখে তিনি আবার পেঁচার কথা লিখলেন। লিখলেন আরও তেল পাঠানোর কথাও তিনি লিখলেন। দিবাকর শিবুর পরীক্ষা শেষ হলে

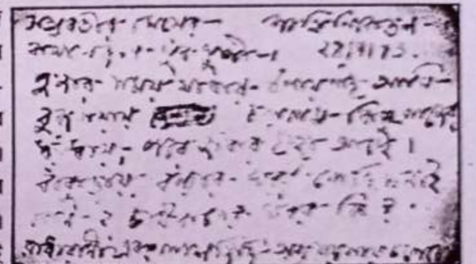




সেই পেঁচার কাজটা করে যেতে বলিস। অনেক করতে বলিস্। ১০০-২০০ করতে হবে। পরে আরও একটা কিছু নোতুন কিছু দেব। লেখা পড়ার সঙ্গে করে যেতে হবে। আমার পায়ের অবস্থাটা ক্রমে অবশ হতে চলেচে। কর্মকারের বাতের তেলটা আরও এক শিশি পাঠাতে হবে। একটু তাড়াতাড়ি পাঠাবি। পাটা মালিশ করতে হবে। আর একটা বড় কাজের সূচনা করব ভাবচি। সিমেন্টের জন্য শিশির অধুর্যের ছেলেকে বলেচি —এখানে এসেছিলেন। কন্ট্রাকটর আছেন। অতুল বিশ্বনাথ কেমন?

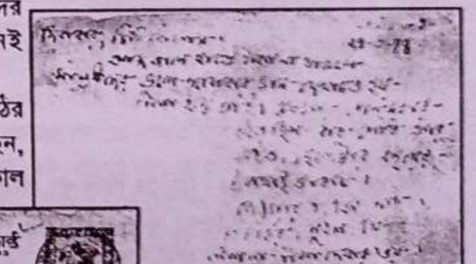
এই চিঠিতে একটা বিষয় লক্ষ্য করার যে ৬৮/৭৯ বছর বয়সেও মনটা তাঁর আগের মতই অটুট ছিলো, যেহেতু তিনি তখনও একটা বড় কাজের সূচনার কথা ভাবছেন। কিন্তু ৮০ সালে তিনি মারা গেলেন অনেকগুলি রোগের আক্রমণে। তাঁর ভাবনা আর রূপ পায়নি। দেহ ও মনে শক্ত সমর্থ থাকাকালীন আর্থিক অনটন বা বিভিন্ন অসহযোগিতার ফলে না-রূপায়িত বহু কাজের মতই।

২৮/৯/৭৩ তারিখে আমার বড়দি সত্যবতীর একটি কন্যা জন্মানোর খবর পেয়ে তিনি লিখলেন — 'সত্যবতীর মেয়ের কথা জেনে খুব খুশী। পূজার সময় যাবার উপায় নাই। আমি বুদ্ধ গয়ায় চললাম কিছু কাজের ধান্ধায়। পরে যাবার ইচ্ছা আছে। বাঁকুড়ার বন্যার খবর লেখিস্ নাই কেন? চাষবাসের খবর কি? রাধারাণী ও লাল দিদি অন্য জায়গায় চলেচে।'



(প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে — এই বড়দির বিয়ের যাবতীয় খরচ তিনিই দিয়েছিলেন।)

২৭/৩/৭৪ তারিখের একটা চিঠির অনেকাংশ ছেঁড়া। তিনি লিখেছেন, 'দিবাকর, চিঠি পেলেম। আজকাল হাতে টাকা না থাকলে মানুষদের ভুলে থাকবার ভান দেখাতে হয়। ছেলেটার বইয়ের কথাই ভাবছি।... রোজগার ত এখন নাই।... তোর কি ব্যাপার লেখিস নাই। আমি সব জানি। আজকাল সব

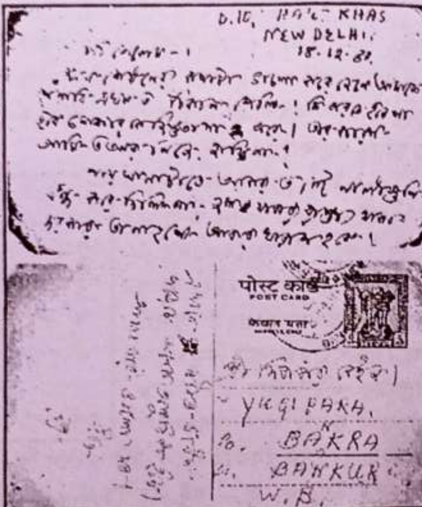






সমান হয়ে আসচে। আর কিছুদিনের মধ্যেই সব বুঝা যাবে।' ইতি রামকিঙ্কর বেঈজ। পরে পদবী 'বেইজ' বিষয়ে লিখেছেন ঃ 'ই নয় ঈ হবে। পুরনো বইয়ে দেখলাম।'
এই চিঠিতে কালজয়ী ভাস্কর ও চিত্রশিল্পীর একটি কথা বড়ই মর্মান্তিক লাগে যেখানে তিনি আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি কর্তব্য বোধ, দায়িত্ব বোধ, টান, মমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ভুলে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। তাই তিনি লিখেছেন, 'আজকাল হাতে টাকা না থাকলে মানুষদের ভুলে থাকবার ভান করতে হয়।'

'আজকাল সব সমান হয়ে আসচে।' কথাটিতে তাঁর আঁকা পায়ের পাতা দেখানো লালন ফকিরের কথা মনে পড়ে যায়। তাঁর সারা জীবনব্যাপী অন্তর্নিহিত মানসিক কষ্টের শব্দ শুনতে পাই আমরা। যক্ষ-যক্ষীর কাজ চলাকালীন ১৮/১২/৬৩ সালে দিল্লী থেকে তিনি ভাইপো দিবাকরকে চিঠি লিখলেন — 'দিবাকর, তোর চিঠি পেলেম। কম্পেনশেষনের কথাটা ভালো করে জেনে আমাকে জানাবি। এখন ত ঠিকানা পেলি। কি করতে হবে না হবে মোক্তারকে জিজ্ঞাসা করো। তার কারণ আমি ত আর নিজে যাচ্ছিনা। পায়খানাটাতে আবার ত সেই নালীগুলি বন্ধ করে দিলি। জল যাবার রাস্তা থাকা দরকার। তা না হলে আবার খারাপ হবে। এখানে শীত ভীষণ পড়েচে। অনেক অসুবিধা হচ্ছে।


D.10, HAUZ KHAS
NEW DELHI.
18.12.63.
পোস্ট কার্ড
POST CARD
YUGIPARA.
BAKRA
BANKURA
W.B.

আশাকরি ভালো সব।

'ইতি রা'

এই হল তাঁর চিঠি পত্তর। চিঠিতে তিনি খুব সাধারণ কথাবার্তা, উপদেশ-নির্দেশ বা খবরা-খবরের কথাই লিখেছেন। এই চিঠিগুলিতে একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের কর্তাব্যক্তির মত তাঁর অবস্থান বোঝা যায়।

এরপর এণ্ড্রুজপল্লীর কুড়ি নাম্বার কোয়ার্টারে তাঁর বসবাস করার কথায় যাওয়ার আগে রতনপল্লীর বাড়িতে সংঘটিত একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি যেখানে তাঁর হৃদয়বত্তার এক অতিকোমল দিক আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়।

সেটা হল সম্ভবত ৭৬/৭৭ সাল। বর্ষাকাল। বাঁকুড়ার এক ভদ্রলোক বাবাকে ধরলেন কলাভবনে তাঁর ছেলেকে ভর্তির ব্যাপারে দাদুর সুপারিস পেতে। বাবা আমাকে ওদের সঙ্গে



পাঠালো। আমি তখন মিশন স্কুলের ছাত্র। যখন শান্তিনিকেতনে পৌঁছই অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে।

বহুক্ষণ অপেক্ষা করে শেষমেশ একটা রিক্সায় চেপে সর্বাঙ্গ সিক্ত অবস্থায় যখন দাদুর বাড়িতে পৌঁছই তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। দাদুকে বরাবরের মত শান্তিনিকেতনী বাঁশের মোড়ায় বসে ধ্যানস্থ দেখলাম। আমাদের দেখে নড়ে চড়ে বসলেন। আমাকে তাড়াতাড়ি কিছু শুকনো কাপড় দেওয়ার জন্য রাধারাণী দিদিমাকে বললেন। উক্ত ভদ্রলোক কাছাকাছি একটা লজে বলে চলে যাওয়ার কথা বলে, তাঁর প্রয়োজনীয় কথাগুলি জানালেন। আর বললেন পরের দিন এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। আমি ইতিমধ্যে একটি কাপড় ও দাদুরই একটি ফতুয়া পেয়ে পরে নিয়েছি। তো দেখলাম দাদু ঐ সুপারিশের কথাটিতে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছেন, তাই অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। বিশ্বভারতীতে কোনো একটা কাজের ব্যাপারে তাঁর নিজের ভাইপোকেও যে তিনি সুপারিশ করেননি। কিম্বা হয়ত বা কোনো গুরুত্বই পায়নি তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা — সে সময়ের কর্তাব্যক্তিদের কাছে। তাই তিনি একটা কথাই বলছিলেন — তিনি ঐ ভদ্রলোককে, 'আমার হাত নাই বাবা, আমার কোনো হাত নাই।' আরও বললেন যে — 'পরীক্ষা দিক, দিলেই হবে। এবারে না হলে পরের বার হবে।' বাস্তবিক ঐ কথায় উক্ত ব্যক্তির বিশেষ রাগান্বিত হয়েছিলেন, যা আমি পরে জানতে পারি। যাইহোক, ওরা চলে গেলে আমি খেয়ে নিয়ে শোওয়ার জন্য তৈরী হলাম। রাধারাণী দিদিমা পূর্ব-পশ্চিম বরাবর যে বারান্দা সেখানে বিছানা পেতে দিল। অতটা পথ বাস জার্নিতে বিশেষ ক্লান্ত ছিলাম বলে শুয়ে পড়লাম। রাধারাণী দিদিমা দাদুকে তাঁর নির্দিষ্ট পূর্ব দিকের কুঠুরিতে শুইয়ে দিয়ে আরও কে কে ছিল সবাই বারান্দা লাগোয়া বড় ঘরটিতে ঢুকে খিল দিয়ে দিল। এরপর আমি নিমেষে পথশ্রমের নিদ্রায় ঢলে পড়েছি। হঠাৎ কার যেন স্পর্শে ঘুম গেল ভেঙে। বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ভয় পাওয়ারই কথা কারণ তখনকার রতনপল্লীর চারপাশের ঝোপঝাড় সমন্বিত শূন্য চেহারাটা যারা দেখেছেন তারা বুঝতে পারবেন। তো দূরে রাখা হ্যারিকেনের কম আলোতেই বেশ ঠাহর পেলাম যে তিনি দাদু — এইমাত্র পাশ ফিরে শুলেন। পাছে ভয় পাই ভেবে রাধারাণী দিদিমা খিল দেওয়ার পরই হয়ত তিনি এসে আমার পাশটিতে শুয়ে পড়েছিলেন। যাইহোক অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে আবার ঘুমিয়ে পড়েছি। ভোরের প্রথম আলো চোখে পড়তেই উঠে দেখি দাদু নেই, আবার তাঁর জায়গায় প্রস্থান করেছেন বাড়িতে অন্যান্যদের জেনে যাবার আগেই। দাদু ঐভাবে চলে গেলেও তাঁর পাটোয়ারা বুদ্ধির অভাব বশতঃ তাঁর আনা চাদরটি নিতে ভুলে ছিলেন আর ঐ দেখেই বুঝে নিয়েছিল গৃহকর্তী ও তার অনুগতরা। পরে দাদুকে বকাঝকাও চলে — সেসব ঘটনা কখনোই ভুলবার নয়। ভাবতে অবাক লাগে শুধুমাত্র শিল্পের জন্যই উৎসর্গীকৃত ওই উদাসীন নিস্পৃহ, আত্মভোলা বাউল মানুষটার অন্তরেও ফল্গুধারার মত আত্মীয় স্বজনের প্রতি কতটাই না মমত্ব বা ভালবাসার টান ছিল। কিন্তু পাটোয়ারা বুদ্ধির অভাব বশতঃ কিছুই করে উঠতে পারেননি তাইতো তিনি বলেছেন — 'আজকাল হাতে টাকা না থাকলে মানুষদের ভুলে থাকবার ভান দেখাতে হয়।'



তো রতনপল্লীতে বাবার সাথে বারবার যাওয়ায় রাস্তাটা বেশ মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে একাই চলে যেতাম। রতনপল্লীর পর শান্তিনিকেতন থেকে কলাভবন হোস্টেল ও পিয়ার্সনপল্লীর রাস্তা ধরে দাদুর নির্দেশিত পথে পৌঁছে যেতাম এণ্ডুজপল্লীর ২০ নাম্বার কোয়ার্টারে। এখন মনে হয় পুরনো শান্তিনিকেতনের সব সোঁদা গন্ধটুকু তখনও যেন চলে যেতে পারেনি রামকিঙ্করের মুখ চেয়ে। পূর্ণশক্তি দিয়ে প্রদীপের শেষ জ্বলে থাকার মত তখনও বিদ্যমান ছিল। যাইহোক এণ্ডুজপল্লীর ২০ নাম্বার কোয়ার্টারের জানলার পাশে বসে ম্রিয়মাণ দাদুকে দেখতাম বসে থাকতে। তাঁর দু'চোখের দৃষ্টি আকাশের কাছে পৌঁছাতে চেয়ে ইট-কাঠ ও সিমেন্টের দেয়ালে ঠোক্কর খেয়ে আবার ফিরে আসত। তাঁর দু'চোখের বিষণ্ন পাতায়। হয়ত বা আমাদের আগমন তাঁকে ক্ষণিকের জন্য দীপ্তিমান করলেও পরক্ষণেই আবার নিজেকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতেন ইট-কাঠ-সিমেন্টে ঘেরা নির্মম খাঁচায়। এণ্ডুজপল্লীতে দাদুর প্রতিবেশী হিসেবে তাঁর সুখ দুঃখের সাথী ছিলেন দু'জন। তাঁরা সৌম্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুণ সাহা। 'শিল্পী রামকিঙ্কর ঃ আলাপ চারিতায়' বইটির জন্য কথা সংগ্রহ চলছিল তখন সৌম্যেনকাকুর। আমার সাথে তেমন আলাপ না হলেও বাবার সাথে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এইখানে 'ম্যানা' নামে একটি মেয়েকে দেখেছিলাম। কুড়ি বাইশ বছর বয়স। ফাই ফরমাস খাটতো সে। সম্ভবতঃ রতনপল্লীতেও শেষের দিকে ওকে দেখেছিলাম। রাধারাণী দিদিমার ভিক্ষেছেলের ছেলে দিলীপ নামে একজন থাকত। আর বোলপুরের কোথায় সে দর্জির কাজ শিখত। অন্যান্য আরো অনেকেই আসতেন খোঁজ খবর করতেন, তথাপি দাদু কিন্তু ভালো ছিলেন না। তাঁর স্বাস্থ্যের দিনদিন অবনতির দিকেই যাচ্ছিল। তিনি রতনপল্লীর প্রতিবেশী হৃষিকেশ চন্দ্র মহাশয়কে বলেছিলেন তাঁর মনোবেদনার কথা। বলেছিলেন, 'পুরনো বাড়িতে কি আনন্দেই না ছিলাম। মাটির বাড়ি খড়ের চালা আর চারদিকে গাছপালা। যেন গ্রামের স্পর্শ পেতাম। আর এখানে চারদিকে অসংখ্য ইমারত। যেন কেমন একটা শহুরে ভাব। আমার মন অহরহ ঐ বাড়িটির জন্য কাঁদে।' কিন্তু তাঁর ব্যথায় কজনই আর ভিজেছে সেদিন। পরিচারিকা রাধারাণী দিদিমা প্রায়ই আমাদের তাঁর নিজস্ব ভাবনার কথা জানাত। 'পাছে বাড়িটা বেদখল হয়ে যায় তাই বাবুকে মেরামতের নামে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিল।'

তো দিন দিন দাদুর শরীর খারাপ হতেই থাকল। আমি তখন প্রায় প্রতি মাসেই যেতাম। বাবা একবার মাকে নিয়ে ওখানে প্রায় ছমাসের মত রয়ে গেলেন কিন্তু রাধারাণী দিদিমার জন্য আবারও সেখানে তাঁর পাততাড়ি গুটোতে হল। ইতিমধ্যে ডাক্তাররা তাঁকে পরীক্ষা করে মস্তিষ্কে জল জমার কথাও শোনালেন। অপারেশনের জন্য কলকাতা যাওয়া লাগে। জোর তোড়জোড় শুরু হল। কিন্তু তিনি অরাজী। সুহৃদ হৃষিকেশবাবুকে তাঁর তীব্র অনিচ্ছার কথা জানিয়ে ওদের বাধা দিতে অনুরোধ করলেন। বলেছিলেন হৃষিকেশবাবু 'আপনারা আমাকে পাঠাবেন না। আমাকে শান্তিনিকেতনেই মরতে দিন।' কিন্তু তিনি বাধা দিলে তাঁরা শুনবে কেন। সেকথা তিনি তাঁকে বলেছিলেন, তৎকালীন কলাভবন অধ্যক্ষের তীব্র আপত্তি



ছিল নিয়ে যাওয়ায়। কিন্তু বিধি বাম। তাঁর আপত্তি অগ্রাহ্য হয়ে ৭৪ বৎসর বয়সে ব্রেন অপারেশান হল রামকিঙ্করের। প্রদীপটা শেষবারের মতো জ্বলে উঠে চিরদিনের জন্য নিভে গেল। শেষ হলো পৃথিবীর ইতিহাসের এক ব্যতিক্রমী অধ্যায়। তিনি তাঁর মর্মান্তিক শেষ কথাকটি কোমল হৃদয়ের মানুষদের জন্য রেখে গেলেন — 'যাচ্ছি — শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাচ্ছি — কিন্তু আর ফিরবো না। রবীন্দ্রনাথও ফেরেননি।'

তাঁর মৃত্যুদিনে কলকাতার শেঠ সুখলাল কারনানি হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডে বাবার সাথে আমি গিয়েছিলাম টেলিগ্রাম পেয়ে। আমাদের সাথে আরেকজনও গিয়েছিলেন — সে বাবার বন্ধু শ্রীহরি সূত্রধর। কলকাতায় পৌঁছাতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। ওখানে টেলিগ্রামের কাগজ দেখাতেই আমাদের খাওয়া সেরে ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করতে বলা হল। আর শুনলাম — অপারেশন হয়ে গেছে। কথা বন্ধ। সম্ভবতঃ তখনই মারা গিয়েছিলেন দাদু, যা শুনলে আমাদের আর খাবার মুখে রুচবে না — এই ভাবনায় ওঁরা আমাদের খেয়ে আসার কথা বলেছিলেন। তো এসেই শুনলাম। তিনি মারা গেছেন। সেদিন আর আমাদের দুচোখের পাতা এক হলো না। পরের দিন ঐ হাসপাতালের ওপরতলায় যেখানে দাদুর মৃতদেহ শায়িত — সেখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা ব্যালকনি মত জায়গায় আমরা বসেছিলাম। আর আমাদের কাছাকাছিই একটা বড়সড় আরাম কেদারায় এক লম্বা চওড়া সুপুরুষ ভদ্রলোককে বসে থাকতে দেখলাম। তিনি বসে থাকার পরে পায়চারি করতে শুরু করলেন। পায়চারি করছেন তো করছেনই। আমার চোখে তাঁকে কেমন যেন অন্য মানুষের থেকে বেশ আলাদা আলাদা মনে হচ্ছিল। একদৃষ্টে তাই তাকিয়েই ছিলাম তাঁর দিকে। হঠাৎ বাবা আমার দিকে ছোট্ট আঙুল তুলে জিজ্ঞাসা করলেন — "এনাকে চিনিস ?" আমি ঘাড় নাড়ালাম — "না তো।" "সে কিরে, তুই সত্যজিৎ রায়কে চিনিস না।" খুব অবাক হয়ে বলেছিলেন সেদিন বাবা। আমি তখন সেই ১৯৮০ সালে সত্যজিৎ সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানতাম না। যদিও এ-এক লজ্জার-ই কথা। তবুও এক আলাদা কথাও যে, সেই দিনটি আমার জীবনে যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদের দিন হয়ে বেঁচে থাকবে, যতদিন বেঁচে থাকবে আমার মন।

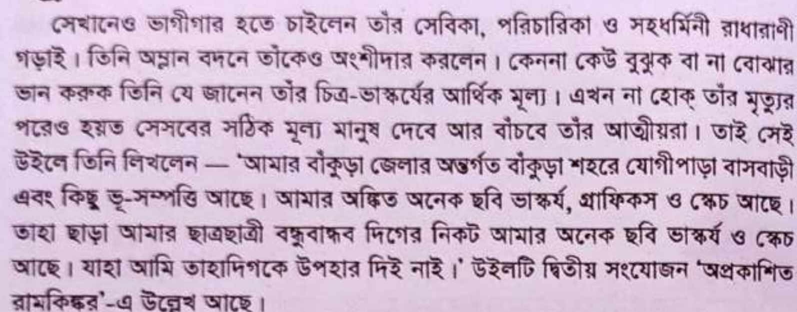
কিন্তু আমাদের বরবার ফিরে দেখতে হয় তার করে যাওয়া কাজ, তাঁর অতিপ্রজ্জ্বল অথচ গভীর তাৎপর্যময় ভাষা তথা বাণীর দিকে। এমনই একটি বাণী যা আমরা যারা তাঁর আত্মীয় পরিজন তাদের কাছে যুগপৎ আনন্দ ও বেদনাদায়ী লাগে; অবাক হয়ে আবারও ভাবতে বসি সেই উদাসী ঘরছাড়া বাউল মনের মানুষটার অন্তরনিঃসৃত বেদনামাখা কথাগুলো — যেখানে তিনি বলেছেন, 'আজকাল হাতে টাকা না থাকলে মানুষদের ভুলে থাকবার ভান দেখাতে হয়। ছেলেটার বইয়ের কথাই ভাবচি।' আত্মীয় পরিজনদের জন্য তাঁর একটা অন্তরের টান ছিল কিন্তু দুনিয়াদারী মানসিকতার অভাববশতঃ কিছু করে উঠতে পারেন নি। তিনি হয়ত তাই তাঁর শেষ জীবনে অনেক ভেবে ও ভালবেসে তাঁর আপন ভাইপো দিবাকর ও ভাগ্নের ছেলে সাধনকে একখানি উইল করে দিতে চাইলেন তাঁর সারা জীবনের করা চিত্র-ভাস্কর্যের উপর।

সেখানেও ভাগীদার হতে চাইলেন তাঁর সেবিকা, পরিচারিকা ও সহধর্মিনী রাধারাণী গড়াই। তিনি অম্লান বদনে তাঁকেও অংশীদার করলেন। কেননা কেউ বুঝুক বা না বোঝার ভান করুক তিনি যে জানেন তাঁর চিত্র-ভাস্কর্যের আর্থিক মূল্য। এখন না হোক্‌ তাঁর মৃত্যুর পরেও হয়ত সেসবের সঠিক মূল্য মানুষ দেবে আর বাঁচবে তাঁর আত্মীয়রা। তাই সেই উইলে তিনি লিখলেন — 'আমার বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বাঁকুড়া শহরে যোগীপাড়া বাসবাড়ী এবং কিছু ভূ-সম্পত্তি আছে। আমার অঙ্কিত অনেক ছবি ভাস্কর্য, গ্রাফিকস ও স্কেচ আছে। তাহা ছাড়া আমার ছাত্রছাত্রী বন্ধুবান্ধব দিগের নিকট আমার অনেক ছবি ভাস্কর্য ও স্কেচ আছে। যাহা আমি তাহাদিগকে উপহার দিই নাই।' উইলটি দ্বিতীয় সংযোজন 'অপ্রকাশিত রামকিঙ্কর'-এ উল্লেখ আছে।

স্বল্প বুদ্ধির মানুষ আমরা, পাঠালাম এক চিঠি সেকথা জানিয়ে বিশ্বভারতীর উপাচার্য মহাশয়কে। কিন্তু তিনি আমাদের ভুল ভেঙে দিলেন। তার উত্তরে বিশ্বভারতীর উপ-কর্মসচিব মহাশয় লিখলেন —

'মহাশয়, আপনার ২৩/০৯/৯৪ তারিখের পত্রের উত্তরে প্রশাসনের নির্দেমানুসারে জানাই, প্রখ্যাত ভাস্কর প্রয়াত শ্রী রামকিঙ্কর বেইজ প্রণীত সমস্ত ভাস্কর্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থেই নির্মিত হয়েছে। এগুলির সত্ত্বাধিকারী বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।'

নমস্কারান্তে ভবদীয়
জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
উপ-কর্মসচিব।


VISVA-BHARATI
FOUNDED BY
RABINDRANATH TAGORE
SANTINIKETAN
WEST BENGAL, INDIA

প্রকাশ দাস 'স্বকাল' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদক। পানাগড়ে বাড়ি। তিনি রামকিঙ্করের ওপর একটি বই করতে চান। রামকিঙ্করের ভাইপো দিবাকর বেইজের কাছ থেকে রামকিঙ্করের তিনটি স্কেচ খাতা ও চল্লিশটি খুচরো ছবি নেন বইটির জন্য এবং সেগুলি ফেরৎ দেননি এখনো পর্যন্ত। এই নিয়ে বহু লেখালেখি হয় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। তারই কিছু চিঠিপত্র ও রচনা নিয়েই প্রথম সংযোজন

'অন্য' প্রকাশ দাস

প্রকাশবাবু আমাদের বাড়িতে আসেন এক গ্রীষ্মের দুপুরে। তিনি বর্ধমান জেলার পানাগড়ের অধিবাসী। ত্রৈমাসিক 'স্বকাল' নামক একটি পত্রিকার সম্পাদক। প্রকাশবাবু বিশ্বভারতীর তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রী সৌম্যেন অধিকারীর কাছ থেকে আমাদের ঠিকানা পেয়ে বাবাকে একটি চিঠি পাঠান ঐ স্বকাল পত্রিকার প্যাডে লিখে। এবং পরে তাঁর সশরীরে আগমন ও আমাদের সাথে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা তৈরী। তারপর বাবার কাছে রক্ষিত ৩টি স্কেচ খাতা ও ওয়াটার কালার ছবি গোটা চল্লিশেক তাঁর হাতে চলে যাওয়া। প্রকাশবাবুকে ঐ ছবিগুলির মুদ্রিত পুস্তক প্রকাশ করতে দেওয়ার জন্য তাঁর হাতে তুলে দিতে আমিও তো হাত লাগিয়ে ছিলাম সেদিন। কিন্তু আজ আমাদের আফসোসের শেষ নেই। আবার মনে ভাবি — মূর্খদের উপযুক্ত শাস্তিই জুটেছে বোধহয়।

তিনি বললেন খুব শীগগিরই কাজ হয়ে যাবে এবং কাজ হলেই তিনি সেগুলি



যথাযোগ্য মর্যাদায় শ্রদ্ধার সাথেই সেগুলি ফেরত দিয়ে দেবেন। আর বইটির উপর রয়্যালটি দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু সেতো মৌখিক। সেদিন প্রকাশবাবু না জানি মনে মনে হেসেই ছিলেন কিনা। যাইহোক এছাড়া 'রামকিঙ্কর' বইটির ব্যাপারে তিনি বাবার মুখ থেকে যা যা শুনলেন টেপে সংগ্রহ ও করে নিলেন। প্রায় ষাটের কাছাকাছি বয়সের বাবা দিবাকর বেইজের মনে প্রকাশ দাস সম্পর্কে কোনো বাঁকা ভাবনার উদয় হয়নি সেদিন। আর কি করেই বা হবে, তিনি যে প্রকাশ দাসের মতো শিক্ষিত ছিলেন না। আর এই নিজেকেই বা লিটারেটেড বলি কি করে, নইলে কি আর লিখিত কোনো প্রমাণ না নিয়েই অমূল্য ঐ ছবিগুলি হাতছাড়া করি। বাঁকুড়ার বিশিষ্ট দু'জন মানুষ সেদিন ন্যায্য কথাই শুনিয়েছিলেন আমায় যা অন্তরে এখনও বেঁধা হয়ে আছে তা হল — "যেখানে যাবার সেখানেই চলে গেছে।" যাই হোক ছবিগুলি পাবার পর প্রকাশবাবুর আসা যাওয়া থেমে গেল। তিনি খুব ব্যস্ত সেগুলি ছাপার ব্যাপারে, তাই আসতে পারছেন না ইত্যাদি। 'রামকিঙ্কর' নামে বইটি বেরলো। তিনি হঠাৎ একদিন এসে বাবার হাতে বইটি তুলে দিয়ে ছবিগুলির ব্যাপারে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই বলে এবং আবারও রয়্যালটি দেওয়ার কথা জানিয়ে তৎক্ষনাৎ বিদায় নিলেন। এরপর শুরু হল অমাদের কাল গোনা কখন তিনি ফেরত দেবেন। অবশেষে বাবা প্রমাদ গুনলেন — বোধহয় আর ফেরত পাওয়া যাবে না। আরো পরে সিদ্ধান্তে এলেন যে ছবিগুলো গেল। আমরা চরম হতাশ হয়ে পড়লাম। শেষ সম্বলটুকু চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল। ছবিগুলি ফেরত চেয়ে সেসময় যেসব চিঠি তাঁকে দেওয়া হয়েছে তাঁর উত্তরে তিনি যে কটি চিঠি পাঠিয়েছেন আমাকে ও বাবাকে তাঁর অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা হল —



২. ৩. ৮৭ তারিখে তিনি লিখলেন আমার এক পত্রের উত্তরে যে — "তোমাদের বাড়ি থেকে রামকিঙ্করের যে সমস্ত জিনিস পত্র নিয়ে এসেছি ওগুলোর জন্য কোনো রকম দুশ্চিন্তা করবে না।"

UNTOUCHABILITY IS A CRIME AGAINST GOD AND MAN

বাবা কিন্তু তাঁর এই স্তোকবাক্যে স্বস্তি পেলেন না। ভীষণ উদ্বিগ্ন বাবা আমাকে তাঁর বোকামির কথা বারবার বলতে থাকলে আমি প্রকাশবাবুকে সে কথা জানাই। ২৫. ৩. ৮৭ তারিখে তাঁর উত্তরে তিনি লিখলেন : "তিনি যেন ছবিগুলির জন্য কোনোরকম উদ্বিগ্ন না হোন স্কেচ খাতার প্রয়োজনীয় স্কেচগুলি প্রায় সবই Block হয়ে গেছে।" তারপর একবছর গড়িয়ে গেল বাবা ধীক্কার দিতে লাগলেন নিজেকে। কী 'অমূল্য ধন' তিনি কাকে বিশ্বাস করে দিলেন।



—এই দুর্ভাবনায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমিও পুরোপুরি নিরাশ হয়েই বাবার কথা জানিয়ে একখান চিঠি পাঠালাম।

১৩. ৬. ৮৮ তারিখের চিঠিতে তিনি জানালেন — "দিবাকরদাকে বলবে ছবিগুলির জন্য উনি যেন কোনরকম উদ্বিগ্ন না হন। তোমাদের কাছ থেকে আনা জিনিসপত্রগুলির কাজ হয়ে গেছে এবং ওগুলি যত্নের সঙ্গেই আছে। অতএব ভাববার কিছু নেই। কয়েকদিন পরে আমি যাচ্ছি তখন ওগুলি নিয়ে যাবো।"

এরপর বাবা যারপরই নাই মিনতি জ্ঞাপন করে এক চিঠি লিখলেন ১৭. ৭. ৮৮ সালে তিনি বাবা দিবাকর বেইজকে লিখলেন — "ছবিগুলির জন্য কোনরকম চিন্তা করবেন না। যথারীতি শ্রদ্ধার সাথে আপনার বিশ্বাসকে মূল্য দিয়েই ফিরিয়ে দেব।"

ওই একই তারিখে আমাকেও তিনি লিখলেন — "দিবাকরদাকে বলবে ছবিগুলোর ব্যাপারে যেন কোন রকম দুশ্চিন্তা না করেন। চিন্তিত হবার কথাই। কারণ অনেক দিন তো হলো।" ওই চিঠিতেই তিনি আরো লিখিছেন — "এরকম মহৎ কাজে তোমাদের সাহায্যও তো বইটি



প্রকাশে অনেকখানি সাহায্য করেছে। বইটি প্রকাশে তোমাদের মহৎ দান-এর কাছে ঋণী থাকবো।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রামকিঙ্কর বইটিতে মুদ্রিত বহু ছবি যেমন পরিচারিকা রাধারাণীর সমস্ত ন্যুড স্কেচ। সাঁওতাল মূর্তির খসড়া ড্রইং। গোরুর গাড়ি, ময়ূরে চড়া কার্তিক ইত্যাদি ছবিগুলি আমাদের দেওয়া ছবিগুলিরই কয়েকটি। পাঠকগণ লক্ষ্য করছেন যে চিঠিতে 'দিচ্ছি' 'দিচ্ছি' 'চিন্তা করবেন না' ধারাবাহিক ভাবে বলে গেছেন। যাই হোক, এবার আমি দয়া করে ওগুলো দিয়ে যাওয়ার জন্য লিখলাম। তার উত্তরে ২৭. ৭. ৮৮ তারিখে লিখলেন — "বইটিতে যদি আরো কোন ছবি লাগে এজন্যই ছবিগুলি দিতে দেরী হচ্ছে। দিবাকরদাকে বলো যেন উনি ছবির ব্যাপারে কোনরকম দুশ্চিন্তা না করেন।" এই চিঠি পাবার পর বাবা শান্তিনিকেতনে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে একথা জানিয়ে আসেন। সে সংবাদ প্রকাশ দাসের কাছে পৌঁছায়।

৩. ৪. ৮৯ তারিখে তাঁর লেখা ওই চিঠিতে তিনি আরো লিখেছেন যে "আমি ১১/১৩ তারিখে তোমাদের ওখানে যাবো। স্কেচের বইটির কাজ অনেকদূর এগিয়েছে এ বিষয়ে সাক্ষাতে কথা হবে।"

এই চিঠি পেয়ে আমি ঐ স্কেচ বই বা এ্যালবামের ওপর তাঁর প্রতিশ্রুত রয়্যালটি দেওয়ার

কথা স্মরণ করিয়ে এছাড়া 'রামকিঙ্কর' বইটিতে আমাদের দেওয়া উক্ত ছবির প্রিন্ট ছাপানোর জন্য সেখানেও কিছু রয়্যালটি আমাদের প্রাপ্য বলে জানিয়ে ও সাথে সাথে দয়া করে মূল ছবিগুলি ফেরত দেওয়ার অনুরোধ করে এক চিঠি লিখলাম। ('রামকিঙ্কর' বইতে তিনি কিছু ছবির প্রিন্ট দেবেন আগেই জানিয়েছিলেন)

এই সময়েই তিনি আমাদের বাড়ি এলেন সঙ্গে বইটি হাতে 'রামকিঙ্কর'। সেটি বাবার হাতে তুলে দিয়ে আবারও মূল ছবিগুলি কিছুদিনের মধ্যেই ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে বিদায় নিলেন। এই তাঁর শেষ যাওয়া। বোধহয় আর বাঁকুড়ামুখোও হননি। যাইহোক ২৪.

১২. ৮৯ তারিখে তিনি লিখলেন — আমাদের পোড়াদেশ, এতদিন পরও রামকিঙ্কর নামের ঐ শিল্পী পুরুষের ছবিগুলি যথাযথভাবে কোন অর্থনৈতিক সাহায্য বা সুরাহায় ছাপানোর ব্যবস্থা আজও করে উঠতে পারিনি। এখনও আমি ভিখিরির মতো শুধু হন্যে হয়ে আছি। কিভাবে ঐ শিল্পী পুরুষের ছবিগুলি দেশবাসীর কাছে ভালোভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়।"

এখানে প্রশ্ন — এই কথাগুলি তিনি আমাকে কেন লিখলেন? উনি এখানে কোন্ ছবিগুলির কথা বলেছেন? দেশবাসীর কাছে ঐ মহান শিল্পী পুরুষের ছবিগুলি প্রকাশের আলোয় আনার জন্যই তো তাঁকে দেওয়া। কিন্তু তাঁর বদলে তিনি কি করলেন? এখনও তো বহু ছবি অধরাই রয়ে গেল। তাছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে গেল কিনা তাই বা কে জানে।

এখানে উল্লেখ্য — ৭ এপ্রিল ২০০৮ আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি প্রদর্শনীর রিপোর্ট ছাপা হয়। সেটি এখানে তুলে ধরা হল।

রিপোর্ট

"রামকিঙ্কর বেইজ ছিলেন প্রকৃতির শিল্পী। সারা জীবন অসংখ্য ভাস্কর্য তৈরির ফাঁকে প্রচুর ছবিও এঁকেছেন। এত দিন ধরে প্রকাশিত না-হওয়া তাঁর ৩২টি ছবি নিয়ে 'খড়ির গণ্ডী'-তে জঙ্গলের ভিতর প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল 'আলোবাতাস' সাহিত্য পত্রিকা। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শিল্পী রবিন মণ্ডল। কিন্তু এতদিন কোথায় ছিল ছবিগুলি? আলোবাতস'-এর সম্পাদক স্বপ্নকমল সরকার জানালেন, পানাগড়ের শিল্প সংগ্রাহক প্রকাশ দাসের কাছে ছবিগুলি



ছিল। শিল্পীর জন্মশতবর্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই সেগুলি বাইরে আনা হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগেও কমলকুমার মজুমদারের আঁকা বেশ কিছু অপ্রকাশিত ছবির প্রদর্শনী করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন এই পত্রিকার কর্মীরা।"

রিপোর্টার পরিস্কার লিখেছেন 'কিন্তু এতদিন কোথায় ছিল ছবিগুলি' ? রিপোর্টারকে কেন লিখতে হলো 'কোথায় ছিল ছবিগুলি'? প্রশ্ন চিহ্নই বা কেন দিলেন ? 'কিন্তু' কথাটিও বা কেন লিখলেন ? যিনি ঐ প্রদর্শনীর আয়জক ছিলেন আলোবাতাসের পত্রিকার সম্পাদক স্বপ্নকমল সরকার, তিনি জানাচ্ছেন, 'পানাগড়ের শিল্প সংগ্রাহক প্রকাশ দাসের কাছে ছবিগুলি ছিল। শিল্পীর জন্মশত বর্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই সেগুলি বাইরে আনা হয়েছে"। প্রশ্ন, তিনি এখানে কোন 'বাইরের' কথা বলছেন ?

আরো একজায়গায় পাওয়া যাচ্ছে, স্বয়ং প্রকাশ দাস সম্পদিত 'স্বকাল' নামক বইতে (অরুণ ভট্টাচার্য সংখ্যা) একটি বিজ্ঞাপনে রয়েছে 'রামকিঙ্কের ড্রইং' সম্পাদনা প্রকাশ দাস, যাতে গণেশ হালুই বইটির মুখবন্ধে লিখছেন "দীর্ঘ অনুসন্ধানে উদ্ধার করা এই ড্রইংগুলির গুরুত্ব অপরিসীম"। প্রশ্ন এখানেও যে 'দীর্ঘ অনুসন্ধানে উদ্ধার করা' কথাটির অর্থ কি ? কোথা থেকে উদ্ধার ? কার কাছ থেকে ? সেই বেইজ পরিবার ?

'কিন্তু' 'কোথায় ছিল' 'বাইরে আনা হয়েছে' 'দীর্ঘ অনুসন্ধানে উদ্ধার করা' এবং 'এতদিন ধরে প্রকাশিত না হওয়া তাঁর ৩২টি ছবি নিয়ে 'ঘড়ির গণ্ডী'তে জঙ্গলের ভিতর প্রদর্শনীর আয়োজন ...' কথাগুলি অত্যন্ত সন্দেহ ও রহস্যজনক তা বলে দিতে হবেনা এবং আগামীদিনে রামকিঙ্কর নিয়ে চর্চা হলে ছবি অন্তর্ধান প্রসঙ্গ অবশ্যই আসবে মনে করি। আসবে প্রকাশ দাসের কথা, প্রকাশ পাবে নানা রহস্য।

এতগুলো তথ্য দিয়ে পাঠককে অনেকটাই নিশ্চিন্ত করতে পারছি এবং আরো খানিকটা যোগ করছি, ১৫. ১. ২০০৬-এ আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি রিপোর্ট হয়। আমাদের বাড়িতে এসে ঐ রিপোর্টটি কভার করেন। সেটি হুবহুই দিলাম, আমাদের দেওয়া মূল্যবান নথিপত্র বা প্রমাণের ভিত্তিতে এই রিপোর্টটি বেরোয়।

রিপোর্ট

রামকিঙ্করের ছবি বেহাত, প্রশাসনের দ্বারস্থ পরিবার

অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়া

ভাস্কর ও চিত্রকর রামকিঙ্কর বেজের ৪০টি জলরঙে আঁকা ছবিও তিনটি স্কেচ খাতা তাঁর পরিবারের বেহাত হয়ে গিয়েছে।

সম্প্রতি বাঁকুড়ার জেলাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগে শিল্পীর উত্তরাধিকারীরা জানিয়েছেন, বেশ কিছু বছর আগে পানাগড়ের বাসিন্দা প্রকাশ দাস সেগুলি চেয়ে নিয়ে যান। বহু চেষ্টাতেও তা উদ্ধার করা যায়নি। জেলাশাসক প্রভাতকুমার মিশ্র এ ব্যাপারে



তদন্তের আশ্বাস দিলেও অভিযুক্ত প্রকাশবাবুর কাছে কোনও স্পষ্ট উত্তর মেলেনি। পানাগড়ের বাড়ি থেকে প্রকাশবাবু বলেন, "ছবিগুলি আমি নিয়েছিলাম। কিন্তু কোন লিখিত নথির ভিত্তিতে নয়। বহুদিন আগের ব্যাপার। কিছু হয়তো ফেরত দিয়েছি, কিছু হয়তো দিইনি। ঠিক মনে নেই।" তাঁর বক্তব্য, "তখন ছবিগুলির দামই বা কী ছিল ?"

শিল্পীর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, জলরঙের ছবিগুলির প্রায় সবই আর্ট পেপারের এক-চতুর্থাংশে আঁকা। চিত্রকলা সমালোচক শোভন সোম বলেন, "ছবি না-দেখে দাম বোঝা যায় না। তবে জলরঙে আঁকা রামকিঙ্করের রঙিন ছবি ঠিক অবস্থায় থাকলে তার একটির দামই চার লক্ষ টাকার কম নয়। '৯০ সাল নাগদ লাখখানেক টাকা দাম ছিল। স্কেচের দাম ৫০হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ টাকার মধ্যে। নিলামে উঠলে অবশ্য দাম অনেক চড়ে যেতে পারে। বছর সাত-আট আগে মুম্বইয়ে ওঁর একটি স্কেচ পৌনে দু'লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছিল।" চিত্রকর যোগেন চৌধুরী বলেন, "শিল্পীর ছবির দাম অনেকটা নির্ভর করে প্রচারের উপরে। রামকিঙ্কর যথেষ্ট প্রচার না-পেলেও ওঁর ছবির মর্যাদা যথেষ্ট।

শিল্পীর পরিবার সূত্রের খবর, বাঁকুড়ার রামানন্দপল্লির বাসভবনে থাকার সময়ে ওই সব স্কেচ ও ছবির বেশির ভাগ আঁকা। ১৯৮৬ সালে অকৃতদার চিত্রকরের ভাইপো দিবাকর বেজের কাছ থেকে প্রকাশবাবু সেগুলি নিয়ে যান। সেই সব ছবি-সহ কলকাতার এক প্রকাশনা সংস্থা 'রামকিঙ্কর' ও 'রামকিঙ্করের ড্রয়িং' নামে দু'টি বই প্রকাশ করে। দিবাকরবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হলেও গ্রন্থসত্ত্ব প্রকাশবাবুর নামেই ছিল। প্রকাশক রাজীব নিয়োগীর দাবি, "ছাপার প্লেট তৈরির পরে ছবিগুলি প্রকাশকে ফেরত দেওয়া হয়। অনেক দিন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ নেই। বইয়ের সংস্করণও নিঃশেষিত। শিল্পীর পরিবার ছবি ফেরত না পেয়ে থাকলে বা সেগুলি বিক্রি না-হয়ে থাকলে প্রকাশের কাছে থাকা উচিত।"

দিবাকরবাবুর তিন ছেলে জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। রামকিঙ্করের আর এক ভাইপো সাধনকুমার বেজ বলে, "শিল্পীর শেষ উইল অনুযায়ী দিবাকর বেজ তাঁর ছবি-সহ স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির আট আনা সত্ত্বাধিকারী। আমি চার আনার আর রাধারাণী গঁড়াই বাকি চার আনার।" দীর্ঘ সময় রামকিঙ্করের ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনী ছিলেন রাধারাণীদেবী। দিবাকরবাবুর এক ছেলে শিবপ্রসাদ বলেন, "প্রকাশবাবুকে চিঠি দেওয়া হলেই উনি নিশ্চুপ করেছেন। পরে আর যোগাযোগ করা যায়নি।" তাঁরা জানাচ্ছেন, পানাগড়ে প্রকাশবাবুর বাড়ির ঠিকানায় রেজিস্ট্রি ডাকে শেষ চিঠি ফেরত এসেছে। ছবিগুলি বিক্রি হয়ে দেশের বাইরে চলে গিয়েছে কি না, সে প্রশ্নও তাঁদের রয়েছে। প্রসঙ্গত, রামকিঙ্করের সৃষ্টি জাতীয় সম্পত্তি মর্যাদাভুক্ত। দেশের বাইরে তা বিক্রির নিয়ম নেই। আগামী ২৫মে রামকিঙ্করের জন্মশত-বর্ষের সূচনা। শিল্পীর পরিবার চায়, তার আগে যে করে সম্ভব ছবি ও স্কেচগুলি উদ্ধার হোক।

এই রিপোর্টটি প্রকাশ হবার পর ০৭. ০২. ২০০৬-এ প্রকাশ দাস ও 'রামকিঙ্করের ছবি রহস্য' শিরোনামে আমাদের একটি করে চিঠি প্রকাশ হয় আনন্দবাজার পত্রিকায়। সেটি দেওয়া হল — তার আগে জানিয়ে দিই যে প্রকাশবাবু নিজের নৈতিক দায়িত্বের কথা মনে



করিয়ে দিয়ে ২৪. ১২. ১৯৮৯ ও ২০. ০৮. ১৯৯০ দুটি চিঠি লেখেন ২৪. ১২. ১৯৮৯ লিখছেন, সেখানে আছে —

"এ্যালবামটির ব্যাপারে তুমি যে টাকার দাবি করেছো তা নিশ্চয়ই তোমাদের দিয়ে দিতে বাধ্য থাকবো।" ২০. ৮. ৯০ তারিখে লিখলেন — "তুমি যে টাকার কথা বলেছিলে সেসব দিয়ে দেব আমি তাতে আমার যত কষ্টই হোক না কেন। তোমাদের টাকা দেওয়াটাও আমাদের নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করি।"

এখন 'রামকিঙ্করের ছবি রহস্য' শিরোনামে পূর্বোক্ত যে চিঠিগুলি বেরোয় আনন্দবাজার পত্রিকায় সেগুলি এখানে পরিবেশিত হল —

রামকিঙ্করের ছবি-রহস্য

আনন্দবাজার পত্রিকায় গত ১৫ জানুয়ারি 'রামকিঙ্করের ছবি বেহাত — প্রশাসনের দ্বারস্থ পরিবার' শিরোনামে বাঁকুড়ার সাংবাদিক অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, সেটি অনেকাংশেই অসত্য এবং আমার সম্মানহানিকর। রামকিঙ্করের একটি সাক্ষাৎকার নিই ১১-১০-৭৯ সালে তাঁর শান্তিনিকেতনের বাসভবনে। সেই সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয় আমার সম্পাদিত সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা 'স্বকাল'-এর ১৯৮০ সালের সংখ্যায়, শিল্পীর মৃত্যুর অল্প কিছু দিন পর। এর পর রামকিঙ্করের শিল্পপ্রতিভা যাতে সকলের মধ্যে প্রচারিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমি ১৯৮৫ সালে বিভিন্ন শিল্পপ্রেমীর কাছ থেকে সংগ্রহ করে তাঁর আঁকা অর্ধশতাধিক ছবি ও স্লাইড প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করি মফস্বল পানাগড়ে। শিল্পী প্রকাশ কর্মকার, রবীন মণ্ডল, গণেশ হালুই, কবি আলোক সরকার, প্রমুখ ছিলেন সেখানে।

ওই প্রদর্শনীতে যে সমস্ত ছবি শিল্পপ্রেমীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করি, সেগুলি তাঁদের যথাসময়ে ফেরতও দিই। সে সময় পর্যন্ত রামকিঙ্কর বেইজের ভ্রাতুষ্পুত্র দিবাকর বেইজ বা তাঁর পুত্র বা তাঁর অন্য কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে আমার কোনও পরিচয় ছিল না। অতএব ওই প্রদর্শনীতে তাঁদের কাছ থেকে ছবি সংগ্রহের প্রশ্নই ওঠে না। রামকিঙ্কর বেইজ ১৯৮০ সালের ২৫জুলাই মারা যান। ১৯৮৯ সালের জানুয়ারি মাসে রামকিঙ্করের জীবন ও শিল্প নিয়ে আমার প্রথম গ্রন্থ 'রামকিঙ্কর' প্রকাশ করি। লেখকেরা সবাই প্রতিষ্ঠিত শিল্পী বা সমালোচক বা শিল্পীর ঘনিষ্ঠ জন। গ্রন্থে দিবাকর বেইজের একটি সাক্ষাৎকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এক বেকার যুবকের ব্যক্তিগত চেষ্টা ও শিল্পপ্রেমী বন্ধুদের সহায়তায় বইটি প্রকাশ পায় মফস্সলের একটি ছোট কাগজের তরফ থেকেই। যদিও পরে প্রকাশকের ভূমিকায় এগিয়ে আসেন কলকাতার এক প্রকাশক। বইটিতে ২০-২২ খানা ছবি রয়েছে। সমস্ত ছবিই নানা সূত্র থেকে সংগৃহীত। তালিকায় ব্যক্তিগত সংগ্রাহক যেমন রয়েছেন, তেমনই রয়েছে বিড়লা আকাদেমির মতো প্রতিষ্ঠান। কৃতজ্ঞতা জানাই দিবাকর বেইজের প্রতি, যিনি শিল্পীর আঁকা দু'-একটি প্রতিলিপি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন এবং যা যথাসময়ে তাঁকে ফেরত দিই। দিবাকরবাবু শিল্পীর আঁকা কোনও মূল ছবি দেননি আমাকে। দিবাকরপুত্র শিবপ্রসাদ



রামকিঙ্করের দুটি সাদা-কালো ফোটোগ্রাফ দেন, যার মধ্যে একটি উক্ত গ্রন্থের একেবারে প্রথমেই 'সৃষ্টিমগ্ন রামকিঙ্কর' শিরোনামে ছাপা হয় এবং ওই ফটোগ্রাফটিও তাকে যথাসময়ে ফেরত দেওয়া হয়। দিবাকরবাবু প্রতিলিপিগুলি দেওয়ার সময় যেমন আমার কাছে প্রাপ্তিস্বীকারের জন্য কোনও কিছু লিখিয়ে নেননি, তেমনই আমিও ফেরত দেওয়ার সময় তাঁর কাছ থেকে কিছু লিখিয়ে নিইনি।

রামকিঙ্কর বিষয়ক আমার দ্বিতীয় বই 'রামকিঙ্করের ড্রইং' প্রকাশিত হয় ১৪০০ সালের ১লা বৈশাখ। এই পুস্তকেরও সমস্ত ছবিই সংগৃহীত হয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ছাড়াও নানান ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে। ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্ট, ললিতকলা আকাদেমি (দিল্লি), কলাভবন, সোমনাথ হোড়, কে জি সুব্রহ্মনিয়ম, গণেশ হালুই, নিখিল সরকার (শ্রীপান্থ), প্রণব দেববর্মণ, দিনকর কৌশিক, পূর্ণেন্দু পত্রী, শিল্পীর দীর্ঘ দিনের সঙ্গিনী তথা অভিভাবক রাধারাণী, দিবাকর বেইজ, শঙ্খ চৌধুরী, অমিত মুখোপাধ্যায়, সৌমেন অধিকারী প্রমুখ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান পুস্তকটি প্রকাশনায় নানাভাবে সহায়তা করেন। উক্ত পুস্তকে সকলের নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করা হয়েছে। কোনও মূল ছবি নয়, এই বই প্রকাশের পূর্বে দিবাকর বেইজ দুটি স্কেচের প্রতিলিপি দেন। এবং সেগুলিও দিবাকরবাবুর মৃত্যুর পর শিবপ্রসাদকে ফেরত দিই।

আনন্দবাজার সংবাদের সঙ্গে যে চারটি ছবি ছাপা হয়, সেগুলির প্রতিলিপি সৌমেন অধিকারী, শঙ্খ চৌধুরী, দিল্লির ন্যাশানাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্ট এবং দিনকর কৌশিকের কাছ থেকে সংগৃহীত। কোনওটিই শিল্পীর আত্মীয়বর্গের কাছ থেকে সংগৃহীত নয়। তাঁদের থেকে মূল ছবি নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। 'রামকিঙ্করের ড্রইং' বইটির সমস্ত ছবিই ছাপা হয় প্রতিলিপি থেকে।

জীবন-সায়াহ্নে রোগে জেরবার, অসহায়, রামকিঙ্করের 'শেষ উইল'টিতে শিল্পীর দীর্ঘদিনের সঙ্গিনী, একমাত্র আপনজন, অভিভাবক রাধারাণীর পরিচয়সূত্রে 'দীর্ঘ দিনের পরিচারিকা' হিসাবে তাঁকে যে চিহ্নিত করা হয়েছে, তা কি রুচিসম্মত ? আমার সম্পাদিত বই দুটির 'স্বত্ব'র ব্যাপারেও উইলের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না বা নেই।

আমি আমার পত্রে শিবপ্রসাদকে তাঁর দেওয়া প্রতিলিপিগুলি ফেরত দেওয়ার কথাই লিখেছিলাম। এবং তার পরেই তা ফেরত দেওয়া হয়। আমাকে পাঠানো শিবপ্রসাদের রেজিস্ট্রি ডাকযোগের চিঠি আমি ফেরত পাঠাইনি। ডাককর্মী আমার সাক্ষাত না পেয়ে তা ফেরত পাঠাতে পারেন। এবং তা আমার অজ্ঞাতেই হয়েছে। সংবাদটিতে যেমন লেখা হয়েছে, সে কথা আমি প্রতিবেদককে কখনওই বলিনি, কিছু হয়তো ফেরত দিয়েছি, কিছু হয়তো দিইনি, ঠিক মনে নেই"। শিবপ্রসাদকে লেখা আমার চিঠিগুলির কথা প্রতিবেদক জিজ্ঞাসা করায় বলি, ওর লেখা অনেক চিঠিও আছে আমার কাছে।

কোনও মহৎ শিল্পকর্মই অর্থের অঙ্কে নির্ধারিত নয়। আর রামকিঙ্করের শিল্পকর্ম তো নয়ই। অর্থ নয়, প্রতিবেদকের সঙ্গে টেলিফোনে কথাপ্রসঙ্গে এসেছিল রামকিঙ্করের আঁকা



ছবির সজহলভ্যতার প্রসঙ্গ, বিশেষত সেই ১৯৮৫ সালে। যা ছিল তাঁর মৃত্যুর অল্প কিছু দিন পর। তা না হলে বিভিন্ন শিল্পপ্রেমীর ব্যক্তিগত সংগ্রহের এতগুলি ছবির প্রদর্শনী করার সুযোগ বা পাই কী করে ? আমি যে কথাগুলি বললাম, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এ বিষয়ে যাবতীয় তথ্য আমার উক্ত গ্রন্থ দুটিতে ছাড়াও আমার হাতে আছে।

প্রকাশ দাস। সম্পাদক : স্বকাল, পানাগড়, বর্ধমান।

আনন্দবাজার পত্রিকায় গত ১৫ জানুয়ারি' ০৬ তারিখে 'রামকিঙ্করের ছবি বেহাত, প্রশাসনের দ্বারস্থ পরিবার' শিরোনামে সংবাদটির পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ দাসের পত্র মারফত জানতে পারলাম, রামকিঙ্কর-এর শিল্পপ্রতিভাকে সকলের মধ্যে প্রচারের জন্য তিনি ১৯৮৫ সালে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন মফস্‌সল পানাগড়ে। নিঃসন্দেহে তিনি ধন্যবাদার্হ। কিন্তু প্রকাশবাবু, ব্যাপারটাকে খানিকটা সূর্যকে লণ্ঠন জ্বালিয়ে দেখার মতো মনে হয় না ? তা ছাড়া, সে প্রদর্শনী কেবলমাত্র পানাগড়েই তো সীমাবদ্ধ। তা হলে সকলের মধ্যে প্রচার কীভাবে হয় ? আপনি চিঠিতে লিখেছেন, "সে সময় পর্যন্ত রামকিঙ্কর বেইজের ভ্রাতুষ্পুত্র দিবাকর বেইজ বা তাঁর পুত্র বা তাঁর অন্য কোনও আত্মীয়র সঙ্গে আমার কোনও পরিচয় ছিল না। অতএব ওই প্রদর্শনীতে ওঁদের কাছ থেকে কোনও ছবি সংগ্রহের প্রশ্নই ওঠে না।" খাঁটি কথা। কিন্তু ১৫ জানুয়ারি'০৬ তারিখে আনন্দবাজারে প্রকাশিত সংবাদে এ ধরনের কোনও সংবাদই ছাপা হয়নি।

'রামকিঙ্কর' গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৮৯ সাল। ২. ৩. ১৯৮৭ তারিখে 'গভীর ভালবাসা-সহ প্রকাশদা' আপনি লিখেছেন, "আমি তোমাদের বাড়ি থেকে রামকিঙ্করের যে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে এসেছি, এগুলোর জন্য কোনো দুশ্চিন্তা করবে না। কারণ, আমার কাছ থেকে ওগুলো নষ্ট হওয়ার বা মারা যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। কাজ হলে, খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে যাবে, আশা করছি, আমি ওগুলো যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে ফিরিয়ে দেব। আর রামকিঙ্করকে নিয়ে কাজ করতে গেলে ওগুলো তোমাদের কাছে ছাড়া আর কাদের কাছেই বা আশা করতে পারি ? কারণ, আমার অভিজ্ঞতা বলে, তোমরা একটু বড় বুকের মানুষ বলেই আমাকে তোমাদের ওখানে আশ্রয় দিয়েছ। আমি আশ্চর্য আর অভিভূত।" আপনি 'রামকিঙ্করের যে সমস্ত জিনিসপত্র' নিয়ে গিয়েছিলেন, সে সব নিশ্চয়ই আসবাবপত্র বা তোরঙ্গ-তোশক নয়। অথচ আপনি লিখেছেন, "দিবাকরবাবু শিল্পীর আঁকা কোনও মূল ছবি দেননি আমাকে।" তিনি নাকি শিল্পীর আঁকা দু'একটি ছবির প্রতিলিপি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, এবং যথাসময়ে তাঁকে আপনি তাও ফেরত দিয়েছেন। প্রশ্ন কীসের ভিত্তিতে ফেরত দিয়েছিলেন? এই আশঙ্কা থেকেই আপনি লিখেছেন, "দিবাকরবাবু প্রতিলিপিগুলি দেবার সময় আমার কাছে প্রাপ্তিস্বীকারের জন্য কোনও কিছু লিখিয়ে নেননি, তেমনই আমিও ফেরত দেওয়ার সময় তাঁর কাছ থেকে কিছু লিখিয়ে নিইনি।" আমাদের বাবা, রামকিঙ্করের ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গীয় দিবাকর বেইজ ছিলেন স্বল্পশিক্ষিত। কিন্তু আপনার মতো রামকিঙ্কর-সচেতন মানুষের



তো নিশ্চয়ই জানা উচিত, তাঁর শিল্পকর্মগুলির আদান-প্রদানের পদ্ধতি। আপনি কিন্তু আমাদের লেখা বিভিন্ন চিঠিতে ছবি বা স্কেচবুক নেওয়ার কথা এক প্রকার লিখিত ভাবেই স্বীকার করে ফেলেছেন। অথচ আপনি বেমালুম বলে দিচ্ছেন দু'একটি 'প্রতিলিপি' নেওয়ার কথা! আমাদের সংগ্রহে থাকা আপনার লেখা আরও কয়েকটি চিঠির অংশবিশেষ তুলে ধরছি। ২৫. ৩. ১৯৮৭ তারিখে আপনি লিখেছেন, "দিবাকরদাকে বলবে যে, তিনি যেন ছবিগুলির জন্য কোনও রকম উদ্বিগ্ন না হন। স্কেচখাতার প্রয়োজনীয় স্কেচগুলি প্রায় সবই হয়ে Block গেছে।" ১৩. ৬. ১৯৮৮ তারিখে আপনি আবার লিখেছেন, "দিবাকরদাকে বলবে, ছবিগুলির জন্য উনি যেন কোনও রকম উদ্বিগ্ন না হন। তোমাদের কাছ থেকে আনা জিনিসপত্রগুলির কাজ হয়ে গেছে। এবং সেগুলি আমার কাছে যত্নের সঙ্গেই আছে। অতএব ভাববার কিছু নেই। কয়েকদিন পর আমি যাচ্ছি, তখন ওগুলি নিয়ে যাব।" ১৭. ৭. ১৯৮৮ তারিখে আবার আপনি আমাকে অর্থাৎ শিবপ্রসাদ বেইজকে এবং আমার বাবা দিবাকর বেইজকে দুটি পৃথক পোস্টকার্ড লেখেন। অংশবিশেষ তুলে ধরছি। বাবাকে লিখেছেন, "ছবিগুলির জন্য কোনও রকম চিন্তা করবেন না, যথারীতি শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনার বিশ্বাসকে মূল্য দিয়েই ফিরিয়ে দেব।" আমাকে লিখেছেন, "আমাকে দেওয়া দিবাকরদার চিঠির উত্তর পাঠালাম। দিবাকরদাকে বলবে ছবিগুলোর ব্যাপারে যেন কোনও দুশ্চিন্তা না করেন। চিন্তিত হওয়ার কথাই - কারণ, অনেক দিন তো হল।"

২৯. ৭. ১৯৮৮ তারিখে লেখা চিঠিতে প্রকাশবাবু জানাচ্ছেন, "রামকিঙ্কর নামে আমার বইটির কাজ চলছে। এখনও পর্যন্ত ছাপা হয়েছে ১৮৪ পাতা। ...বইটিতে যদি আরও কোনও ছবি লাগে, এজন্যই ছবিগুলি দিতে দেরি হচ্ছে। দিবাকরদাকে বলবে, যেন উনি ছবির ব্যাপারে কোনও রকম দুশ্চিন্তা না করেন।' তা হলে 'দু-একটি প্রতিলিপি' নেওয়ার কথা ধোপে টেকে না। ইতিমধ্যে ১৯৮৯ সালের জানুয়ারি মাসে 'রামকিঙ্কর' বইটি প্রকাশিত হয়েছে। ওই বছরই ২১. ১২. ১৯৮৯ তারিখে আপনি লিখেছেন, "অ্যালবামটির ব্যাপারে তুমি যে টাকার দাবি করেছ, তা নিশ্চয়ই আমি তোমাদের দিয়ে দিতে বাধ্য থাকব।" পুনরায় ২০. ৮. ১৯৯০ তারিখের চিঠিতে লিখেছেন, "শিবু, তুমি বা তোমরা মোটেই দুশ্চিন্তা করবে না। তুমি যে টাকার কথা বলেছিলে, সে সব দিয়ে দেব আমি। তাতে আমার যত কষ্টই হোক না কেন। তোমাদের টাকা দেওয়াটাও আমার নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করি।' কিন্তু না! আসলে আপনি এই সমস্ত স্তোতবাক্য ব্যবহার করেছিলেন এই কারণেই, যাতে করে 'অ্যালবাম'টি প্রকাশের আগে আমাদের পক্ষ থেকে কোনও উটকো আপত্তি এসে আপনার পরিকল্পনায় জল না ঢেলে দেয় !

আবার চিঠিতে অবাঞ্ছিত ভাবে আপনি রাধারাণী গঁড়াইয়ের প্রসঙ্গ আনলেন। তাঁকে আমরা 'দিদিমা' বলেই জানতাম। এবং আপনার চেয়ে অনেক বেশি দিন তাঁকে দেখেছি। রামকিঙ্কর সম্পাদিত শেষ উইলে তাঁর পরিচয়-সূত্রে 'দীর্ঘদিনের পরিচারিকা' হিসাবে তিনি য চিহ্নিত হয়েছেন, তা আপনি গত ১৫ তারিখে আনন্দবাজারে প্রকাশিত সংবাদে কোথাও



পেয়েছেন নাকি ? অথচ সত্যিই দাদু তাঁর শেষ উইলে রাধারাণী গঁড়াইকে 'দীর্ঘদিনের পরিচারিকা' বলেই উল্লেখ করেছেন। অতএব এর দ্বারা প্রমাণিত, রামকিঙ্করের উইলের কথা আপনি জানেন এবং জানা সত্ত্বেও ব্যাপারটা সযত্নে চেপে গিয়েছিলেন! কিন্তু কেন ? এখানে উল্লেখ্য, রামকিঙ্কর তাঁর সম্পাদিত উইলের শুরুতেই উল্লেখ করেছেন, "আমার অঙ্কিত অনেক ছবি, ভাস্কর্য, গ্রাফিক্স ও স্কেচ আছে। তাহা ছাড়া আমার ছাত্রছাত্রী, বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট আমার অনেক ছবি, ভাস্কর্য, স্কেচ আছে। যাহা আমি তাহাদিগকে উপহার দিই নাই।" প্রকাশবাবু, এর পর আপনি কী বলবেন?

এ বার আপনার সম্পাদিত 'রামকিঙ্কর' গ্রন্থে রাধারাণী গঁড়াই প্রসঙ্গে 'আমি তোমার পাশে আছি' নিবন্ধে আপনি লিখেছেন, "রামকিঙ্কর যদিও স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা শিল্পবোধহীন, স্বামী পরিত্যক্তা, ঝি হিসাবে জীবন শুরু করা, সংস্কারাচ্ছন্ন, সাধারণ, অতি-সাধারণ আর সাধাসিধে এক হিন্দু ব্রাত্য মেয়েকে, তবুও বরাবরের নিয়ম-ভাঙা রামকিঙ্কর প্রথাসিদ্ধ কোন বিবাহের মোড়কে বেঁধে ফেলেননি নিজেকে।" আর প্রকাশবাবু জেনে রাখুন, 'স্বত্ব' বিষয়টির যথাস্থানেই নিষ্পত্তি হবে। পরিশেষে জানাই, বেইজ পরিবারের তরফে গত ১১. ১২. ২০০৫ তারিখে প্রাপ্তিস্বীকার পত্র-সহ রেজিস্ট্রি ডাকে 'রামকিঙ্করের ড্রইং' বইটির প্রকাশক 'এ মুখার্জি অ্যান্ড কোনং প্রাঃ লিঃ'-কে একটি চিঠি পাঠানো হয়। প্রকাশক মশাই সংবাদটি প্রকাশ হওয়ার ঠিক আগের দিন তাদের লেটারপ্যাডে একটি চিঠি লেখেন, যা আমরা গত ২০. ১. ২০০৬ তারিখে পাই।

শিবপ্রসাদ বেইজ, হরপ্রসাদ বেইজ ও শান্তিময় বেইজ। বাঁকুড়া

প্রতিবেদকের জবাব ঃ

আমি সংবাদ লিখেছি, সেখানে আমার মতামতের কোনও জায়গা নেই। বাঁকুড়ার জেলাশাসকের কাছে রামকিঙ্কর বেজের পরিবার যে অভিযোগ দায়ের করেছেন তার ভিত্তিতে যে সব তথ্য বক্তব্য পাওয়া গিয়েছে, তা-ই সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র। প্রকাশবাবু যা দাবি করেছেন, তা কতটা সত্যি তা তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন। তবে ওই সব ছবির ব্যাপারে শিল্পীর পরিবারকে তার লেখা চিঠিগুলি পড়লে ধারণা কিন্তু অন্য রকম হয়।

রামকিঙ্করের শেষ সম্পাদিত উইল অনুযায়ী, পরিচিতদের কাছে ছড়িয়ে থাকা তাঁর শিল্পকর্মের সবই তিনি দান করেননি। যে কারণে রামকিঙ্করের মৃত্যুর পরে বিশ্বভারতী তাঁর শিল্পকর্মগুলির কিছু আইন মোতাবেক কিনেছিলেন। প্রকাশবাবু কিন্তু ছবি কেনেননি। শিল্পী বা তাঁর উত্তরাধিকারীদের কেউ যে তাঁকে সে সব উপহার হিসাবেও দেননি তা তাঁর চিঠিতেই পরিষ্কার। তবে তিনি ছবি নিয়েছিলেন না ছবির প্রতিলিপি তা রামকিঙ্করের উত্তরাধিকারীরাই ভাল বলতে পারবেন। আরও একটা কথা। প্রতিবেদনে কোথাও রাধারাণী গঁড়াইকে রামকিঙ্করের "দীর্ঘদিনের পরিচারিকা" বলে উল্লেখ করা হয়নি। বরং "ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনী" বলে উল্লেখ করা হয়েছে।



তবে এই চিঠি দিয়ে প্রকাশবাবু প্রশাসনের তদন্তের কাজ বিশে সুবিধা করে দিয়েছেন। কারণ, তিনি যে সব ব্যক্তির কাছ থেকে ছবি পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন, প্রশাসন চাইলে তাঁদেরও (যাঁরা জীবিত আছেন) জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। এবং সে রকম ভাবনাচিন্তা চলছে বলেও পুলিশ সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে। প্রশাসনই জানিয়েছে, তদন্তগুলি এখনও শেষ হয়নি।

এরপর অনেক প্রমাণের সঙ্গে আরো একটি আকাট্য প্রমাণ দিতে পারছি সেটি হলো 'রামকিঙ্করের ড্রইং' বইটির প্রকাশক ছিলেন এ. মুখার্জি এণ্ড কম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। তাদের আমাদের পক্ষ থেকে চিঠি দেওয়া হলে তারা আমাদের জবাব দেন ইংরাজিতে, চিঠিটি ছাপানো হলো, এবং চিঠির বাংলার তর্জমা করলে সহজেই অনেক কিছু পরিস্কার হয়ে যায় জলের মত — তারা একজায়গায় বলছেন "আমরা আপনার ১১. ১১. ২০০৫ তারিখের চিঠি পেয়েছি আমরা আপনাকে জানাচ্ছি যে প্রকাশ দাসের সম্পাদনায় ১৯৯৩ সালে আমরা রামকিঙ্করের ড্রয়িং বইটির ৫০০ কপির অল্পসংখ্যক এক সংস্করণ ছাপি সেই সময় তিনি ঐ বইটির ছবির নেগেটিভ তৈরীর জন্য ব্যক্তিগত ভাবে পেন্টিংস এবং স্কেচেস্ নিয়ে আসেন এবং শীঘ্রই সেগুলি নিয়ে যান। সম্পাদক হিসাবে এই বইয়ের বিষয় বস্তুর জন্য সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব কেবলমাত্র তারই ....."।

A. Mukherjee & Co. Pvt. Ltd.
Publishers Established 1940

Ref no.: ________ By Regd. Post with A/D Date 14.1.06

To
S/Sri Sachan Chandra Baij
" Shib Prasad Baij
" Hara Prasad Baij
" Santimoy Baij
Ramananda Pally,
(Jogipara)
Bankura- 722101

Sub :- Ramkinkarer Drawing

Sirs,

We are in receipt of your letter dated 12.12.2005.

We hereby inform you that we had published only a limited edition of 500 Copies of " Ramkinkarer Drawing" in the year 1993 (B S - 1400) which was edited by Sri Prakash [redacted] Das. At that time, he had personally brought the Paintings / Sketches for the purpose of making the negatives for the book and had taken them immediately. As editor of the book he is solely responsible for the contents. The book has been out of print since 1996 and we have no plans to reprint the same. For further information you are requested to please contact the editor.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Rajeev Neogi)
Director

এ. মুখার্জি এণ্ড কোম্পানি কিন্তু পরিস্কার লিখছেন পেন্টিং এবং স্কেচেস নিয়ে আসেন'...

এবার আগের কথায় ফিরে আসি। ২০/০৮/৯০ তারিকের চিঠি পাওয়ার অনেক পরে একদিন আমি ওঁর বাড়ি যাই। এ যাওয়া আমার দ্বিতীয় বার যাওয়া। প্রথমবার সে খাতির আপ্যায়ণে নিজেকে কী একটা কেউকেটা মনে হয়েছিল। দ্বিতীয়বারে দেখলাম বেরিয়ে পড়েছে প্রকাশবাবুর ঠাট। বার্নিস ফার্নিস সব উধাও। অনেক বাক্‌যুদ্ধ। প্রায় গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় আরকি। কেউ কেউ তা দেখেওছেন। যাই হোক শেষমেশ তিনি তাঁর শেষ কথাটি বললেন — "তোমরা যেভাবে পারো আদায় করে নাও। আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রমাণ রেখে আসিনি।" তিনি তার সুর পাল্টে ফেলেছেন। যেখানে আমার দেখা প্রকাশ দাস আর মেলে না। এ 'অন্য' প্রকাশ দাস। হ্যাঁ, সেদিন সত্যি সত্যিই চোখে অন্ধকার দেখেছিলাম। কে একজন বললেন, "আপনি তাড়াতাড়ি চলে যান নয়ত খুন হয়ে যেতে পারেন।" তাড়াতাড়িই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছিলাম, তবে বাবা সে ধাক্কা সহ্য করতে পারলেন না। স্ট্রোকে মারা গেলেন। এসব বানানো কথা নয়। নির্ভেজাল সত্য ঘটনা।

ছবি গেল, বাবাকেও হারালাম। একেবারে নিঃস্ব ও অসহায় হয়ে গেলাম আমরা তিনভাই। না, মামলার কথা কল্পনাও করিনি। কারণ ততদিনে একটু বুদ্ধি গজিয়েছিল আমাদের — ঘা খেয়ে। তবে বাঁকুড়া S. P.-কে একটি লিখিত পিটিশন দিই। তিনি বর্ধমান S. P.-র কাছে চিঠি পাঠান। তাছাড়াও জানানো হয় মানব অধিকার কমিশন এরও। ব্যাস ওই পর্যন্তই। যেমন হয় আরকি।

WEST BENGAL HUMAN RIGHTS COMMISSION
BHABANI BHAVAN (2nd Floor)
ALIPORE, CALCUTTA-700 027.

Ref. No. ________ Date ________

From : Shri K.L. Bhaumik
Deputy Secretary.

To : The Superintendent of Police,
B U R D W A N.

Sir,

I am directed to enclose herewith a Photo-copy of Complaint dt.23.3.98 submitted by Shri Shiba Prasad Baij, Ramananda Palli, Bankura, Pin-722101 addressed to the Chairman, West Bengal Human Rights Commission along with copies of its enclosure for appropriate action.

Enclo: As stated.

Yours faithfully,
Sd/-
Deputy Secretary.

No. 74(1)/WSHRC/ CRM/ 1540/ 97-98 dt/- 6-4-98
Copy forwarded for information to :-
Shri Shiba Prasad Baij, Ramananda Palli, Bankura, Pin - 722101.

Deputy Secretary.

আমার বাবা দিবাকর বেইজ-এর হাতে লেখা টুকরো কাগজটি এখানে দিলেই বোঝা যাবে আমাদের দেওয়া স্কেচ বা ছবি কতগুলি শ্রী প্রকাশ দাস পেয়েছিলেন।

প্রকাশবাবু বিষয়ে আরও কিছু জ্ঞাতব্য আছে — যা হল তাঁর সহোদর দুই ভাই যাঁরা প্রকাশবাবুর এহেন আচরণে বিশেষ অপমানিত বোধ করেছিলেন। ফলতঃ যারপর নাই ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ ছিলেন তাঁরা। তাঁরা আমাকে সহানুভূতি জানিয়েছেন সহযোগিতার কথাও বলেছেন। তাঁরা আমাকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন প্রকাশবাবু সম্বন্ধে তাদের মনোভাব ও কিছু ঘটনার বিবরণ — যা এখানে পরিবেশিত হল।

Office of the
Superintendent of Police, D.E.O.,
Bankura.

Memo.No.________/DEO. Dated -7-2002.
To
The Superintendent of Police,
Burdwan.

Sub :- Petition of Shiba Prasad Beij of Ramananda Palli, Bankura.

Petition of Shiba Prasad Beij of Ramananda Palli, Bankura along with its connected papers are sent herewith in original. Contents of the petition was enquired from this end and it is revealed that some valuable picture and potraits of Ramkinkar Beij, grand father of the petitioner have taken by one Prakash Das of Panagarh and not yet returned after several attempts.

As Prakash Das is an inhabitant of Panagarh under P.S. Kankasa, District Bankura it is therefore requested to kindly look into the matter and take action as think fit.

Superintendent of Police,
D.E.O. Bankura.

Memo.No. 1197/162/DEO. Dated 29-7-2002.
Copy to Shiba Prasad Beij, Ramananda Palli, Bankura for information.

Superintendent of Police,
D.E.O. Bankura.

২৭. ৩. ৯৯ তারিখে প্রকাশবাবুর এক ভাই শ্রী প্রভাস দাস লিখলেন, "আমি প্রকাশ দাসের ভাই এবং বিভাসের বড়। তোমাদের কাছে দাদা বলতে লজ্জা হয় তবুও বাধ্য হয়েই বলতে হয়। প্রকাশ দাস যার পেশাই হচ্ছে যে কোন ভাবে ঠকবাজি করে যাওয়া। তবে একটা উচিৎ শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন। সে শুধু নিজেকে শিল্প রসিক বলে জাহির করতে চায়। কিন্তু আমি মনে করি সে চোর। কারণ বেশ কিছুদিন হয়ে গেল বাড়িতে একটি দেওয়ালে এক বিশাল টেরাকোটার কাজ করিয়ে পাওনা দেয়নি। সেই শিল্পীকে চোখের জল ফেলে বিদায় নিতে

[illegible]

[illegible]



হয়েছে। "আমার বাবার মুখে চুনকালি মাখিয়ে প্রথম তোমাদের সাথে এ ব্যবহার করে। গতবছর বাবার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এই কুলাঙ্গার সন্তানের জন্য তাঁর আত্মার শান্তি কোন দিনই হবে আমি মনে করিনা। আইনের রাস্তায় এর শাস্তি হওয়া একান্ত আবশ্যক। এখনও দেশ থেকে আইন শেষ হয়ে যায়নি। ..... আমার বলার উদ্দেশ্য দেশের জাতীয় সম্পদ চুরির দায়ে শাস্তি হোক এবং মুখোশটা খুলে যাক।"

অন্য একটি চিঠিতে ২২. ১. ২০০০ সালে তিনি লিখলেন —

"একদিনের জন্য পানাগড়ে আসুন ও অস্বীকার করলেও আমার কাছে সমস্ত ছবির নেগেটিভ আছে। তেমন দরকার পড়লে দেওয়া যাবে।"

প্রকাশবাবুর অন্য এক ভাই শ্রী বিভাস দাস ২৫. ৪. ২০০০-এ তাঁর পাঠানো এক চিঠিতে

জানাচ্ছেন —

"....পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় আজ "আনন্দবাজার" ও "বর্তমান"-এ রামকিঙ্করের খোয়া যাওয়া ছবির একটা খবর দেখলাম। এইবার আপনি অতি অবশ্যই পাঠকের মতামতে প্রতারক প্রকাশ দাসের কাছে কিভাবে প্রতারিত হয়েছেন সবিস্তারে জানাবেন। আশাকরি এবার আমাদের রাস্তা খুলে যাবে।"

দু'ভাই তাকে চোর, প্রতারক, কুলাঙ্গার সন্তান, ঠকবাজ বলেছেন চিঠিতে। বলেছেন জাতীয় সম্পদ চুরির দায়ে শাস্তি হোক এবং মুখোশটা খুলে যাক।

প্রশ্ন, আমি বলতেই পারি ছবিগুলি উনি নিয়েছিলেন এবং আর দেননি, কিন্তু তার ভাইরা কেন তার বিরুদ্ধে মত দিলেন? □

পরিশেষে একটা কথা জানাই যে প্রকাশবাবু রামকিঙ্করের উপর তাঁর লেখা 'রামকিঙ্কর' বইটির জন্য আমাদের কাছে তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। আমরা কৃতজ্ঞ এক্ষেত্রে।

বিভিন্ন সময়ে রামকিঙ্করের ভাইপো দিবাকর বেইজের সংগ্রহ ছাড়াও
নাতি শিবপ্রসাদ বেইজ, লালমোহন পাল, গোপাল পরামানিক ও আলোকচিত্রি
অজিত মিশ্রের সংগ্রহে পাওয়া রামকিঙ্করের মূল্যবান জিনিসগুলি এখানে
[এছাড়াও এই বইয়ে বিভিন্ন অংশে যেসব চিঠিগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি সহ]
প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলিও এই প্রথমবার ।
এই নিয়েই আমাদের দ্বিতীয় সংযোজন

'অপ্রকাশিত রামকিঙ্কর'

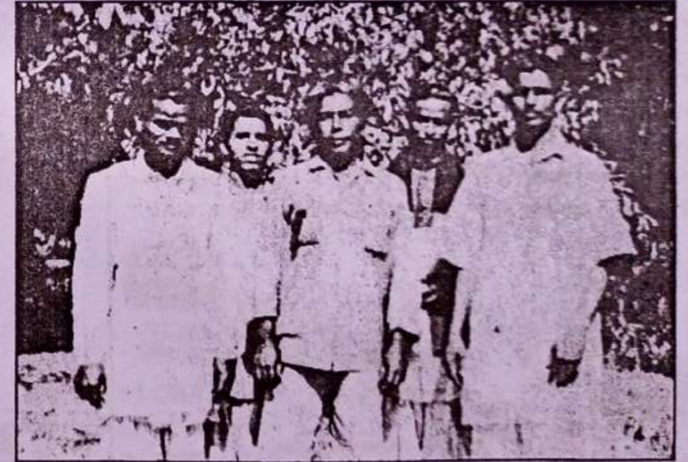


পারিবারিক ফোটো এ্যালবাম থেকে সংগৃহিত।





রামকিঙ্করের সাথে মুরুলী কর্মকার
ও গোপাল পরামানিক
গোপাল পরামানিকের সংগ্রহ থেকে।



লালমোহন পাল, রামপ্রসাদ সূত্রধর, রামকিঙ্কর, দিবাকর বেইজ, শ্রীহরি সূত্রধর
লালমোহন পালের সংগ্রহ থেকে।

বিশ্বভারতীতে ভর্তির জন্য মনোহর নন্দীকে রামকিঙ্করের লিখে দেওয়া দরখাস্ত

বন্ধু বিশ্বনাথ নন্দীকে লেখা চিঠি।

বাঁকুড়ার বাড়িতে রামকিঙ্করের ব্যবহৃত চেয়ার।
আলোকচিত্র তাপস কর রায়

সানুবাদ
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রকাশক—
গীতা সোসাইটী
১১৭ নং হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা।

রামকিঙ্কর যে গীতা (বই)-টি সঙ্গে রাখতেন ও পাঠ করতেন তার প্রথম পাতাটি



RAMKINKAR

রামকিঙ্কর স্বাক্ষরিত
নিজের লেটার প্যাড।

RAMKINKAR

DATE 25/2/...

দিবাকর বেইজকে
লেখা একটি ছেঁড়া চিঠি।



সমরেশ বসু
Samaresh Basu

12, Circus Range
Calcutta - 19
20.12.80

দিবাকর,

'দেখি নাই ফিরে' উপন্যাসের জন্য দিবাকার বেইজের কাছে তথ্য চেয়ে সমরেশ বসুর চিঠি।



SHUBHAM publications

88 s n banerjee road. calcutta 700 014 ● phone 243611

'দেখি নাই ফিরে' উপন্যাসের জন্য দিবাকার বেইজের কাছে তথ্য চেয়ে সমরেশ বসুর চিঠি।



COMPULSORY DEPOSIT SCHEME

PASS BOOK

SURI

HEAD OFFICE

Full name and address of depositor

Name of sub-office if the account stands at a sub-office.

Space for additional entries in case of accounts opened on behalf of minors, etc.

Date of issue of Pass Book 16/...

Signature of Postmaster

Date	Date stamp of the Post Office	Amount Deposited in words	Amount Deposited in figures	Balance at credit of Depositor	Initial of Postmaster
			Rs.	Rs.	
26/3	21 MAR 64		27/-	223/-	
		59.75		282.75	3.9.70
				nil	

রামকিঙ্করের ব্যাঙ্কের পাশবুক।

VISVA-BHARATI UNIVERSITY

PROVIDENT FUND A/c.—Year [illegible]

Name of Subscriber [illegible]

[illegible]

VISVA-BHARATI UNIVERSITY

PROVIDENT FUND A/c—Year ended on 31. 3. 59

Name of Subscriber Sj Ram Kinkar Baij L/F 1/111

No. of A/c.	Opening Balance		Deduction from Salary		Contribution by University		Total		Withdrawal		Repayment		Closing Balance		Interest & Profit		Total of Credit	
	Rs	nP	Rs	nP	Rs	nP	Rs	nP	Rs	nP	Rs	nP	Rs	nP	Rs	nP	Rs	nP
	9299	26	478	75	478	75			75	-			10151	76	330	88	10512	64

N. B.—If any mistake or discrepancy is found it should be reported to the Accounts Officer within a fortnight from the date of receipt of this.

Dated [illegible] — Accounts Officer

VISVA-BHARATI UNIVERSITY

PROVIDENT FUND A/c.—Year 1959-60

Name of Subscriber Ram Kinkar Baij L/F 1/112

No. of A/c.	Opening Balance		Deduction from Salary		Contribution by University		Total		Withdrawal		Repayment		Closing Balance		Interest & Profit		Total of Credit	
	Rs	nP	Rs	nP	Rs	nP	Rs	nP	Rs	nP	Rs	nP	Rs	nP	Rs	nP	Rs	nP
	10512	64	450	00	450	00							11412	64	319	54	11732	18

N. B.—If any mistake or discrepancy is found it should be reported to the Accounts Officer within a fortnight from the date of receipt of this.

Dated 28 FEB. 1961 — Accounts Officer

VISVA-BHARATI UNIVERSITY

PROVIDENT FUND A/c.—Year 1961-62

Name of Subscriber Ram Kinkar Baij L/F D/116

No. of A/c.	Opening Balance		Deduction from Salary		Contribution by University		Withdrawal		Repayment		Closing Balance		Interest & Profit		Total of Credit	
	Rs	nP	Rs	nP	Rs	nP	Rs	nP	Rs	nP	Rs	nP	Rs	nP	Rs	nP
	12083	47	1460	00	1460	00			655	10	13638	57	556	44	14195	01

N. B.—If any mistake or discrepancy is found it should be reported to the Accounts Officer within a fortnight from the date of receipt of this.

Dated [illegible] 1962 — Accounts Officer

রামকিঙ্করের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের রসিদ

The remitter may write here any communication to the payee and his name and address overleaf.

[illegible]

COUPON. The remitter may write here any communication to the payee and his name and address overleaf.

[illegible]

COUPON. The remitter may write here any communication to the payee and his name and address overleaf.

[illegible]

The remitter may write here any communication to the payee and his name and address overleaf.

[illegible]

Space for communication (Sender's address to be written overleaf) Rs. 20/-

[illegible]

Space for communication (Sender's address to be written overleaf) Rs. 50/-

[illegible]

দিবাকর বেইজকে পাঠানো মানি অর্ডারের রিসিপ্ট-এ রামকিঙ্করের কিছু লেখা



SPACE FOR COMMUNICATION

SENDER'S NAME & FULL ADDRESS

SPACE FOR COMMUNICATION

SENDER'S NAME & FULL ADDRESS

SPACE FOR COMMUNICATION

SENDER'S NAME & FULL ADDRESS

SPACE FOR COMMUNICATION



দিবাকর বেইজকে পাঠানো মানি অর্ডারের রিসিপ্ট-এ রামকিঙ্করের কিছু লেখা



SENDER'S NAME & FULL ADDRESS

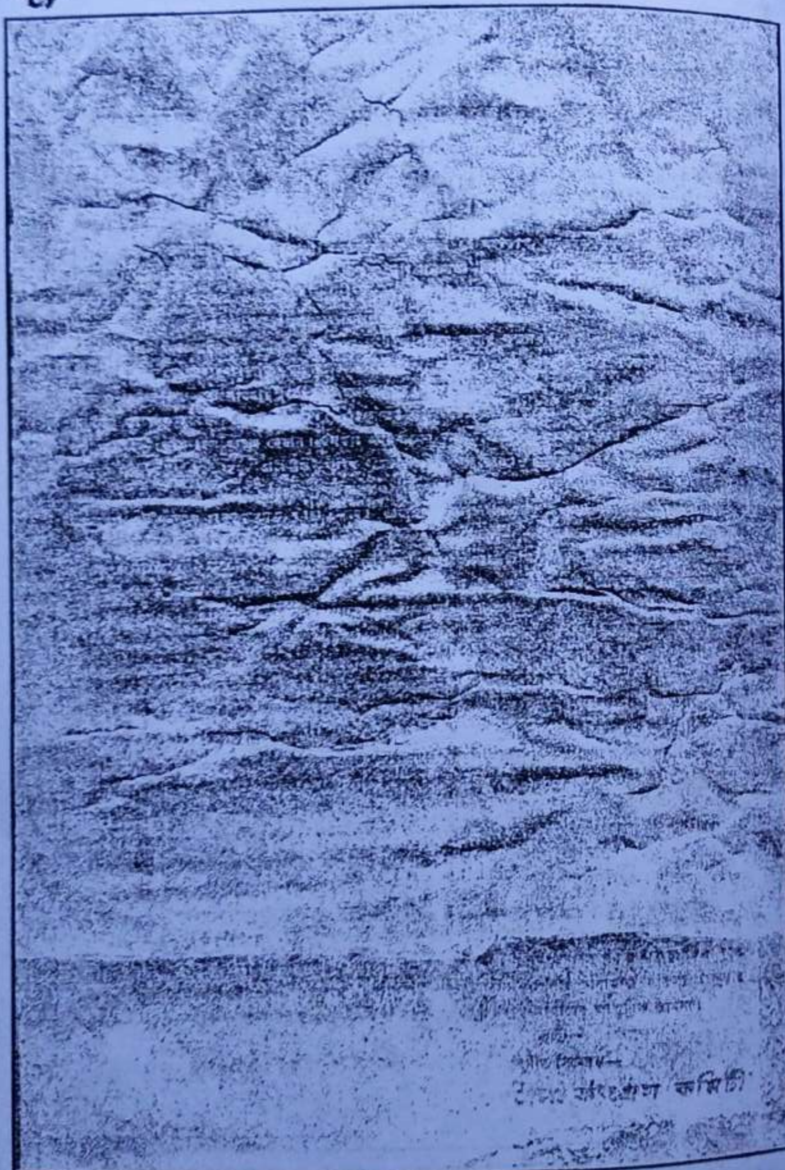
SENDER'S NAME & FULL ADDRESS

SPACE FOR COMMUNICATION

SENDER'S NAME & FULL ADDRESS

দিবাকর বেইজকে পাঠানো মানি অর্ডারের রিসিপ্ট-এ রামকিঙ্করের কিছু লেখা





১৯৫৭ সালে রামকিঙ্করকে বাঁকুড়া কংগ্রেসের দেওয়া মানপত্র



Supdt. Dr. R.N. Roy. Sl. no - 4881 of 1980.

West Bengal Form No. 804 No. 6974

Provisional.
CERTIFICATE OF DEATH

(S.S.K.M. HOSPITAL CALCUTTA)

Name Shri RAM KINKAR BEJ.

Sex 74 yrs. (Male)

Religion Hinduism.

Age 74 yrs.

Occupation not mentioned.

Address C. 31 A, College St. Market, Cal-7.

Date of Admission 23.3.80.

Date of Death 2.8.80. at 12-30 A.M.

Disease or Cause of Death Cardio respiratory failure in a case of [illegible]

S.S.K.M. HOSPITAL.

The 30th March 1984. Signature.

30.3.84

REGISTRAR
(Officer-in-charge ... Resident Medical Officer)
Calcutta-20

রামকিঙ্করের
মৃত্যু-প্রমাণপত্র

OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONERS BANKURA

Phone No. : 234

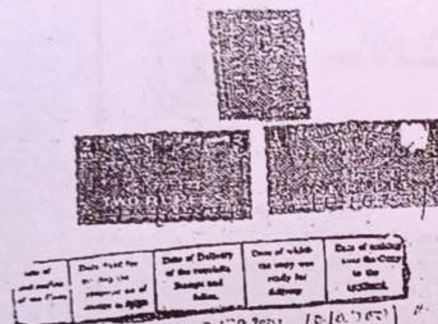
Memorandum No. Dated, the 30th Oct. 19 81.

Certified that Sri Dibakar Bej Son of Late Rampada Bej of Jugipara, Bankura, is known to me. He is the only son of his father Late Rampada Bej. Late Ram Kinkar Bej, uncle of Sri Dibakar Bej, remained bachelor till death. Sree Dibakar Bej is heir of Late Ram Kinkar Bej.

30/10/81.
Commissioner,
Bankura Municipality.

রামকিঙ্কর বেইজের একমাত্র উত্তরাধিকারীত্বের প্রামাণ্য দলিল





Date of application	Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios	Date of Delivery of the requisite Stamps and folios	Date on which the copy was ready for delivery	Date of making over the Copy to the applicant
18.7.2021	24.7.2021	25.7.2021	10.10.2021	

REF.-MISC.PROBATE 21/83

(STAMP ILLEGIBLE)
C III-16.00
Sd/-Illegible
24/02/79

P.T.No.-1180/C/01

মূ- রামকিঙ্কর বেইজ
শান্তিনিকেতন
--২৫।৩।৭৯...

STAMP CORRECT
Head Comparing Clerk
10.10.2021

নিবেদন -

শ্রীরামকিঙ্কর বেইজ, পিতা মৃত চণ্ডীচরণ বেইজ, জাতি হিন্দু, পেশা-ভাস্কর্য, সাকিন শান্তিনিকেতন, থানা-বোলপুর, জেলা-বীরভূম।

[illegible]

[illegible]

1) [illegible]



জলরং





- ২ -

শ্রীমান দিবাকর বেইজ, গ্রাম- হিংনা, পোঃ- চাষ, মৌজা- যোগীপাড়া, জেলা- বাঁকুড়া .
নিযুক্ত মুক্ত প্রাপ্ত হইবেন এবং তাহারা তিনি দান বিক্রয় আদি বিবিধ প্রকার
হস্তান্তরের ক্ষমতা যুক্তে স্বত্ব ও পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিবেন ।

২) আমার যে সকল অঙ্কিত স্কেচ ছবি, প্রতিকৃতি ইত্যাদি আছে এবং আমার অর্জিত বোলপুর এবং তৎসন্নিকট মৌজায় ও শান্তিনিকেতনে কোন স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি থাকিলে তাহা এবং আমার ব্যাঙ্কে অথবা পোস্ট অফিসে কোন টাকা মজুত থাকিলে তাহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ ।।০ আট আনা অংশ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান দিবাকর বেইজ পাইবেন এবং ।০ চারি আনা আমার ভাগিনা মৃত আশুতোষ বেইজের পুত্র শ্রীমান মদন চন্দ্র বেইজ, সাকিন- মৌরচি, থানা- খাতড়া, জেলা- বাঁকুড়া পাইবেন । ঐ সকল সম্পত্তির অবশিষ্ট ।০ চারি আনা অংশ আমার বহুদিনের পরিচারিকা শ্রীমতী রাধারাণী দাসী, স্বামী- মৃত চণ্ডীচরণ গড়াই, সাকিন- ভুবনডাঙ্গা, থানা- বোলপুর প্রাপ্ত হইবে । এবং আমার অঙ্কিত ছবি স্কেচ ইত্যাদি বিক্রয় করিবার স্বত্ব উহা বিক্রয়লব্ধ টাকা ।।০ আট আনা অংশ শ্রীমান দিবাকর বেইজ, এবং ।০ চারি আনা শ্রীমান মদন কুমার বেইজ, ।০ চারি আনা শ্রীমতী রাধারাণী দাসী গ্রহণ করিবে। ঐ প্রকার আমার অন্য অস্থাবর ও বোলপুরস্থ স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় লব্ধ অর্থ ঐ প্রকার অংশ অনুযায়ী করিবে ।

৩) আমি এই উইলের প্রবেট পাইবার জন্য এবং করণীয় যাবতীয় কার্য্য করিবার জন্য আমার ভাগিনা মৃত আশুতোষ বেইজের পুত্র শ্রীমান মদন চন্দ্র বেইজ, গ্রাম- হিংনা, পোঃ- চাষ, সাকিন- মৌরচি, থানা- খাতড়া, জেলা- বাঁকুড়া এই উইলের Executor নিযুক্ত করিলাম ।

৪) আমি ইতিপূর্বে যে সকল উইল করিয়া দিলাম তাহা সমুদয় Cancell করিলাম। এই উইল আমার শেষ উইল ।

৫) এই উইল আমার মৃত্যুর পর কার্য্যে প্রয়োগে আসিবে । এতদর্থে স্বহস্তে দিতে

-৩-

সুস্থ চিত্তে সজ্ঞানে অন্যের বিনা প্ররোচনায় স্বইচ্ছায় এই উইলের মর্মার্থ পূর্ণ অবগত হইয়া সাক্ষীগণ সম্মুখে এই উইল স্বাক্ষর করিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩৮৫ (তেরশত পঁচাশি সাল ১১ এগার মাঘ, ইংরাজী- ২৫।১।৭৯ খ্রীঃ এর উনত্রিশ।

কেঃ দলিলের ১ম পৃষ্ঠে ৭ম লাইনে খুব সামান্য সংশোধন শান্তিনিকেতনে হবে তোলা পাতে আছে।

স্বাঃ- রামকিঙ্কর বেইজ

লেখক ঃ-- স্বাঃ- শ্রীসুধীর কুমার দাস, পিতা- শ্রীদেবীচরণ দাস, বোলপুর।

সাক্ষী ঃ--
১) স্বাঃ- শ্রীশ্যামল চক্রবর্তী, পিতা- মৃত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, সাং- সোনাঝুরি।
২) স্বাঃ- শ্রীসুজিত অধিকারী, পিতা- মৃত রামচন্দ্র অধিকারী, সাকিন- চন্দনডাঙা
৩) স্বাঃ শ্রীসত্যনারায়ণ দাস, পিতা- মৃত পূর্ণচন্দ্র দাস, সাং- চন্দনডাঙা(শান্তিনিকেতন)
৪) স্বাঃ- সৌমেন অধিকারী, পিতা- শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, ২০ দক্ষিণপল্লী, শান্তিনিকেতন, জেলা- বীরভূম।

First Page Back Side :--

STAMP ILLEGIBLE
---10.30A.M.--24th day of Feb.1979
Ramkinkar Beij---Testator.

Sd/-Illegible
SUB-REGISTRAR, BOLPUR
24/2/79

স্বাঃ- শ্রীরামকিঙ্কর বেইজ

T.I.dispensed with

Sd/-Illegible
24/2/79

স্বাঃ- শ্রীচিত্তরঞ্জন চৌধুরী
স্বাঃ- শ্রীচিত্তরঞ্জন চৌধুরী

STAMP ILLEGIBLE.
Ram Kinkar Beij -----
S/o-Late Chandicharan Beij of Santiniketan, P.S.Bolpur
District-Birbhum-------.

STAMP ILLEGIBLE
Chitta Ranjan Chowdhury
S/o-L Sudhir Kr.Chowdhury
Of-Santiniketan, P.S.-Bolpur
District-Birbhum.

Sd/-Illegible
SUB-REGISTRAR, BOLPUR.
24/2/79

Second page Back side

SEAL

Sd/-Illegible
SUB-REGISTRAR, 24.2.79

Illegible
Illegible-No.-III
Volume No.-2
Page No.-37-to 39
Illegible-3, Illegible 97

-4-

Misc Probate case No.-21/83
Produced by Sadhan Ch.Beij.
Produced on 26.3.83
Marked EXST.-I
Marked on-1.6.85

Sd/-Illegible
District Delegate
Bolpur
01/6/85

SEAL

Sd/-Illegible
SUB-REGISTRAR, BOLPUR
5/11/80

copy certified by
Alteration
interlineation

COMPARING CLERK
10.10.2021

COMPARED
Comparing Clerk
10.10.2021

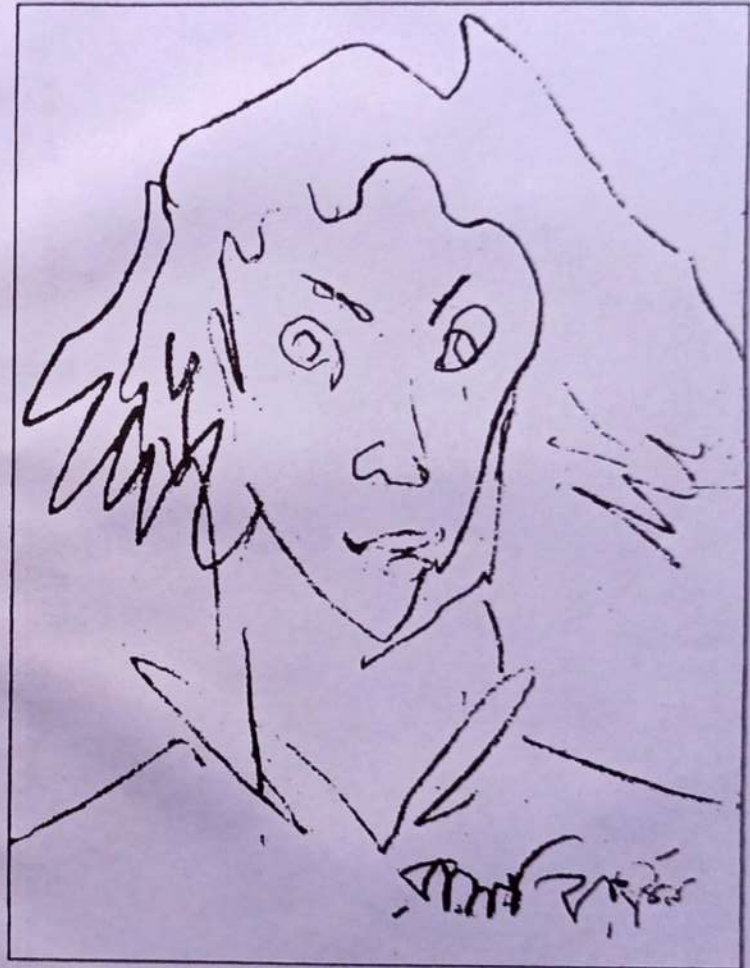
Copying Clerk
Authorised Under Section
76 Act 1 of 1872
10.10.2021





রেখাচিত্র





রেখাচিত্র



দিবাকর বেইজ। যমুনা বেইজ। তিন ভাই চার বোন। ১৯৬৪, বাঁকুড়া। বি.কম. সেকেণ্ড ইয়ার পর্যন্ত। ছোটতে অকারণ হাসির জন্য দাদু রামকিঙ্কর আদর করে 'ফিকফিকে' বলে ডাকতেন। শান্তিনিকেতন কলাভবনে ফাইন আর্টস্ পড়তে চাওয়া। লেখাতে পাশ, ভাইবা ফেল, স্বপ্ন ভঙ্গ। পেটের টানে সেই কলাভবনে মাটি মাখার কাজ করা ও মডেল হওয়া, রোজ হাজিরাতে। বর্তমানে চলে ছোটদের চিত্রকলা শিখিয়ে। অকৃতদার। নিজের কবিতার বই 'কাগজকুচি' এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নিয়মিত লেখা।